কৌতুকপুরের রূপকথা

অন্নকদাস চট্টোপাধ্যায়
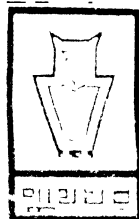
২২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

শ্রীরাধারমণকে দিলাম।

লেখক।

২৫।৩।৬১

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

কৌতুকপুর গ্রামখানা রাত বেশী হতে না হতেই নিশুতি হয়ে পড়েছে। সরু সরু পায়েচলা পথ, মাঝে মাঝে কাঁচা পাকা বাড়ী, ঝোপ-জঙ্গল, খোলা জায়গা। অন্ধকারে কিছুই আর চেনা যায় না।

দুলে পাড়ার মধ্যে একখানা মাটির চালাঘর। হাতকতক দূরে ছিটেবেড়ায় ঘেরা আর একখানা খড়ের চালা। ঘর আর দাওয়া, মাঝখানে দরজা থাকায় দুভাগ হয়েছে দু'মহল। ভেতরের মহলে শুয়ে আছে পঞ্চু, সস্ত্রীক হলেও একেবারে একক। মাথায় তার অনেক ভাবনা জট পাকাচ্ছে।

ভাবছে পঞ্চু। উচিতপুরের বড় দারোগাবাবু রিপোর্ট দিয়েছেন তার নামে। বড় রকমের দাঙ্গাবাজ না কি সে।

রিপোর্ট হয়েছে পঞ্চুর নামে। দাঙ্গাবাজ। অথচ দাঙ্গা বলতে কিছুই করেনি সে। লম্বা আঁটসাঁট চেহারা; মাংস, পেশী আর চর্ব্বিতে কন্‌ক্রীট করা। পঞ্চানন মাল্লিক। মাল্লিক পদবীটা নিজেই আবিষ্কার করেছিল পঞ্চু। বাপ, ঠাকুরদাদা বরাবর চলে আসছিল দুলে বলে। নামের সঙ্গে পদবী জোড়বার কোন গরজই পড়েনি তাদের চৌদ্দপুরুষে। বামুন বাড়ী থেকে ভিক্ষেকরা ছেঁড়াজামা আর ছেঁড়া জুতোর মতই নামের পোষাকী সংস্করণ তৈরী করে নিয়েছিল পঞ্চু।

সেই কথাই আজ ভাবছে পঞ্চু। আজ কেন, কদিন ধরেই ভাবছে। পুলিশে তার নাম গেল কি করে? চরের জমি নিয়ে ঝগড়া হল ভূপতি মজুমদার আর মোড়লদের সঙ্গে। মোড়লরা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল চরের দাঙ্গা লড়তে। লাঠির আঁচপা দেখে তার কাছে ঘেঁষতে সাহস করেনি ভূপতি মজুমদারের লাঠিয়ালে দল। খুন জখমের কোন চিহ্ন পড়েনি তার লাঠিতে। খেঁকী কুকুরের মতন ল্যাজ পিঠে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল ভূপতি মজুমদারের ভাড়াটে লাঠিয়ালেরা। আর হবেই বা না কেন? ভোলা সর্দ্দার সমস্ত বিদ্যের ঝুলি উজোড় করে ঢেলে দিয়েছিল তাকে। ভরা অমাবস্যার রাতে দু'পহর শেয়াল ডেকে যাবার পর মড়িঘাট থেকে গঙ্গাস্নান করে মহাশ্মশানের মড়ার কয়লা আর কবরডাঙ্গা মাটি দিয়ে কবচ লিখে দিয়েছিল তাকে। "ওস্তাদের দিব্যি বলছি পঞ্চা, বড়লাঠি হাতে থাকলে, মানুষ ত মানুষ, যম ঘেঁষতে পারবে না তোর কাছে। তবে দেখিস শালা, কোনদিন চুরি করবি নে, ডাকাতি করবি নে, আর মেয়েনোকের দিকে নজর দিবি নে।"

দাঙ্গা লড়তে যাবার ইচ্ছা ছিল না পঞ্চুর। ভূপতি মজুমদার এখন জমিদার হলেও, ছেলেবেলায় পঞ্চু তার সঙ্গে অনেক মিশেছে, খেলা করেছে। তাছাড়া, সামান্য একটুকরো চরের জমি। গঙ্গা মজে গিয়ে চর বেরিয়েছে চার পাঁচ বছর। ভিজে ভিজে নরম নরম মাটি। কৌতুকপুরের কোল ঘেঁষে ঠেলে উঠেছে চরটা। মোড়ল-পাড়ার সদ্‌গোপ চাষীদের আবাদী জমি, খেত খামার উপড়ে নিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে বসিয়ে দিয়েছে গাঙ্গের ভাঙ্গন। অভয় মোড়ল বলে, চরটুকু না কি তাদের প্রাণ—ওরই কিরকিরে বালির ভেতর মিশিয়ে রয়েছে তাদের বাপ ঠাকুরদাদার হাড় পাঁজরার কুচি।

চর জাগতে না জাগতেই বুক দিয়ে পড়েছে সেখানে। যার যার ভেঙ্গে যাওয়া জমির নিশানা ধরে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে জায়গাটা। বর্ষায় ডুবে যায় চরটা, আউস ধান আর পাট উঠে যেতে না যেতেই। থই থই করে জল, রাঙ্গা গিরিমাটি গোলা। টানা জাল ফেলে ইলিশ মাছ ধরে জেলেরা। ঘর-বাড়ীর আনাচে কানাচে পঁচা ডোবা, গর্ত্ত থেকে পাট কেচে তুলতে না তুলতেই আবার জেগে ওঠে চরটা। আঁস্টে গন্ধ আর ঘোলাটে জল সরে গিয়ে কাশফুল আর দাম নিয়ে নতুন করে দেখা দেয় জায়গাটা। সাতসমুদ্দুর তের নদীর মাটি কুড়িয়ে আরও বেড়ে গেছে তার বিস্তৃতি। নদীর বুকে আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে উঠছে শক্ত মাটির বুনিয়াদ।

মাটি। মাটি। মাটি। মাটির সঙ্গে কোনদিন নাড়ীর যোগ ছিল না পঞ্চুর। নকড়ি মুখুজ্জ্যের চার কাঠা জমির নিষ্কর প্রজা তার বাপ। গতরে খেটে মুখুজ্জ্যেবংশের ভূমিদানের অলিখিত কিস্তি মিটিয়ে আসছে তারা পুরুষের পর পুরুষ ধরে। ভিটের প্রজা। রাতদুপুরে মাথায় ছাতি ধরতে হয় দরকার পড়লে। চোখের ওপর গড়ে উঠলেও গঙ্গার চরটা চক্ষুশূল ছিল পঞ্চুর। মাটির চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসত সে নদী। গঙ্গা, পতিতপাবনী, সুরধুনী। দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, ছড়াটা মুখস্থ করে ফেলেছিল ছোট বয়সেই। নাইতে গিয়ে তিন চার ঘণ্টা ধরে দাপাদাপি করেছে গঙ্গায়। আশ্বিন, কার্ত্তিকে ছিপে বড় বড় চিংড়ি মাছ ধরেছে রোজ এককুড়ি, দেড়কুড়ি। কই! জলের এ অধিকার সে ত খুঁজে পায় নি মাটিতে?

বাইরের মহলেও ভাবছে চন্দর দুলে, পঞ্চুর বাপ, আস্তে আস্তে কথা কইছে পঞ্চুর মায়ের সঙ্গে।

হেলা চৌকিদার কাল কি বলেল জানিস? চন্দর বলছে স্ত্রীকে।

কি বলেল?

বলেল আমার মাথা আর মুণ্ডু! আপন মনেই ঝাঁঝিয়ে উঠল চন্দর।

কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কোন জবাব পেল না।

ঘুমুলি না কি?

না। তবুও কোন আগ্রহ দেখাল না পঞ্চুর মা।

এমন ছেলেও পেটে ধরিলি, হাড় মাস কালি করে ছাড়ল।

তাই ত বলবা? ওর মাথাডা কেডা খেয়েছে মনে করে ছাখ। ষোল বছর অবধি দা হাতে করতে ছাও নি। বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে নেচে নেচে বেইড়েছে। এ্যাখন যত দোষ, নন্দ ঘোষ।

স্ত্রীর অভিযোগে নিভে এল চন্দর। ভুলে গেল হেলা চৌকিদারের কথা। সত্যই কি সে নষ্ট করেছে পঞ্চুকে? ছেলে-বেলায় বেশীর ভাগ মিশেছে পঞ্চু ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গে। স্কুলে না গেলেও পড়তে লিখতেও শিখেছিল মোটামুটি। বল খেলতে, সাঁতার কাটতে, ঘোড়ায় চড়তে, গাছে উঠতে জুড়ি ছিল না তার কেউ গাঁয়ের মধ্যে। কোন কিছুতেই তাকে বাধা দেয় নি চন্দর। দেবার দরকারও হয় নি। ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশলেও তাদের খারাপ করে দেয় নি, নিজেও খারাপ হয়নি কোনদিন। তবুও ত ঠিক মানুষ হল না পঞ্চু! খেলা নিয়েই চিরটা কাল কাটাল। খেলা বই আর কি? এতটা বয়স হল, বিয়েও করল, কিন্তু সংসারে আঁটসাঁট কোথায়? পঁয়ষট্টি বছর বয়স চন্দরের। পঞ্চাশের ওপর বয়স তার স্ত্রীর, চল্লিশ বছরের ওপর ঘর করছে তাকে

নিয়ে। তিন বাড়ীর বাসন মাজে, জল তোলে, ঘুঁটে বিক্রী করে, নিজের হাতে চন্দরের ভাত রাঁধে।

দ্যাখ্, এশো শালা আজকাল আসে ইদিকে ? এশো অর্থে আশু দুলে, দুলেদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন। চন্দর কিন্তু তাকে সন্দেহ করে।

আমার ত আর কাম নেই খেয়েদেয়ে। কেডা আসে কেডা না আসে নজর দিয়ে বসে থাকব। ছাই ঢাকা আগুনের মত গনগন করে উঠল চন্দরের বউ।

আচ্ছা এশোর কথা হলেই অমন ঝাঁঝি মেরে উঠিস কেন বলত ?

তোমার যেমন ভীমরতি ধরেছে বুড়ো বয়সে। রাতদিন এশো আর এশো। মরণ আর কি !

তোর বুঝি গায় নাগে !

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই হেঁকে উঠল হেলা চৌকিদার।

হো হো হো। খুব খবরদার, বড় অন্ধকার······

হেলা কি বলছিল বললে না ?

ঘুমো দিনি। চৈকি হাঁকতে বেইরেছে, এখনও বকর্ বকর করছিস্।

সঙ্গে সঙ্গে আলো পড়ল চন্দরের উঠানে, ঠক্ ঠক্ করে লাঠির শব্দ হচ্ছে তার ঘরের পেছনে।

চন্দর খুড়ো, ও চন্দর খুড়ো।

গলা ঝেড়ে সাড়া দিল চন্দর, যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠল।

চন্দর খুড়ো ঘুমিয়ে না কি ? ও চন্দর খুড়ো।

কনুই দিয়ে বউকে একটা ঠেলা দিল চন্দর।

উঠে পড় মাগী, চার চিৎপাত হয়ে পড়ে আছিস। তারপর হেলাকে ডেকে বলল, আয় হেলু আয়। হাঁকতে বেইরেছিস্ ?

নীল রংয়ের ঝোলা কোট গায়, কোমরে ইউনিয়ন বোর্ডের তকমা, জলজ্যান্ত রাজপুরুষ হেলা চৌকিদার, ষোল আনা অধিকার নিয়ে সটান এসে দাঁড়াল চন্দরের দাওয়ার সামনে।

পঞ্চা কমনে খুড়ো ? ঘরে আছে ত ?

ঘরে থাকবে না ত কম্‌নে যাবে র‍্যা রাত ত্বকুরে ? তুই ত বেশ ছেলে হেলা ? ছেঁড়া কাঁথার ওপর বসে ধমকে উঠল পঞ্চুর মা।

রাগ করলে কি হবে খুড়ী। ইচ্ছে করলে তুয়োর খুলিয়ে দেখতে পারি আমি। খোদ্ দারোগাবাবুর হুকুম, পঞ্চারে কড়া নজরে থুতে।

চন্দর বলল, তুই থাম দিনি। রাগ করিস নে বাবা হেলা। মেয়েনোকের কথায় রাগ করতে নেই। পঞ্চা দিনে দেপিয়ে বেড়ালেও, সাঁঝ নাগতে না নাগতেই একেবারে মড়া।

কি হয়েছে রে হেলা, কি বলছিস্ ? শব্দ করে দোর খুলে বাইরে এল পঞ্চু।

সঙ্গে সঙ্গে তু তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল হেলা।

না, না। কিছু বলিনি ত, ইয়ে বল্‌ছেলাম স্নুমুন্দির দারোগা ত আর কাম পায় না। কম্‌নে কেডা রাতে বাড়ী থাকে কি না, কম্‌নে যায় আসে কি না—সব খোঁজ রাখতে হবে। কম হ্যাঙ্গনাম্ রে ভাই। ভারী পাঁচ ট্যাকা ত মাইনে, তাও ট্যাক্‌স ওঠে তবে জোটবে, নয়ত এস গে।

আয় ঘরে আয়। তামাক খেয়ে যা। বউ লম্পটা জাল্ ত।

হেলা ঘরে আসতেই একগলা ঘোমটা দিয়ে কেরোসিনের লম্প জ্বালল পঞ্চুর বউ। ঘোমটার কাপড়ের ভেতর দিয়ে দেখতে লাগল হেলাকে, দেখতে লাগল পঞ্চুকে।

বস্, ঐ বিছেনডায় বস্। নিজেদের শোবার জায়গায় হেলাকে

বসতে বলল পঞ্চু। গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কেরোসিনের আলো থেকে। সেই আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পঞ্চুর বউকে। মাজা মাজা গায়ের রং, রসে পিছলে পড়ছে গা, খাসা আঁটসাঁট দেহ। আড়াল থেকে কতবার দেখেছে হেলা, দেখলেও সবটুকু যেন দেখে শেষ করতে পারে নি।

দারোগাবাবু কি বলেছে রে ?

কি আর বলবে। ও কথা বাদ দে পঞ্চা। ও শালারা সব বলে, অশ্লীল একটা গাল দিয়ে ফেলল হেলা।

নিঃশব্দে পঞ্চুর বউয়ের শরীরটা একটু নড়ে উঠল। তখনও পঞ্চু গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ছে থেকে থেকে।

নে খা।

চমকে উঠে হুঁকো হাতে করল হেলা।

কেন ছাপাচ্ছিস্ হেলা ? আমারে না কি নজরবন্দী করে থুতে বলেছে দারোগা। জানি নে কি করলাম আমি। তবে করকরে অনেকগুনো ট্যাকা গুণে দিয়েছে মজুমদার আর পোষা পাখীর মতন যা বলেছে, লেখেছে , নইলে চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি।

হুঁকো টানতে টানতে থেমে গেল হেলা।

বাদ দে, বাদ দে পঞ্চা। বলে রাজায় রাজায় মুখ শোঁকাশুঁকি। আমাদের কি দরকার ওসব কতায় ?

হেলার কথায় হা হা করে হেসে উঠল পঞ্চু। শব্দ পেয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল চন্দর। হুঁকো নামিয়ে রেখে ঘর থেকে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল হেলা।

পঞ্চু বলল, বেশ। হাঁকতে বেরিয়ে রোজ একবার করে ঘুরে যাস হেলা, তামাক সেজে নিয়ে বসে থাকব। তবে হুঁশিয়ার,

একটা কথা যদি চুকলি খেইছিস, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। চৈকিদারী করা ঘুচিয়ে দোব জন্মের মতন, মনে থাকে যেন।

কেন বক্‌ছিস্ পঞ্চা। ও কি করবে? হুকুমের চাকর ত ও।

বোঝ দিনি খুড়ো। আমি কি করব? নোকে মনে করে আমি বুঝি কেবল চুকলি খেয়েই বেড়াই।

থাম্, থাম্। যেখানে যাচ্ছিস্, যা। তোরে আর আমার জানতে বাকি নেই।

চৌকিদারী করতে এসে চোরের মত সরে পড়ল হেলা।

বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস পঞ্চা। তোর জন্যে গুষ্টিশুদ্ধ হাতে দড়ি পড়বে। হুঁকো হাতে নিয়ে দাওয়ার ওপর বসে পড়ল চন্দর।

পঞ্চা।

ভারী জুতোর শব্দের সঙ্গে লম্বা একটা মানুষ এসে দাঁড়াল দাওয়ার কাছে। সম্পূর্ণ খালি গা, মাথায় গামছার মত কি একটা জড়ান।

কে মোড়ল না কি গো? এস, এস। আহ্বান জানিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল চন্দর। মোড়ল পাড়ার মাথা—অভয় মোড়ল। পাঁচ, সাতটা ধানের গোলা, লক্ষ্মী উপছে পড়ছে দিন দিন। আধখানা চরের জমির মালিক। তিন তিনটে যোয়ান ছেলে, ভূতের মত পরিশ্রম করে সারাদিন। ভাঙ্গা ইংরাজী বলে কথায় কথায় মোড়ল। ভদ্র অভদ্র সব আসরেই সমান গতিবিধি। জুতো পায় দিয়েই দাওয়ার ওপর উবু হয়ে বসল অভয় মোড়ল।

ব্যাপারটা সহজে মিটবে না পঞ্চু ভাই। অর্ডিনারি লোক ত নয়। হাজার হলেও জমিদারের বংশ ত। অত সহজে ছাড়বার পাত্তর সে নয়।

কৌতুকপুরের মজুমদার বংশের পুরুষানুক্রমে সমৃদ্ধিও ছিল, খ্যাতিও ছিল। অতীতের সে খ্যাতি-প্রসিদ্ধি ও স্বপ্ন সমৃদ্ধির এঁটোকাঁটা দু চারটে ছিটমহল, কৌতুকপুর বাজারের দখলদারী, বাপের আমলের সেরেস্তা আর বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ভোলানাথ, এইটুকুই অবশিষ্ট। তবুও গাঁ ঘরের পুরানো জমিদার। দাপট যাবে কোথায়? জিদের লড়াইয়ে পিছিয়ে গেলে বংশের মুখে চুনকালি পড়ে।

আবার কি করতে এলে মোড়ল? যা বলবার তোমারে ত বলেই দিইছি আজ।

অভয় মোড়ল বলল, চন্দর খুড়ো। পঞ্চাকে একটু বুঝিয়ে বল বাপু। আপদে বিপদে তোমরা না দেখলে কোথায় যাব বল?

তাত বটেই মোড়ল। সে কথা আর বলতে! বিনয়ে একেবারে গলে পড়ল চন্দর।

পঞ্চু! চন্দর খুড়ো আর আমাদের কর্ত্তা ঠিক দুটি ভাইয়ের মতন ছিলেন। একেবারে ইন্টিমেট্। তুই ত জানিস নে। আমার মনে আছে। কি বল গো চন্দর খুড়ো?

হেঁ, হেঁ। সে কথা আর বলতে! চন্দর বলল।

দেখ মোড়ল। ও জমির নড়াই আমি বুঝি নে। ওসব আমার ভালও নাগে না। গাঙ্গ্ মজে খাল হয়ে এল, আর তোমরা সুরু করলে খেয়োখেয়ি। কমনে থেকে তোমাদের হক্ এল বলতে পার? তোমারই বল আর ঐ শালা মজুমদারেরই বল, ওর বোঝাপড়া করতে হয়, যার যার কাঁচা মাথা নিয়ে ঠোকাঠুকি কর।

পঞ্চুর একখানা হাত চেপে ধরে বলল অভয় মোড়ল: শোন পাগলা। সেটেল্‌মেণ্টের পরচায় আছে, বিশ বন্দ জমি এই মোড়লদের গঙ্গার গব্‌ভে গেছে। তুই ত জানিস্ নে। জিগ্যেস্ কর

চন্দর খুড়োরে। কি গো খুড়ো, তুমিই বলনা। কালির বেড়ের পাশেই ছিল আমাদের জমি, নাগাড় উচ্ছে, পটল আর তরমুজের খেত, একবেলায় ভেঙ্গে গেল সাত সনের ভাঙ্গনে।

খুব মনে আছে মোড়ল, এই ত যেন সেদিনের কথা। অধরদা তখন বেঁচে। তিনি বললে—চন্দর, জোড়া বেটা মরার পুত্তুরশোক হয়েছে আমার। নিজের হাতে তোয়ের করা নিপাট ভুঁই, ডাকলে কথা বলত মাটি। মাটি ত নয়, সোনা।

বল, বল খুড়ো। সাবেক লোক বলতে তুমিই আছ। তাই ত তোমার কাছে আসি। আজকালকার ছেলে ছোকরারা কি জানে বল! কমনে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল মজুমদার। বলে গঙ্গার চর সব তার জমিদারীর এলাকা।

যাও। বাড়ী গিয়ে শোওগে যাও মোড়ল। রাত ঢের হয়েছে। লম্বা চওড়া অভয় মোড়ল, পাড়ার মাথা, বেপাড়ায়ও খাতির কম নয়। তবুও আর কথা বাড়াতে সাহস করল না। চন্দর দাওয়ায় বসে হাত কচলাতে লাগল। মান্যগণ্য অতিথিকে এক কথায় বিদায় করে দিল পঞ্চু। ঘরের দোরটা বন্ধ করে দিল ঝনাৎ করে।

পঞ্চুকে একটু বুঝিয়ে বল খুড়ো, আর পার ত কাল একবার দেখা কর আমার সঙ্গে। দাওয়া থেকে নেমে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল অভয় মোড়ল।

২

রাতের অন্ধকার সরে গেল। ভোরের আলো আর হাওয়ার সঙ্গেই জেগে উঠল গ্রাম, শিশিরে ছায়ায় তখনও অস্পষ্ট। এখানে ওখানে বাড়ী, গাছপালা, ঝোপ জঙ্গল, খানা খন্দ।

পাট ঝাঁট সেরে দেওয়ালের গায়ে বিলম্বিত দড়ির সিকা থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে কাল পাথরের থালায় পান্ত ভাত বাড়ল পঞ্চুর মা। জল দেওয়া ভাত, দু'একটা আলু সিদ্ধ, দু'তিনটে কাঁচা লঙ্কা, খানিকটা নুন। চন্দরের প্রাতরাশ। খানিকটা কুঁকড়ে এলেও লম্বা চওড়া চেহারা চন্দরের। গায়ের চামড়া জড় হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। পায়ের গোছে মোটা মোটা শির জট পাকিয়ে ফুলে উঠেছে অসমানভাবে।

পঞ্চুর নাক ডাকার শব্দ আসছে ঘরের ভেতর থেকে। একটু একটু করে সোনালি রোদ পড়েছে প্রাঙ্গণে। গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায় ঝলমল করছে শিশির। গোটা গোটা ছোট বড় মুক্তার দানার মত। খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে এসে দাওয়ায় ভাল করে বসল চন্দর। কলকেয় তামাক ভরে নিয়ে আগুন ধরাল। থালা বাসন দু'একখানা ধুয়ে এনে দাওয়ার ওপর নামিয়ে রাখল পঞ্চুর মা।

দাওয়াটা নোংরা করলে ত! এই নিকিয়ে থুয়ে গ্যালাম আর যত রাজ্যির ছাই কয়লা। গতরডা বড্ড সস্তা দেখেছ আমার!

তোর জ্বালায় তামাক খাওয়া ছাড়তে হবে নাকি? বলে, খেদাই না উঠোন চষি। জ্বলন্ত সোলাটা দাওয়ার ওপর চেপে ধরল চন্দর।

আবার নোংরা করছ? এমন ইল্লুতে নোক ত দেখিনি কখনও।

ঘরের ভেতরের দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে চোখ টিপে বলল চন্দর, তা দেখবি কেন? তোর চোখে এখন নেশা নেগেছে কিনা। কত রসের নোক দেখছিস, এসব কি আর ভাল নাগে!

মরণ আর কি! বুড়ো বয়সে বাহাত্তুরে ধরেছে!

একখানা ঘর। ভেতরে থাকে পঞ্চু, বাইরে চন্দর। সব রকমের কথাবার্ত্তা পঞ্চুর কানে আসে। কিছুই বুঝতে পারে না। মাকে

বিশ্বাস করে না বাবা। অথচ পঞ্চু জানে মা তার কি। রামায়ণ পড়েছে সে ছেলেবেলায়, পড়ে শুনিয়েছে কতদিন। পড়তে পড়তে কতদিন তার মনে হয়েছে মার মুখখানি ঠিক যেন মা জানকীর মতন। তুলেরা ত দূরের কথা, বামুন কায়েৎরা পর্য্যন্ত ধন্যি ধন্যি করে। তবে বাবার মাথায় এ কি ঢুকল ?

ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে বসল পঞ্চু। বাপকে জিজ্ঞাসা করল, আজ কম্‌নে কাজে যাবা ?

ঐ ইয়ে তিনকড়ে বাগের চালে খুঁটি দেয়া হচ্ছে। আমারেই কাজডা ফুরিয়ে দিয়েছে তিন ট্যাকায়। কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে তু'এক পা এগিয়ে গেল চন্দর।

তুমি আর কাজে যাবা না। মা, তোরও সাত বাড়ীর কাজ করা চলবে না আজ থেকে। চন্দরের খোলে পড়া চোখ তুটো বড় হয়ে উঠল। আমার ঘরে যা জুটবে তাই তোমাদের খেতে হবে। এক সন্ধ্যে হয়, এক সন্ধ্যে খাবে। নয়ত উপোষ করবে। ব্যস্‌।

থেমে গিয়ে আবার বলতে লাগল পঞ্চু, তুটো ভাত ছ্যাও বলে, বড্ড জোর ফলাও মার ওপর। ও সব আর চলবে না। বসে বসে খাও, আর পাঁচজনা য্যামন থাকে, তেমনি থাক।

পঞ্চুর আকস্মিক আক্রমণের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে এইবার কথা বলল চন্দর। সেই আশাই ত করেলাম। বেটার রোজগার কেডা না খেতে চায় বল্‌? য্যাদ্দিন গতর ছেল খেটেছি। এখন আর কেডা সাধ করে মুখে রক্ত তোলতে চায় ?

তবে খাও না কেন ? কেডা বারণ করেছে খেতে ?

বারণ আর কেডা করবে ? বাদ সেধেছে মোর-বরাত। সে মুরোদ তোর থাকলে আর ভাবনাডা কি বল ?

তাই মার মুরোদে খাবা আর তার মাথাডা চিবিয়ে খাবা ?

চন্দরের আত্মসম্মানে ঘা লাগল।

এতডা বয়স হল, কোনদিন বসে ভাত খাই-নি পঞ্চা। সে কথা ত হচ্ছে না, হচ্ছে তোর কথা। আজও ভালমন্দ কিছুই বুঝলি নে।

মায়ের অপমানের জ্বালাটা তখনও ঘুরপাক খাচ্ছিল পঞ্চুর মাথায়। তাই বাপকে বার বার আঘাত কববার লোভটা সে সামলাতে পারল না। পঞ্চু বলল, আমি না হয় ভালমন্দ কিছুই বুঝিনে। তুমি কি করে মাকে মন্দ বলে বুঝলে ? চন্দরের মুখখানা যেন মার খেয়ে ঝুলে পড়ল।

পঞ্চুর মার আর সহ্য হল না। চন্দর তাকে অবিশ্বাস করে, অপমান করে যখন তখন। রাগের চেয়ে দুঃখই তাতে হয় বেশী। কিন্তু দুঃখ হলেও সে দুঃখের ত ভাগ হয় না। এমন কি ছেলের সঙ্গেও নয়।

তোর ওসব কথায় দরকার কি পঞ্চা ? ছেলে ছেলের মতন থাক। বলেই পঞ্চুর মুখের দিকে চেয়ে দেখল মা, পঞ্চুর মুখে রক্ত বলতে আর কিছু নেই।

তোর ভালর জন্যেই বলছি বাবা। য্যাতদিন আমাদের গতর বয়, তোরই ভাল।

আমার ভালর আর দরকার নেই মা। আমার ঘাট হয়েছে। এই নাকে কানে খৎ দিচ্ছি, যদি তোদের কথায় আর থাকি।

কেমন ? হল ত ? কতদিন মানা করেছি ওসব কথায় থেক না। জলের কলসী নামিয়ে রেখে ভিজে কাপড়ের ঘোমটার ভেতর দিয়ে বলে উঠল পঞ্চুর বউ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পঞ্চু, বউ এসে কখন তার কাছে দাঁড়িয়েছে। ভিজে কাপড়ের খাঁজে খাঁজে যৌবনের

অজস্র রেখা। তবুও সেই কমনীয় দেহসৌষ্ঠব যেন বিষধর সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়াল তার চোখের ওপর। পঞ্চুর ঠিক সহ্য হল না বউয়ের এই ওপরপড়া অতিআন্তরিকতা। বছর কতকের ঘরনী সে। এতেই এত ? চল্লিশ বছরের দাম্পত্যের অগ্নিপরীক্ষা চলেছে তার চোখের ওপর। মা জানকীর চারপাশ জুড়ে লক্ লক্ করে উঠেছে আগুন। আর তাদেরই সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে পরের মেয়ে, ক বছরের সম্বন্ধের জোরে।

মানা করেছিস সত্যি। তবে আমি ত আর দেশো নই, যে বাপ মা ভেসিয়ে দিয়ে ঐ পিণ্ডীর হাঁড়ি বুকে করে বসে থাকব। দেশো বউয়ের ভগ্নিপতির নাম।

ছ্যাখ, আমারে তুমি যা খুসি বলতে পার। তবে না জেনে শুনে পরের নামে কুচ্ছ কর না। পঞ্চুকে প্রতিবাদের অবসর না দিয়েই রান্নাচালার দিকে চলে গেল পঞ্চুর বউ। তখনও জিভে অনেকখানি বিষ জমে ছিল পঞ্চুর। মায়ের আঘাতের ওপর পাল্টা আঘাত করল বউ। চেয়ে দেখল বুড়ো চন্দর তখনও একভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ আঘাতের সবটুকু খেয়েছে সে নিজেই। সমস্ত শরীরটা জুড়ে ফুটে উঠেছে ক্ষয়িষ্ণুতা। চামড়ার খাঁজে খাঁজে, হাত পায়ের গ্রন্থিতে জড়িয়ে রয়েছে বিশীর্ণতা। হাতের একটা আঙ্গুলে নেকড়ার পটি জড়ান। অশক্ত হাতে কাজ করতে গিয়ে কখন চোট লেগেছে। অথচ ষোল বছর পর্য্যন্ত তাকে দা হাতে করতে দেয়.নি বাবা।

ছ্যাও দিনি দা খানা। তিনকড়ে বাগের কি কাজ বাকী আছে দেখছি।

না, না। তুই পারবি নে। ভারি খুঁট-আগুরে নোক তিনকড়ে বাগ। খেটিয়ে পয়সা দেয় না।

পয়সা না দেয়, পয়সা আদায় করতে আমি জানি।

না, না। একটুখানি কাজ বাকী আছে, তু ঘণ্টারও নয়। আমি যাব আর আসব। কোন রকমে পঞ্চুর চোখের আড়ালে চলে গেল চন্দর। পঞ্চুর মা তার আগেই কখন চলে গেছে। কাপড় বদলে পঞ্চুর সামনে এসে দাঁড়াল পঞ্চুর বউ। সাজিমাটি দিয়ে কাচা ধপধপে সাড়ি পরা। কপালে ঝক ঝক করছে কাঁচপোকার টিপ। সুডৌল সুশ্রী মুখের গড়ন। কপালের ওপর ত্থু থাকে ভাগ হয়ে নেমে এসেছে সুবিন্যস্ত মাথার চুল।

পঞ্চুর বউ বলল, ন্যাও। মুখটুখ ধুয়ে এস, বেলা হচ্ছে না?

হাঁ, এই যাই। বলে আবার নতুন করে তামাক সাজতে বসল পঞ্চু।

আবার তামাক নিয়ে বসছ? তা হলে চৌপর দিন তামাকই খাও। আর কিছু খেয়ে কাজ নেই।

ভ্যাখ্ বউ। তুইও একটু একটু তামাক খেতে শেখ, তা হলে দেখবি ভাতের ভাবনা আর থাকবে না।

ঠাট্টা নয়। আর এখন তামাক নিয়ে বস না। ঘরে চাল নেই। বলতে গিয়ে সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠল পঞ্চুর বউয়ের মুখে।

পঞ্চুর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক ছিল। জীবনে সে সুখী হতে অনেক চেষ্টা করেছে। ছেলে বেলায় ভদ্রসমাজের ছেলেদের সঙ্গে মিশেছে। খেলা করেছে, বই পড়েছে, গল্প শুনেছে, লয়লামজনুর কাহিনী শুনেছে, সীতারামের বনবাসের উপাখ্যান পড়েছে। মা বাপ, রাজ্য সম্মান ছেড়ে কতসুখেই না দিন কেটেছে তাঁদের। নিজের বাপ মায়ের জীবনে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তার ভেতরের সুষ্ঠু আনুগত্যের সুরটা সে লক্ষ্য করেছে। কল্পলোকের সেই

সর্ব্বোচ্চভূমি আপনা হতেই তার চোখে পড়েছিল, কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয় নি।

তখনও শিশু ছিল পঞ্চু, জীবনকে তখনও যাত্রার দলের সাজগোজ পরা রাজা রাণীর মতই দেখেছে। আজ সে-সপ্তলোক মিলিয়ে গেছে শূন্যে। রামায়ণ আর বাস্তব নয় একটুও। বাল্মীকি আবার পুনর্জীবিত হয়েছেন রত্নাকরে। পাকা লাঠিয়াল পঞ্চু। সাপ ধরতে পারে, সাপ খেলাতে পারে, বাঁশী বাজায়। বাঁশীর তালে সাপ ফণা তোলে। ফণা আছড়ায় বিষধর কালনাগিনী।

সাবাস্ জোয়ান। হুঁশিয়ার ওস্তাদ। সাপের ওপর থেকে চোখ সরে গেছে ঘরের পাণ-চালায়। চালের বাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বছর সতের আঠারর একটি মেয়ে। হুঁশিয়ারই বটে! এ কি করছে সে? বউয়ের হাসিটা মিষ্টি লাগল পঞ্চুর। চারদিকে একবার চোখদুটো বুলিয়ে নিল। চড়া রোদ ঝলমল করছে গাব, অশত্থ আর বেল গাছের কচি পাতার ওপর। পাৎলা, ঝিরঝিরে হাওয়া, মাটি তখনও গরম হয়ে ওঠে নি।

কি বলছিলি? চাল নেই? ছ্যাখ না ডাবরিটে ভাল করে নেড়ে?

নাড়লে আর কি হবে? থাকলে তবে ত নড়বে।

আচ্ছা সে যা হ'ক হবেখুনি। বেলা হ'ক, এই ত রাত পোয়াল।

ও [illegible]? ছাড়, ছাড়। ছ্যাখ দিনি? কেডা দেখতে পাবে; [illegible]লত?

[illegible]রি করে নিজেকে মুক্ত করল বউ।

[illegible]ত্যি বলছি তোরে পেলে আমার আর খিদে তেষ্টা থাকে না। ভেতরে ভেতরে গলে গিয়ে বউয়ের কাঁধের ওপর মাথা রাখল পঞ্চু।

সে ত ছ আনিদের সাবিরে পেলেও থাকে না।

বউকে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল পঞ্চু।

কার মুখে এ কথা শুনলি ?

যার মুখেই শুনি, সত্যি কি না বল দিনি ?

পাশের গাঁয়ের বড় পুকুরের মালিক ছিল ঘর কতক দুলেরা। তারই ছ আনার অংশীদার ছিল প্রহ্লাদ দুলে। প্রহ্লাদের মেয়ে সাবিত্রী ছিল পঞ্চুর প্রায় সমবয়সী। পঞ্চুর সঙ্গে ছেলেবেলায় ভাব ছিল সাবিত্রীর। বিয়ের কথাও হয়েছিল একবার। অত ছোট বয়সে পঞ্চুর বিয়ে দিতে চায় নি চন্দর। প্রহ্লাদ বিয়ে দিয়েছিল সাবির মালঞ্চির জগু দুলের ছেলে গণেশের সঙ্গে। ঘর জামাই ছিল গণেশ বিয়ের পর থেকে। সাবির চেয়ে অন্ততঃ কুড়ি বছরের বড় ছিল গণেশ। বিয়ের পর তিন চার বছর গণেশের কাছেই যায় নি সাবি। পঞ্চুকে ডেকে সব কথা বলেছিল সে, দুটো হাত ধরে অনেক কান্না কেঁদেছিল। তখনও রামায়ণের রাজ্যে বাস করে পঞ্চু, বেহুলা লখিন্দরের ভেলা ভেসে বেড়ায় তারই মনের ছায়াচ্ছন্ন ঘাটে ঘাটে।

মন খারাপ করিস নে সাবি। বিয়ে মান্‌ষের হাতের জিনিস নয়। যার হাঁড়িতে যে চাল দেয়। ও সব বিধির বিধেন। ভাঙ্গগড় করবার ক্ষ্যামতা নেই কারুর।

ধেয়ান করছ না কি ? অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে পঞ্চু।

ছাখ বউ। তোরে আমি বিয়ে করে এনিছি। তোর কাছে লুকিয়ে থোবার কিছু নেই।

তা হলে তুমি কিছুই লুকোচ্ছ না বল। বল, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল। একমাথা কোঁকড়ান চুল নিয়ে পঞ্চুর কাছে সরে এল বউ।

দিব্যি করতে হবে না। তুই বিশ্বেস কর।

না তুমি মাথায় হাত দিয়েই বল। মিছে বললে আমার মাথা খাবা।

মাথায় হাত দিয়েই বলছি, তুই যা ভাবছিস, তা নয়। গণেশ মারা গেছে আজ কতদিন। যে বেটাবেটি তোরে ঐ সব বলেছে তাদের বলিস সাবির মেয়েটারে যেন একবার দেখে আসে। আড়াই বছরের মেয়ে না খেতে পেয়ে কি অবস্থাটা হয়েছে। বাপ নেই, মা নেই, কোন চুলোয় কিছু নেই, মেয়েটারে চোখের ওপর শুকিয়ে মেরে ফেলবে, তবুও হাঁটিয়ে তুলবে না কারুর ঘরে।

ও। তাই বুঝি মেয়েটারে চুকিয়ে দিয়ে নিজেই হেটে আসবে বলে বসে আছে।

সে বসে থাক আর না থাক, তুই যদি কোলে করে আনতে চাস, ত এখন থেকে কোমরের জোর কর।

বউকে আর কিছু বলতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল পঞ্চু।

৩

কৌতুকপুরের পাশেই তুর্গাপুর। এ পাড়া আর ও পাড়া। এক ছাঁচে ঢালা প্রত্যেকখানি গ্রাম। ছোট বড় খড়ের নয়ত টিনের চালা। মধ্যে মধ্যে এক আধখানা পাকা বাড়ী। বন জঙ্গলের জমাট মহল। উঁচু নীচু ঢিপি, বনশিউলি, তুর্গাঝাঁটি আর কালকসিন্দের একাধিপত্য। বোশেখের খর উত্তাপে শুষ্ক বৈধব্যের নিরাভরণতা বনে ঝোপে। ম্লান, ধূসর, রুক্ষ মাটি। সরু সরু পায়ে চলা পথ, শুকনো পাতায় আর ধূলায় একহাঁটু।

সারাদিন রোদে ঝলসে গেছে সব, মাটি গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ। জীবজন্তু, গাছপালার সঙ্গে গোত্র মেলান এখানকার মানুষের। আপনিই জন্মায়, আপনিই ঝরে পড়ে। রোদ, বৃষ্টির আশীর্ব্বাদ, অভিশাপ একভাবেই ভোগ করে—কলেরা আর ম্যালেরিয়ার খাস মহলের প্রজা এরা।

বিকেলের দিকে অনেকখানি উত্তাপ ছেড়ে দিয়েছে মাটি। বাতাসের আলোড়ন তখনও চলছে একভাবে।

আঃ। শরীলটা এইবার জুড়ুল। এইবার একটু ঘুমোও মাণিক আমার।

চারচালা মাটির ঘর, সামনে দাওয়া। দাওয়ার চালের হাড়-গোড় বেরিয়ে আছে। একগাছাও খড় নেই। ঘরখানা তখনও দাঁড়িয়ে আছে কোন রকমে। মেঝেয় অত্যন্ত মলিন পুরু কাঁথা দু ভাঁজ করে পাতা। তার ওপর ছোট্ট একটি শিশুর শুকনো দেহ। পাখীর ছানার মত ক্ষীণ আওয়াজ করল শিশু। সাবি বুঝতে পারে সে ভাষা। মুখস্থ হয়ে গেছে তার আবেদন, তার আবদার, তার কান্না। মেয়ে জল চায়।

জল খাবি? দাঁড়া মা, দিচ্ছি। মাটির কলসী থেকে জল ঢালল সাবি পেতলের গেলাসে। তারপর মেয়ের মাথার নীচে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে তুলে ধরল তাকে। দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেল জলটুকু। এইবার ঘুমুবি ত। হাঁ, ঘুমো। নক্ষী সোনা আমার! আয় ঘুম যায় ঘুম বামুনপাড়া দিয়ে······

আবার খুঁৎখুঁৎ করে উঠল মেয়েটি। এ ভাষাও মা বোঝে, কিন্তু শেষটুকু ভেবে আর ঠিক করতে পারে না।

তুই একটু শো। আমি তোর দুধ নিয়ে আসি। হাড়িদের

ছাগলটার বাচ্চা হয়েছে, দেখি যদি একফোঁটা দেয়। তখনও সন্ধ্যা হতে একটু দেরী আছে।

কি গো সাবিত্তিরী, কি হয়? কেমন আছে খুকী?

গলা পরিষ্কার করে উঠানে এসে দাঁড়াল হেলা। কোঁচা দিয়ে কাপড় পরা, খালি গা, কাঁধে সৌখীন রঙ্গীন গামছা।

ঝণাৎ করে দোরের শিকল তুলে দিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল সাবি। বছর আঠার কুড়ি বয়স, ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রং বেশ ফর্সা। অযত্নে, অনিয়মে চাপা পড়ে গেছে রূপ। চোখ মুখ তীক্ষ্ণ, বেশ চওড়া কপাল। বিধবার সিঁথি। ডুলের মেয়ের মতন একটুও দেখায় না সাবিকে। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয় আজও, দুর্গাপুরে, কৌতুকপুরের অভিজাত পল্লীতে, রায়বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে, মজুমদারদের সদর কাছারি ঘরে।

আর দাদা। খুকীর আর কি আশা আছে বল। যে কদিন ভোগ আছে করে যাক। নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল সাবি।

হাঁ। তা কমনে যাওয়া হচ্ছে এখন? দাওয়ার ওপর চেপে বসল হেলা।

সারা দুকুর মেয়েটা বড্ড ছটফট করছে। এইবার ঠাণ্ডা পেয়ে একটু ঘুমুল। তাই দেখি। ইদিকে পেটের চিন্তে ত আছে।

শুধু পেট কেন সাবি, মানুষের সব চিন্তেই আছে। সাবির মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে মাথার টেরিটার ওপর হাতটা একবার বুলিয়ে নিল হেলা।

হাঁ, তা আছে বৈ কি।

থাক্‌বে না? কি তোর বয়স বল্‌ত? কালকের মেয়ে তুই, কোন্ সাধডাই বা তোর মিটেছে? সেই কথাই ত ভাবি।

তাই নাকি ? তা কদ্দিন থেকে ভাবছ বল ত ? দিনকতক আগে থাকতে ভাবলে মেয়েটার আমার এ দশা হত না।

মেয়ে বুকে করে বসে থাকলেই কি মেয়ে ভাল হবে ? ওষুধ খাওয়াতে হবে, পত্যি দিতে হবে, অমনি কি হয় ?

অমনি ত সারাতে যাইনি দাদা। শিশে কতক ওষুধ দিয়েই একটানে ছুসের দুধ দেয় গর্‌ডো নিয়ে গেল রাজু ডাক্তার। তাতেও নাকি সব দাম মেটেনি তার। গর্‌ডো থাকলে ওষুধ না হ'ক, দুফোঁটা দুধও বাছার আমার পেটে যেত। দুঃখ জানাবার ইচ্ছা না থাকলেও, ফোঁটা কতক চোখের জল চাপতে পারল না সাবি।

তুই যেমন ন্যাকা মেয়ে, তাই এক কথায় অমন গর্‌ডো দিয়ে দিলি ঐ সুমুন্দির চামারকে, একটু ভাবলি নে।

একলা মানুষ কত আর ভাবব বল ?

যাক্‌গে। এত ভেবে ত কিছু করতে পারলি নে। এইবার আমার একটা কথা শোন। তোর মেয়েও ভাল হবে, তুইও ভাল থাকবি, সব ঠিক থাকবে।

চোখ টিপে সাবিকে কাছে আসতে ইশারা করল হেলা।

ছেলেবেলা থেকেই জিভটা একটু বেশী মাত্রায় ধারাল ছিল সাবির। স্বামীর সঙ্গে বয়সের অসমতার ফলেই হয় ত মেজাজের তীক্ষ্ণতা তার বেড়ে গিয়েছিল। কথায় তাকে এঁটে উঠতে পারে, এমন লোক খুব কমই ছিল। আজ কিন্তু সে প্রথম জানতে পারল, মানুষের কথার প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা, তাকে সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করাও সব সময় সম্ভব নয়। কোথা থেকে খানিকটা ভয় এসে তার সমস্ত দেহটাকে যেন অসাড় করে ফেলল।

হেলা নিজেই সাবির কাছে সরে গেল।

মস্ত বড়লোকের নজরে তুই পড়ে গিছিস সাবি। তোর বরাত ভাল।

সাবির কাছে কোন রকমের সম্মতি না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল হেলা, বুঝতে পারলি নে?

আমার আর বুঝে কাজ নেই। এই কথা বলতে বুঝি এখানে এয়েছ?

আরে শোন, শোন। কথাডাই শোন ছাই। ও হেঁজিপেঁজি নোকের কথায় হেলা থাকে না। মজুমদার মশাই মোরে কি বলেছে জানিস?

মজুমদার মশাই? হেলার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল সাবি।

হাঁ রে হাঁ। তা নয় ত কেডা? মজুমদার মশাই আজ কদিন ধরে বলছে তোর কথা।

একটুখানি কি ভেবে নিল সাবি। তারপর বলল, তা আমারে দিয়ে সুবিধে হবে না। তবে একটা কাজ ত করতে পার।

কি কাজ? তাই বল না বাপু? আমার হয়েছে যত জ্বালা।

হাঁ। সেইজন্যেই ত বলছি। তোমার নিজের বৌ-ত দেখতে খুব খারাপ নয়, আর বয়সও এমন কি বেশী হয়েছে? সবদিক দিয়েই তোমার সুবিধে হবে।

প্রত্যাখ্যানের ভেতর দিয়ে এতখানি নির্লজ্জ আঘাত ঠিক প্রত্যাশা করেনি হেলা, বিশেষ করে সাবির মত দীনদুঃখী মেয়ের কাছ থেকে। তাই ধাক্কাটা কাটাতে একটু সময় লাগল তার।

দেখ সাবি। গোড়ায় গোড়ায় অমন সতীগিরি সব্বাই করে। বলে, কত দ্যাখলাম রথারথী, সেওড়াতলায় চক্কোবত্তি।

তোমাকে ত আমি ঝগড়া করতে ডাকিনি আর ছড়া কাটতেও বলিনি। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। দোরের শেকল খুলে আবার ঘরে চলে গেল সাবি। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিল দোরটা।

মেয়েটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। কেরোসিনের লম্প জ্বেলে ফেলল সাবি। চোখের পাতা দুটো ফাঁক হয়ে আছে, তার ভেতর দিয়েই চোখের খানিকটা শাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। নিষ্প্রভ, প্রাণহীন, না জাগা, না ঘুমন্ত দৃষ্টি। চোখের কোল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে আপনিই কখন শুকিয়ে এসেছে। মেয়ের পাশে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল সাবি। সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে তার। কিছুই ত নেই। বাপ গেছে, মা অনেক আগেই গেছে। স্বামী গেছে, জায়গা জমি, পানের বরজ গেছে। বড় পুকুরের ছ'আনা অংশ নিলাম করে নিয়েছে তিনকড়ি বাগ। থাকবার মধ্যে ধুক ধুক করছে শিবরাত্রির সলতের মত ছোট্ট মেয়েটা, আর তার নিজের মান ইজ্জৎ। বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল সাবির। সত্যিই কি বাঁচবে না মেয়েটা? না যদি বাঁচে কি করবে সে? আধ আধ বোল ফুটেছে খুকীর, বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলে কি চমৎকার। আজকাল আর বেশী কথা বলতে পারে না, শুধু খাবার বায়না করে আর কাঁদে। আর করবেই বা না কেন? আধ পোয়া দুধও ত পেটে পড়ে না, শুধু জল আর বার্লির গুঁড়ো। কত লোকের খোসামোদ করল সাবি, পায়ে পর্য্যন্ত পড়ল, যদি দশটা টাকাও কেউ ধার দেয়। মেয়ে ভাল হলে যেমন করে হোক শোধ করে দেবে। সুরো, নগেন, সত্য এদের ত অবস্থা ভাল। পাট বিক্রি করে নোটের গোছা ঘরে তুলেছে তারা বাগদি; বাড়ীতে গোলাভর্ত্তি ধান। তবুও একটা

পয়সা তাদের হাত দিয়ে গলবে না। সারা গ্রামখানার বাড়ীগুনোর দোরে দোরে ঘুরে দেখল সাবি মনে মনে—সমস্ত দরজাই এঁটে বন্ধ করা, কোন ফাঁকি দিয়ে একটা সিকি পয়সাও গলে আসবার পথ নেই। তবুও ভিক্ষা সে চায় না, ধার চায়। না, কেউ নেই, কোনখানে কেউ নেই। তবে কি করে বাঁচাবে সে মেয়েকে?

আস্তে আস্তে দোর খুলে বাইরে এল সাবি। অন্ধকারের মধ্যে তেঁতুল গাছটার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত শরীরটা একেবারে এলিয়ে গেছে। রান্না খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও একটুও উৎসাহ নেই। তা হলেও একটু দুধ তাকে যোগাড় করতেই হবে, যেখান থেকে হোক। রাত হয়ে গেছে, রোগা মেয়ে একলা ফেলে যায়ই বা কি করে।

সাবি! সাবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘকায় এক মূর্ত্তি। হাতে মস্ত বড় একটা লাঠি।

কেডা? পঞ্চু-দা? কোথায় গিয়েলে? সাবির কথা যেন শুনতেই পায় নি পঞ্চু।

এ সব ব্যাওসা কবে থেকে ধরলি সাবি? মনে ভেবেছিস ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না, না? বলতে বলতে একেবারে সাবির ঘা ঘেঁষে সরে এল পঞ্চু।

পঞ্চুদা! প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গলাটা বুজে এল সাবির।

আরে থো থো। ও সব ন্যাকামোতে মোটে ভোলে না পঞ্চানন মাল্লিক। হাতে পাঁজী মঙ্গলবার। এই মাত্তর দেখা হেলার সঙ্গে। তোর এখেন থেকেই গেল। তা বেশ, বেশ। এইবার তোর বরাত খুলবে জানি। বড়গাছে নৌকা বাঁধছিস, আর ভাবনা কি বল?

বড় গাছেই বাঁধি আর ছোট গাছেই বাঁধি, সে জমাখরচ যে

তোমাকে দিতে হবে, তার ত কোন মানে নেই। সর, সর। শাসন করতে হয়, নিজের ঘরে গিয়ে করগে যাও।

মেয়ে নোককে শাসন করতে বড় দায় কেঁদেছে আমার। দশ হাত কাপড়ে যাদের কাছা নেই, তাদের শাসন করে কি হবে? তা ঘরের বউই হ'ক, আর পরের··· -

কথাটা শেষ করতে পারল না পঞ্চু।

বল, বল। থামলে কেন? ঘরের বউই হ'ক, আর পরের বউই হ'ক।

পরের বউকে বলে ত কোন লাভ নেই সাবি। তবে শাসনের কথা বলছিলি না, সেই কথাডাই বলছি। শাসন আমি করব, যাতে সুমুন্দি জন্মে কখন পরের বৌ-ঝির দিকে আর ভুলেও না তাকায়।

তা যদি করতে পার পঞ্চুদা, তা হলে সত্যিই একটা কাজ হয়। গলার আওয়াজে চমকে উঠল পঞ্চু। তবুও অন্ধকারে মুখখানা ভাল দেখা যাচ্ছে না সাবির।

একটু জল খাওয়াতে পারিস সাবি? বড্ড তেষ্টা নেগেছে।

দ্যাড়াও। জল আনছি। জল আনতে আবার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল সাবি।

পঞ্চু একটু একটু করে ঘরের দিকে এগিয়ে এল। বল্ল: হ্যাঁ রে? তোর মেয়ে যে বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে রে? এখনও নরম পড়ে নি?

সে কথায় আর দরকার কি? সে দেখতে ত আর আসনি। সাবির অভিমান হয়ত পঞ্চুর কানেই গেল না।

ইঃ। এ যে কিচ্ছু নেই দেখছি। এ তুই করেছিস কি? মেয়েটার দিকে একটুও নজর দিস্ নি?

না। কি করে আর নজর দেব বল? নৌকো বাঁধব আবার মেয়ে দেখব, সব ত একসঙ্গে হয় না। আরও কিছু বলবার ইছা ছিল সাবির, কিন্তু কোথা থেকে খানিকটা চোখের জল এসে সব গোলমাল করে দিল। তবুও এই বেহায়া আলোচনায় পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল পঞ্চুর। সাবিকে ভালবাসত পঞ্চু। সাবিত্রী ত সাবিত্রী। যেন রামায়ণ মহাভারতের কালের মেয়ে, রূপেও বটে, গুণেও বটে! বিধবা হয়ে কত কষ্ট পাচ্ছে, তবু কোন অন্যায় কাজ করবে না। সাবির সতীত্বের ওপর ভর করে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে এতদিন। সেই সাবি আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? মজুমদার, ঘোর লম্পট। ভদ্রলোকের চামড়াঢাকা জানোয়ার। তার হাতে শেষটা তুলে দিচ্ছে নিজেকে? মুচ্‌কি হেসে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে গেল হেলা। ক্ষেপা কুকুরের দাঁতের মত নির্লজ্জ সে হাসি। কিন্তু তার চেয়েও বেপরোয়া সাবির এই কৈফিয়ত।

মেয়ে তোর বাঁচবে না সাবি।

বাঁচবে না? প্রায় চিৎকার করে উঠল সাবি।

কি করে বাঁচবে? পাপ করলে পয়সা হয়, সোনাদানা হয়, ছেলেমেয়ে কিন্তু থাকে না।

কত পয়সা, কত সোনাদানা দেখছ না? গা একেবারে ফেটে পড়ছে। পাপের বিচের করতে এয়েছ, কি খেয়ে বাঁচবে মেয়েটা সে খবব ত রাখ না। পণ্ডিতী করতে সম্মাই পারে। ঐ কাজটাই সব চেয়ে সোজা। এতক্ষণে মনে পড়ল জল চেয়ে ঘরে এসেছে পঞ্চু। অপরিষ্কার পেতলের গ্লাসটা ধুয়ে আনতে বাইরে গেল সাবি।

ঘরখানার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল পঞ্চু। হাওয়ার ঝাপটা লেগে মাঝে মাঝে দপ দপ করে উঠছে কেরোসিনের আলো।

ঘরের একপাশে কাৎ হয়ে রয়েছে একটা মাটির কলসী। ঘটি, বাটি, থালা বাসন বলতে বিশেষ কিছুই নেই কোনখানে। অথচ একদিন কত সাজান গোছান ছিল এই ঘর। বাক্স, পেঁটরা, কাঠের ছাপ-সিন্দুকে পা বাড়াবার জায়গা ছিল না। পঞ্চুর মাথার রক্ত দেখতে দেখতে নেমে এল সারা গায়ে, বুকের ভেতরটা যেন নিঙ্ড়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। সত্যিই মেয়েটার বাঁচবার আর কোন আশা নেই। কেন সে এসব কথা বলতে গেল সাবিকে? এ সমস্ত হেলার কার-সাজি। মজুমদারের পোষা কুকুর সে।

ন্যাও। জলের গেলাসটা পঞ্চুর সামনে নামিয়ে দিল সাবি।

ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে উঠল মেয়েটা। ক্ষীণ কণ্ঠ, কাঁদবারও জোর নেই।

কি মা? মেয়ের উপর ঝুঁকে পড়ল সাবি।

একটু কিছু খেতে দে ওরে। কতক্ষণ আগে খাইয়িছিস?

খাবে আকার ছাই। এখন ও ঘুমুবে। ঘুমো ঘুমো। রাতদিন প্যান্ প্যান্। মরেও না আপদ বালাই। হাড় জুড়োয় তা হলে।

রাগ করলে কি হবে বল? খেতে না পেলে কি ঘুমোয় ছেলে-মানুষ?

খাওয়াব কি আমার মাথা না মুণ্ডু! কি আছে ঘরে যে খাওয়াব?

বুঝিছি, দাঁড়া। কোমরের কাপড় থেকে সিকি, দু-আনি, আধুলিতে মিলিয়ে চারটে টাকা বের করল পঞ্চু।

ধর, ধর। ঝক্ করে নে। যেখান থেকে পাস খানিকটা দুধ এনে খাওয়া মেয়েটারে।

না, না। টাকা দরকার নেই পঞ্চুদা। তার চাইতে পোয়াটাক দুধ তুমি এনে দ্যাও যেখান থেকে হ'ক।

টাকাটা থো। দুধ আমি এনে দিয়ে যাচ্ছি। বলেই দাওয়া থেকে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল পঞ্চু। টাকাটা গুণে গুণে আঁচলে বাঁধতে লাগল সাবি।

কি গো সাবিত্তিরী। টেকা দিয়ে গেল কেডা ?

অন্ধকারের মধ্যে কাল ভাল্লুকের মত পা টিপে টিপে ঘরের দোরে এল হেলা।

ভূত দেখে যেন চমকে উঠল সাবি।

হেলা দা। তোমার পেরাণে কি দয়া মায়া বলতে কিছু নেই ? কেন তুমি আমার পেছনে নেগেছ বলতে পার ?

আরে না না। তুই রাগ করছিস কেন বল ত ? ত্যাখন রাগ করে ঘরে গিয়ে সেঁধুলি। তাই ভাবলাম কি শুনতে কি শুনিছিস, আর একবার দেখে আসি, তাই এ্যালাম। অন্ধকারের মধ্যেই এদিক ওদিক কি যেন লক্ষ্য করতে লাগল হেলা।

তাই না কি ? তা হলে বস না একটু। জায়গা দেব ?

না, না বসব না। আমার এখন অনেক কাজ। আর একদিন আসব।

আর একদিন কেন, আজই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক, একটু বস না।

কি কথা ?

যে কথা আমার কাছে একরকম বললে, পঞ্চুদার কাছে আর একরকম বলেছ, আবার পাঁচ জনার কাছে অন্য একরকম বলবে। বুঝতে পেরেছ ?

হেলার মুখখানা যে অন্ধকারের মধ্যেও রং বদলেছে দেখতে না পেলেও সেটা বেশ বুঝতে পারল সাবি।

কি দিব্যি কাটলে তোর বিশ্বেস হবে সাবি?

দিব্যি কাটতে হবে না। মুখের ওপর ভজিয়ে দিলেই বিশ্বেস হবে। পঞ্চুদা এই এল বলে।

পঞ্চু আসবে? সে কি রোজ এখানে আসে না কি রাত্তিরে?

এলে আর তুমি জানতে পারতে না গাঁ চৈকি দিতে বেইরে?

ঐ-রে। যাঃ। ভাল কথা মনে করিয়ে দিইছিস মাইরি। এখুনি যে আমার দফাদারের কাছে যেতে হবে। আচ্ছা, চললাম।

অন্ধকারের মধ্যেই কোথায় মিশে গেল হেলা।

সাবির দুটো চোখ জ্বালা করে জলে ভরে উঠল। অনাহারে, দুশ্চিন্তায় অবলম্বনশূন্য জীবন। দুঃসহ, নিঃসঙ্গ, রাতের ঘনায়মান অন্ধকারের চেয়েও অস্পষ্ট। অতীত গেছে, ভবিষ্যৎও নেই—শুধু বর্ত্তমান, শুষ্ক, কঠোর। তাও এককোণে পড়ে থাকবার উপায় নেই। কি চায় সবাই তার কাছে? গোয়েন্দার মত ঘোরাফেরা করছে কেন হেলা? বড়লোক হয়ে তার মত গরীব দুলের মেয়ের ওপর নজর দিচ্ছে কেন মজুমদারবাবু?

এই নে। মস্ত বড় একঘটি দুধ ঘরের মেঝেয় নামিয়ে রাখল পঞ্চু।

এত দুধ কি হবে পঞ্চুদা? ওর সিকির সিকিও ও খেতে পারবে না। রাত পোয়ালেই সব নষ্ট হয়ে যাবে।

নষ্ট করবি কেন? খুকীরে খাইয়ে যা থাকবে নিজে খেয়ে নিস। তবে ওষুধও ত দিতে হবে সাবি। কি করা যায় বল দিনি?

ওষুধ পরে হবে। আগে পত্যিই জুটুক। সে যা হয় হবে। তুমি কিন্তু···এই পর্য্যন্ত বলেই থেমে গেল সাবি।

কি বলছিস সাবি?

তুমি আর আমার বাড়ী এস না পঞ্চুদা।

মাথাটা বুকের ওপর নেমে আসায় মুখখানা তার ভাল দেখতে পেল না পঞ্চু। পঞ্চুর সমস্ত উৎসাহ নিভে এল। সাবির মেয়ের জন্য যত না হোক সাবির মুখ চেয়ে এতটা করেছে সে। মেয়ের প্রাণের চেয়ে মায়ের মনের দাম অনেক বেশী। গণেশ মারা যাবার পর সাবিকে ঘরে তুলতে চেষ্টা করেছিল অনেকেই। কিন্তু রাজী হয় নি সাবি। মেয়ে মানুষের দুবার বিয়ে হয় না। তখনও ছ-আনি ভাগের কিছু ধান ছিল সংসারে। ঘর ভরতি পেতল কাঁসার বোঝা ছিল, দু এক কুচি সোনা রূপাও ছিল ঘরে।

বারণ করিস আসব না। তবে যদি দরকার পড়ে আমারে খবর দিস। চলে যাবার জন্য পা বাড়াল পঞ্চু।

রাগ কর না পঞ্চুদা। গাঁ ভাল নয়। কেডা কি বলবে, বুঝতেই ত পারছ।

বলতে আর বাকী কি আছে সাবি? তবে বড়নোকের সঙ্গে বদনাম নিতে বোধ হয় দোষ হয় না, কি বল?

সাবিকে উত্তর দেবার সময় না দিয়েই চলে গেল পঞ্চু।

চেঁচিয়ে ডেকে পঞ্চুকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল সাবি। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। মেয়ের জন্য খানিকটা দুধ বাটিতে ঢেলে নিয়ে বাকীটা ঘটি উপুড় করে মাটিতে ঢেলে দিল।

৪

দুপুরে জন খেটে এসে ভাত খেতে বসল চন্দর। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, চৌকিদারী নীল জামার ওপর তকমা এঁটে দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়াল হেলা।

কি গো চন্দরখুড়ো, খাওয়া হল? আজ কমনে কাজ হল?

এঁটো হাতেই জলের ঘটিটা তুলে আলগোছে ঢক ঢক করে জলটা নিঃশেষ করে বউকে ডাকল চন্দর। একটু জল দিয়ে যা না গো। এই মনিব বাড়ীর রান্নাচালাখান নামান হচ্ছে কিনা। ঘুণে আর রুঁইয়ে সব শেষ করে দিয়েছে। পাঁচদিনেও খাড়া হয় কিনা?

ফুরন বুঝি?

হাঁ, আর বল কেন? মনিব বাড়ীর কাজ, ফুরন ত বটেই। কমনে গেলি গো। ডাকছি, কানে যাচ্ছে না। তেষ্টার জলও একটু পাবার যো নেই।

ভাত দিয়ে কমনে গেল খুড়ী! ও খুড়ী! চন্দর খুড়োরে একটু জল দিয়ে যাও।

একঘটি জল নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল পঞ্চুর বউ।

কি, জল এনেছ? আচ্ছা, নেমিয়ে থোও ঐঠানটায়। জলটা খেয়ে নিয়ে উঠে পড়ল চন্দর। পঞ্চুর বউয়ের ঘোমটা ঢাকা মুখের দিকে চেয়ে রইল হেলা।

নাঃ বুড়ো মাগীর আক্কেলডা দেখছিস হেলা? সব বেগারটালা কাম। ঠকাস্ করে এক পাথর ভাত বসিয়ে দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় টোক্‌লা সাধতে বেরুল। মাইরি বলছি, আর একটুও ভাল নাগে না এদের রীত, মরণডা হয় ত বাঁচি। আঁচিয়ে উঠে আসতেই এক-থালা ভাত-তরকারি নিয়ে হন হন করে বাড়ীতে এসে দাঁড়াল পঞ্চুর মা।

উঠে পড়লে! বলে গ্যালাম একটু বসে খাও, বামুনবাড়ী থেকে তরকারি আনছি।

তোর তরকারির জন্যে আমি ভাত কোলে করে বসে থাকি আর

কি। বড় টুক্‌নি ঘটিটা করে একঘটি জল থুয়ে যেতে কি হাতে কুড়িকিষ্ঠি হয়েল।

কেন? জল ত দিয়েছে। অন্য জলের ঘটিটার দিকে চেয়ে বলল পঞ্চুর মা। হেলার মুখের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠল।

চন্দর খেয়ে উঠে তামাক সাজতে বসল।

পঞ্চা কমনে গিয়েছে খুড়ো? হেলা জিজ্ঞাসা করল। হুঁকোয় একটা টান দিয়ে বাঁ হাতটা উলটে অনিশ্চয়তার ভঙ্গি করল চন্দর।

পঞ্চা আজকাল বেশ দুপয়সা কামাচ্ছে, কেমন না খুড়ো?

চন্দর বলল, ভগা জানে! দুপয়সাই কামাক আর দু ট্যাকাই কামাক, ইদিকে ঢন্ ঢন্। দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। বলে ন গাঁ মাগলেও যা আর ছ গাঁ মাগলেও তাই। হুঁকোটা হেলার হাতে তুলে দিল চন্দর।

সে কি খুড়ো? না, না। তুমি ভাঁড়াচ্ছ বাপু।

পরের পয়সা সম্মাই বেশী দেখে হেলা।

তা তুমি বলতে পার। তবে নিজের চোখে যেটা দ্যাখলাম, সেডারে ত পেত্যয় করতে হবে। চন্দরের চোখদুটো চক চক করে উঠল।

তুমি তার সন্ধান কমনে পাবা খুড়ো, ট্যাকা কি তোমার ঘরে আসে?

কি বলছিস পষ্ট করে বল হেলা। তোর ওসব পাকমারা কথা আমি বুঝতে পারি নে বাপু।

ট্যাকা ঢোকছে ছ আনিদের সাবির ঘরে।

দূর্ মুরুখ্যু কমনেকারের! তার বলে হাড়ির হাল। না পাচ্ছে

নিজে খেতে, না পাচ্ছে মেয়েডারে খাওয়াতে। তোর য্যামন কথা!

যেমন কথাই হোক, হেলা বুঝতে পারল তার মন্ত্র ঠিক কাজ করেছে। দোরের আড়াল থেকে একজোড়া চোখ তার মুখের ওপর ঘোরাফেরা করছে।

দুপাটি দাঁত বের করে রসাল হাসি হাসল হেলা।

খুড়ো মোর সেকেলে মানুষ, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কালে কালে কি যে হচ্ছে খবরই রাখ না।

কি বলছিস রে হেলা, কালে কালে কি হচ্ছে? বেশ যে জমিয়েছিস দেখছি। হেলার সমস্ত আবেগ, উৎসাহ জল হয়ে গেল। চন্দর আর হেলার অগোচরে কখন পঞ্চু এসে দাঁড়িয়েছে কাছে।

বল, বল। কালে কালে কি হচ্ছে বললি নে ত?

মাইরি বলছি পঞ্চা, কোন্ শালা ভাঁড়াচ্ছে। হুঁকো থেকে কলকে নামিয়ে ডান হাতে করে ধরল হেলা। এই হাতে মোর কলকে, মানে মাটি বসুমাতা, আর এই আগুন সাক্ষাৎ বেম্মা। এই বত্রিশবন্দ ঘরে বসে বলছি, কাউর নিন্দে করে থাকি ত মোর জিব খসে পড়বে। বল না গো চন্দর খুড়ো, তুমিই বল না?

চন্দর খুড়ো কিছু বলুক আর না বলুক, পঞ্চু আর থাকতে পারল না।

দিব্যি করতে হবে না হেলা, বামুন-পাড়ায় আনাগোনা করে ঐগুনো খুব শিখিছিস। বলতে পারিস আমাকে, কি ছিলি তুই আর কি হইছিস? তোর সঙ্গে মিশতে এখন ঘেন্না করে।

একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল হেলা। বোশেখের আকাশ তখন তামার পাতের মত জ্বল জ্বল করছে। হেলার মুখখানা একটু কুঁচকে

উঠল। ভদ্দর নোকের সঙ্গে ত তুইও মিশিলি পঞ্চা। আজ আবার তেনাদের নিন্দে করছিস কেন?

ভদ্দর নোকের নিন্দে আমি করিনি হেলা। তবে তাদের সঙ্গে মিশিছি বলে তাদের আঁস্তাকুড়ের কুকুর হয়ে পড়ে থাকতে পারব না। চললি কেন হেলা, শোন, শোন।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার পথটা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হেলা।

ও শূয়োরটার সঙ্গে কেন তোমরা মেশ বলতে পার? পরের কেচ্ছা শুনতে বড় ভাল নাগে, না? বাপকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু। ছেলেকে ইশারায় কাছে ডাকল চন্দর।

তুই কি হলি বলত পঞ্চা? রাতদিন অমন মারমুখো সেপাই হয়ে থাকলে কি চলে বাপু? বস্। তেঁতে পুড়ে এলি, একটু ঠাণ্ডা হ। যা খরা নেগেছে এবার। ধানপাট সব জ্বলে গেল। পঞ্চু বসল। ছেলের হাতে হুঁকোটা তুলে দিল চন্দর।

জ্বলুক আর পুড়ুক, তাতে তোমারই বা কি আমারই বা কি? জমিও নেই, আর তার ভাবনাও নেই।

তা বললে কি হয় রে বাবা? চাষ হচ্ছে গাঁয়ের নক্ষ্মী। জমি নাই বা থাকল। কোন পুরুষেই মোদের জমি ছেল না। সেবার যখন অজম্মা নাগল, পর পর দু'সন মোড়লরা ধম্মরাজ পূজো করল। ভাল ভাল বামুন, গাঁ-শুদ্ধু মেয়েপুরুষ সম্মাই হত্যে দিয়ে পড়ল। আমি তখন ভাল করে কাপড় পরতে শিখিছি। তখন গাঁ ছেল কি, সোনার গাঁ!

ধাঁ করে জবাব দিল পঞ্চু। তোমরা ত শুনিছি নেংটি পরতে বাবা, আর মেয়েরা টেনা। ছেলেপুলের মা হলে মেয়েনোক আর গায় কাপড় রাখত না।

ওসব কথা তোরে কেডা বলেছে রে পঞ্চা ? তোর ঠাকমারে ত দেখিস্ নি। বুড়ো বয়স অবধি তার মুখ দেখেনি কেউ ভাল করে। তবে পুরুষমানুষ মাঠে খাটে, জলে নাবে, গাছে ওঠে। নম্বা কোঁচা দিলেত চলত না। সে বরং আজকাল হয়েছে বলতে পারিস। বাবুদের বাড়ীর ধেড়ে ধেড়ে মেয়েগুনো, হাতীর মতন গতর, দু'তিন ছেলের মা হবার বয়স হয়েছে, ঘাগরা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেঁটো থেকে উরোত পর্য্যন্ত হাঁ হাঁ করছে।

আবার তুমি কেচ্ছা আরম্ভ করলে বাবা। ঐ জন্যেই ত তোমার কাছে বসি নে।

কেচ্ছা নয় পঞ্চা, সেকালের কথাই বলছি। বামুন ছেল দেবতা, মাথার মণি। শূদ্দুরের ছেঁয়া মাড়ালে চান করত। জোরও ছিল তেমনি। মুখে যা বলেছে, হয়েছে। একটু নড়চড় হবার যো ছেল ?

উচ্চবর্ণের ওপর প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা ছিল পঞ্চুর। তবুও বাপের এতটা উচ্ছ্বসিত বর্ণনা তার ভাল লাগল না। এসব কথা সে আরও অনেক শুনেছে পাড়ায় গল্পের মজলিশে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আড্ডা দিয়ে বেড়িয়েছে। আর বিচিত্র কল্পনার খোরাক জুটিয়েছে দিনের পর দিন,—ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মতেজ, মুনি-ঋষিদের গল্প, জহ্নুমুনির উপাখ্যান, কপিল মুনির রুদ্ররোষ, বিশ্বামিত্র, দুর্ব্বাসার অভিশাপ। খেলতে খেলতে বামুনের ছেলের গায় পা ঠেকেছে। গাদি খেলতে গিয়ে ল্যাং মেরেছে। খেলা মিটে গেলেই পায়ের ধুলো নিয়েছে। মনে মনে মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছে বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা, অগস্ত্য, কপিলের বংশধরদের কাছে।

সত্যিই কি তুমি এসব চোখে দেখেছ বাবা ? ছোট ছেলেটির মত বাপের গা ঘেঁষে সরে এল পঞ্চু।

চোখে দেখা বইকি বাবা। ঐ যে ভুবন ঠাকুর রে, ওনার দাদামশাই কমল বাঁড়ুয্যে কলকাতায় বাবুদের বাড়ী কাজ করত। মাইনে ছেল বছরে বার টাকা; সম্‌বছরের চাল আর পূজোর সময় গাঁয়ের বেবাক মেয়েপুরুষের একখানা করে কাপড় পেত। জমিদারের নাবালক ছুটো বাচ্চা মানুষ করে সিন্দুকের চাবি হাতে তুলে দিয়ে ঘরে এয়েল। একটা পয়সাও তছ্‌রুপ্‌ করেনি। নিজের চোখে দেখিছি খাটুলিতে বসে পাখার বাসাত খেতে খেতে গঙ্গাযাত্রা করতে। গঙ্গা ছেল তখন ঐ শুকসাগরে। তেনার জ্ঞেয়াতী-ভাই কালিনাথ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে একবার ঝগড়া হল। কালিনাথ বলল, কম্‌লা তুই মরবি। তিনি বলল, না কালিনাথ তুই আগে মরবি। ঐঠানটায় বসে তোর মুখ দিয়ে ছটাক ছটাক রক্ত ওঠবে দেখব; তারপর আমি মরব। ঠিক তাই হল।

পঞ্চু লক্ষ্য করল, চন্দরের গায়ের লোমগুনো খাড়া হয়ে উঠেছে। তবুও অবিশ্বাস জানাল পঞ্চু। ওসব কথা আমিও অনেক শুনিছি। আজকাল আর বিশ্বেস হয় না।

বিশ্বেস হয় না? কি বলিস পঞ্চা? হবে না, হবে না করে তুই হয়েলি। হয় না হয় তোর ঐ ইয়েরে জিগ্যেস কর। ছেলে হবার বয়স পার হয়ে গেলে গাজনতলায় বাবা বুড়ো শিবের কাছে ধন্না দিয়ে পড়ল আমার মা। উপচাঁদ চক্কোর্ত্তি ছেল তখন। চৈত্তির মাস, নীল পূজোর দিন। শিবের মাথায় ফুল চেপিয়ে দিল উপচাঁদ ঠাকুর। ছু'ঘণ্টা কেটে গ্যাল, ফুল আর পড়ে না। নাক টিপে কাঠ হয়ে রইল উপচাঁদ ঠাকুর। এক বেগৎ উঁচু হয়ে উঠে টপ্‌ করে বাবার মাথা থেকে ফুল ঝেঁপিয়ে এসে পড়ল। তবে না, তুই হলি?

এ গল্পও পঞ্চুর শোনা। শিবের ভূত বলে ছেলেবেলায় তাই।

করত তাকে মা। ঝন্ ঝন্ করে দোরের শিকলটা নড়ে উঠতেই ঘরে চলে গেল পঞ্চু।

নাইতে খেতে হবে, না বসে বসে গপ্প করলেই পেট ভরবে?

পঞ্চু জবাব দেবার আগেই উত্তর দিল পঞ্চুর মা। সকাল থেকে পাঁচবার বল্লাম পঞ্চা আজ এখেনে খাবে, তুমি খেয়ে ন্যাও। কথা কানে যায় না কেন?

পঞ্চুর বউয়ের মেজাজটা ঠিক ছিল না। খর বৈশাখের উত্তেজনায় ভেতরটা একেবারে ভরে ছিল। ভরন্ত যৌবনকে তার ছুপায়ে মাড়িয়ে চলছে পঞ্চু। সেই কথাই একটু আগে জানিয়ে দিয়ে গেল হেলা। এত বড় সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বাপ তাকে ডেকে রূপকথা শোনাতে বসল। মা এল ভাতের থালা নিয়ে। এখুনি একখাবলা তেল মাথায় দিয়ে বিল থেকে ডুব দিয়ে এসে ভাতের থালা কোলে নিয়ে বসবে। তারপর আর কে কার? এক ঘুমে বেলা গড়িয়ে যাবে।

কাল থেকে যে পান্ত ভাতের পিণ্ডি রয়েছে গিলবে কেডা শুনি? চাল কি অত সস্তা হয়েছে না কি? পঞ্চুর পৌরুষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

কত চাল তোর চাই বল ত? যতদিন মোড়লদের ভুঁই আছে, আর পঞ্চুর হাতে লাঠি আছে, আমার অন্ন মারে কোন শালা!

ঐ তেজেই গেলে। আর ত কিছু জান না। ইদিকে হাতে যখন হাতকড়া পড়বে লাঠি ধরবা কি দিয়ে শুনি?

হাতকড়া পরায় কোন শালা? তোর ঐ হেলা বুঝি?

মুখ সেম্‌লে কথা বল বলছি। হাতকড়া কেডা পরাবে জান না? জমিদারের পেছনে নেগেছ, কচি খোকা না কি তুমি? চেন না মজুমদার বাবুরে? পঞ্চু বউয়ের কাছে এগিয়ে গেল। চন্দর দাওয়ার এক কোণে বসে ঝিমিয়ে পড়েছে। এমনি রোজই ঝিমোয়। পুত্র

পুত্রবধূর সরব আলাপ, ঝগড়াদ্বন্দ্ব তার জাগ্রত পিতৃচৈতন্যকে আঘাত করে। গা-সওয়া হলেও মন ঠিক সহ্য করতে পারে না এই ঔদ্ধত্য।

মুখ ভেংচে বলল পঞ্চু। মজুমদার বাবুরে খুব চিনি। আমার চেয়ে কেডা বেশী চেনে তারে এ গাঁয়ে ?

পঞ্চুর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। উভয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যেই ছাতি মাথায় দিয়ে একেবারে বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়াল ভূপতি মজুমদার। সমস্ত বাড়ীখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে চন্দরকে বলল মজুমদার, কি গো চন্দর ? ভাল ত সব ? বাকশক্তি হারিয়ে প্রথমটা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল চন্দর, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে হেঁট হয়ে প্রণাম জানাল নিঃশব্দে। ছোট জাতের বাড়ী বয়ে এলেও, সময়ের দাম ছিল মজুমদারের। তাই চন্দরকে ছেড়ে দিয়ে পঞ্চুকে বলল, ইদিকে একবার আয় ত পঞ্চা, কথা আছে। অঙ্গনের এলাকা পার হয়ে বাড়ীর প্রবেশমুখে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। উদ্দেশ্য আলাপটা যাতে বাড়ীর লোকের কানেও যায়।

ভূপতি মজুমদার বলল, ডেকে পাঠালে যদি না যাস্, তাই নিজে এলাম। ছেলেবেলায় অনেক খেলা করেছি দুজনে। খেলুড়েদের ওস্তাদ ছিলি তুই। তখন কিন্তু ভাবিনি, তোর হাতের লাঠি পড়বে আমার মাথায়।

কথাটায় কিছু সত্য ছিল। বামুনপাড়ায় ছেলেদের খেলার দলপতি ছিল একদিন পঞ্চু। পঞ্চুর বন্ধুত্ব কামনা করেনি এমন ছেলে কেউ ছিল না।

যে কারণেই হ'ক, পঞ্চুর সঙ্কোচ সরে গেল। উত্তরে বলল, আমিও ভাবিনি, যে আমার হাতে দড়ি পরাবেন আপনি।

বস্তুতঃ চরের জমি উপলক্ষ্য করেই এই বিচ্ছেদ। কিন্তু বন্ধুত্বের ফাঁস আলগা হয়েছিল অনেকদিন আগে। ভাঙ্গাচোরা হলেও জমিদারের বংশধর ভূপতি, আর তুলের ছেলে পঞ্চু। ভূপতি মজুমদার বলল, লাঠি ধরতে গেলি তুই অভয় মোড়লের হয়ে, অথচ মাইনে দিয়ে লেঠেল পুষছি আমি, একি কম দুঃখের কথা পঞ্চা ?

ভূপতির মুখের দিকে চেয়ে মাথা নীচু করে বলল পঞ্চু। লাঠি আর আমি ধরব না বাবু।

মজুমদার হেসে ফেলল, তা হয় না পঞ্চা। সাপের দাঁতে যখন বিষ জমে, কিছু না পেলে মাটিতেই সে ছোবল মারে। যাক্‌গে। এক আধবার গেলেই ত পারিস ওদিকে। বলেই গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মোড়লরা কি রকম দিচ্ছে টিচ্ছে আজকাল ?

একটুখানি থেমে বলল পঞ্চু, কেন আর লজ্জা দ্যান বাবু। টাকা নিয়ে লাঠি ধরা আমার ওস্তাদের বারণ।

আমিও ত তাই জানতাম পঞ্চা। ভোলা সর্দ্দারের তাই নিয়ম ছিল। তবে না কি অভয় মোড়ল খুব গাবিয়ে বেড়াচ্ছে। বাঁধা মাইনে দিয়ে রেখেছে তোকে।

ও সব মিছে কথা। সংক্ষেপে প্রতিবাদ করল পঞ্চু।

মজুমদার বলল, যাক্। তোর সঙ্গে দেখা হল, তাই এত কথা শুনতে পেলাম। দেখাসাক্ষাৎ না থাকলে ঐ রকম হয়। অনেক বাজে কথা শুনতে হয়। যেমন একটু আগে হাতে দড়ি দেবার কথা বলছিলি।

তা হলে হেলা যে বলে, রাত্তিরে আমি কোথায় থাকি খবর রাখতে বলেছে দারোগা, এও কি মিছে কথা ?

কথাটা শুনেই অন্যদিকে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে বলল মজুমদার,

কাল একবার আমার কাছারিতে যাস্, সব শুনতে পাবি। কেমন যাবি ত?

যাব।

মজুমদার চলে গেল। চন্দর বলতে লাগল, দেখলি ত পঞ্চা। কত জনা কত কথা বলে। কি রকম মেজাক্ দেখলি? হোক দিনি আমাদের ছুলের ঘরে পয়সা, ধরাকে সরা দ্যাখবে। ঐ দ্যাখ্ না এশো। ছু মুঠো ধান তুলেছে ঘরে, ত গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

অন্যমনস্কভাবে হুঁ বলে চুপ করে রইল পঞ্চু।

একটু পরেই জলের কলসী নিয়ে ঘাট থেকে এসে বলল পঞ্চুর মা, মজুমদারবাবু আর হেলা ঠিক দুকুরে ঘোরছে কেন?

হেলা? হেলা আবার কমনে থেকে জুটল? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

চন্দর ধমকে উঠল, তুই কি স্বপন দেখছিস না কি? বাবু ত এই গ্যাল এখান থেকে। মোদের বাড়ী বয়ে এয়েল বাবু।

বেশ, বলে রান্নাঘরে চলে গেল পঞ্চুর মা।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে উঠে পড়ল পঞ্চু।

৫

মজুমদারের বাড়ী থেকে পঞ্চু যখন ফিরে এল, কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ দেখা দিয়েছে বাঁশ ঝাড়টার আড়ালে। বাড়ীর উঠানে পাঁচ ছ জন লোক। তামাকের কড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে একেবারে ঘরে চলে গেল পঞ্চু। সমস্ত শরীর তার সোলার মত হাল্কা, মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে।

তাই ত চন্দর খুড়ো! পঞ্চুর হল কি? সাঁঝ নাগতে এসে

বসিছি, তিন পর রাত হয়ে গেল। ছোঁড়া যায় কম্‌নে বল ত? অভয় মোড়লের গলা।

ঘোরছে কম্‌নে। ডবকা বয়েস। সাঁঝের বাতি জ্বললে ওদের পায় কেডা? একজন মন্তব্য করল।

না ঝড়ু। হক্ কথা বলব বাপু। পঞ্চুর সে রকম লেচার নয়। ওর মতন গুড্ বয় এ পাড়ায় নেই। কথায় কথায় ইংরাজী বলার অভ্যাস অভয় মোড়লের।

গুড্ বয়ই বল আর ব্যাড্ বয়ই বল, পঞ্চু তোমাদের ফাঁদে আর পা দেচ্ছে না মোড়ল। ঘর থেকে বাইরে এল পঞ্চু। কথাগুলো একটু জড়ান।

কেডারে? পঞ্চা কখন এলি? অভয় মোড়ল দাঁড়িয়ে উঠল।

তোমরা কতক্ষণ বলত? ও কেডা, ঝড়ু, বিষ্টু, মোহন? বাঃ বাঃ। একেবারে চাঁদের হাট যে! কমনে কার জমি কাড়তে হবে; না ঘর জ্বালাতে হবে? ওসবে আর নেই বাবা। তবে যদি কারুর মেয়ে কাড়তে হয়, আলবৎ, এখুনি রাজী।

এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল চন্দর, আর পারল না। কোন রকমে কুঁজো হয়ে পঞ্চুর সামনে এসে বলল, শনিবার। বার ভাল নয়। বেরষনাড়ার পাশ দিয়ে এলি ত? বহুকাল পূর্ব্বে আদ্যশ্রাদ্ধের বৃষকাঠ স্থানান্তরিত করা হত ছোট একটা ডোবায়। ভয়ের কিংবদন্তী নিয়ে অনেকখানি পড়ো জায়গা আগাছা আর জঙ্গলে ভরতি হয়েই পড়ে ছিল।

পঞ্চু হেসে গড়িয়ে পড়ল, রোজার ঘাড় মটকাবে ভূতে? ঘুঘরো বাণ দেখিয়ে দেব না? সরষে পড়া, হলুদ পড়া, লঙ্কা পড়া, হাড়মাস কালি করে ছাড়ব। বলতে বলতে সর্ব্বশরীর এলিয়ে দিয়ে ধপ্ করে

দাওয়ার ওপর বসে পড়ল পঞ্চু। অভয় মোড়ল একেবারে পঞ্চুর মুখের কাছে সরে এল।

হুঁ। যা ভেবিছি তাই। খুড়ো পঞ্চুকে শুয়ে পড়তে বল। চল হে, আজ সুবিধে হবে না।

কি বাবা! চললে কেন? পছন্দ হল না?

দলবল সমেত অভয় মোড়ল চলে গেল।

হঠাৎ হাউমাউ করে মায়ের দুটো পা জড়িয়ে ধরল পঞ্চু। ও মা, মাগো! কত দুঃখই না দেলাম তোরে!

পঞ্চা! এ কি করছিস? পঞ্চুর মার গলার স্বরে দুর্ব্বলতার চিহ্নমাত্র ছিল না। মায়ের পা ছেড়ে দিল পঞ্চু, কিন্তু আবেগ তার তখনও থামে নি।

কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়। সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে মটিতে শুয়ে পড়ল পঞ্চু।

বলি হ্যাঁরে? মান্‌কেরে ডাকব একবার? চন্দর বলল।

না, না। ঘরের কেলেঙ্কারী আর পাঁচ কান করো না। ছোট নোকের ঘর বয়ে এয়েছে জমিদারবাবু, সোহাগে একেবারে ফেটে পড়েলে। এখন নিজেই ছ্যাখ, মাণিক আর কি ছ্যাখবে? দাঁতে দাঁত চেপে বলল পঞ্চুর মা। চন্দরও যে বোঝেনি, তা নয়, কিন্তু সবটুকু তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিশেষ করে পঞ্চু কোনদিন নেশা করেনি, অন্ততঃ চন্দরের নজরে পড়েনি।

তুই ঠিক বলছিস? পঞ্চা নেশা করেছে? উপরি হাওয়া টাওয়া নয় ত?

না, না! কেন ভ্যান ভ্যান করছ? ন্যাও, শুয়ে পড়। বউ,

হাতখানা একটু ধর্‌সে, ঘরে শুইয়ে দেই। তারপর মাথাডায় একটু বাসাত কর।

মা আর বউয়ের সাহায্যে ঘরে গেল পঞ্চু।

পঞ্চুর মা বলল, দুয়োরটা খুলে থোও। একটু হাওয়া নাগুক মাথাডায়। কিন্তু দোরটা ঝপাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল পঞ্চুর মা। রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যেই বউয়ের নিঃশব্দ প্রতিবাদটা দাগ কাটতে লাগল মনে। বার বছরের মেয়ে ঘরে এনেছিল, দেখতে দেখতে বড় হল। আঠার বছরে পড়ল। ছেলে হবার নাম নেই। বাঁজাকাঠ। সমস্ত রাত ধরে জ্বালিয়ে মারে ছেলেটাকে। ভূতের মত লাফঝাঁপ করে বেড়ায় পঞ্চু। রাতে একটু সুস্থিরে ঘুমুতে পায় না। কোলে-কাঁখে দুটো কচি কাচা থাকলে, খানিকটা তেজ মরত। পঞ্চুরও ঘর সংসারে মন বসত। কথায় কথায় লাঠিবাজি করতেও যেত না, পরের পাল্লায় পড়ে নেশাও করত না।

চন্দরের মনেও দাগ কাটছিল। শেষ পর্য্যন্ত একেবারে বয়ে গেল ছেলেটা! এঁটোপাতা কখন স্বর্গে যায়? মোড়লরা পর্য্যন্ত জেনে গেল, আর উপায় আছে? কালই দুবোতল মদ খাইয়ে দেবে, আর মানুষ খুন করতে বলবে? মদের নেশায় যখন পেয়েছে আর কতক্ষণ সামলে থাকবে। জীবনে একদিন মদ খেয়েছিল চন্দর। নরহরি সরকার জোর করে খাইয়েছিল। পঞ্চু তখন হয় নি। গঙ্গায় ডুবে মাটি খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল চন্দর, জীবনে আর কখনও মদ ছোঁবে না।

শুনছিস? ঘুমুলি নাকি?

কি বলছ?

আমিও একবার মদ খেয়েলাম।

রাজা করেলে! তা কি করতে হবে? নাচব?

মারতে আসছিস্ যে? কি ধেয়ান করছিলি?

ধেয়ান করছি কবে তুমি খেজুর তলায় যাবা। আমার হাড়ে বাসাত নাগে।

গলা খাটো করে রসিকতা করল চন্দর, বাসাতে পাল তুলে দিবি না কি মনের মানুষের সঙ্গে?

কি দিয়ে পাল তোলব? কি রেখেছ তুমি? খেটিয়ে খেটিয়ে ত গতর জল করে দিয়েছ। বলতে নজ্জা নাগে না?

চন্দরের একটা দুর্ব্বলতা ছিল। স্ত্রীকে সে মোটেই বিশ্বাস করত না। অথচ দুলেদের মধ্যে তার মত সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক আর একটিও ছিল না। আচারে ব্যবহারে, শুদ্ধতায় শুচিতায় বামুনের মেয়েরাও তার নাম করে। বহুদিনের পুরাতন ব্যাধির মত বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সন্দেহের প্রকোপটা আরও বেড়ে গিয়েছিল চন্দরের।

তুই যে একেবারে তেউড়ে উঠলি। তামাসা করে একটা কথা বললাম, আর তুই কত কথা শোনালি। চন্দর বউয়ের কাছে সরে এল।

যাও আর জ্বালিয়ো না। একটু ঘুমুতে দ্যাও।

এ রকমের অভিনয় প্রায়ই চলে। চন্দর শুয়ে পড়ল।

পঞ্চু অঘোরে পড়ে আছে আর মাঝে মাঝে হাত পা ছুঁড়ছে। মাথায় পাখা দিয়ে হাওয়া করছে বউ। অন্ধকার ঘর। ঘরের সবটুকু তার মুখস্থ। এটুকু তার খাস মহল, বিশেষ করে রাতে—এ সময়টা পঞ্চু তার নিরীহ প্রজা। আজ কিন্তু স্বামীকে সে তার আয়ত্তের মধ্যে

খুঁজে পাচ্ছে না। পঞ্চুর এ অবস্থা সে আজ নূতন দেখছে। তা বলে মাতাল যে সে দেখেনি তা নয়। তারই ভগ্নিপতি তাড়ি খেয়ে তার দিদিকে একবার আধমরা করে ছেড়েছিল। নিজের চোখে দেখেছে সে। আবার তার বাপ মায়ের চোখের ওপর তাকে জড়িয়ে ধরে কত আদর সোহাগ করেছে ; এখনও সে কথা মনে করলে তার সারা গায় কাঁটা দেয়। কিন্তু এই যে এতক্ষণ সে একভাবে বসে আছে পঞ্চুর সামনে, ছু-তিনবার ভিজে গামছা দিয়ে সারা গা, মাথা মুছিয়ে দিল, একটা কথাও ত বলল না পঞ্চু। পাশ ফিরতে গিয়ে বিড়বিড় করে পঞ্চু কি একটা বলতেই, সে পঞ্চুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

কি বলছ গো ? জল খাবা ?

অন্ধকারে পঞ্চুর চোখদুটো একবার ঝকঝক করে উঠল। রাত্রিচর শ্বাপদের মত তীক্ষ্ণসঞ্চারী এ দৃষ্টি উভয়েরই পরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া সবল হাতের বজ্রবন্ধনে বউয়ের শ্বাসরোধ হয়ে এল।

ছাড়, ছাড়। ফাঁসি নেগে গেল যে! মাগো, কম্‌নেকারের ডাকাত তুমি! কিন্তু ডাকাতের মুখ থেকে যে উত্তরটা আশা করেছিল বউ, তার কিছু ত এলই না, অধিকন্তু হাত দুখানা আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে সশব্দে মাটির মেঝেয় আছড়ে পড়ে গেল।

কি হল ? রাগ করলে না কি ? এবার সমস্ত দেহটা দিয়ে সে পঞ্চুকে চেপে ধরল। পঞ্চুর হাত দুখানা নিজেই টেনে নিয়ে গলায় পরিয়ে নিল বউ।

এইবার কথা বলল পঞ্চু, কিন্তু তার চেয়ে বোধ হয় তার চুপ করে থাকাই ভাল ছিল। কেন জ্বালাচ্ছিস্ বল্ ত ? শরীল ভাল নেই, তাতেও কি নিশ্চিন্দি পাব না। এমন জানলে কোন শালা বিয়ে করত।

ঝনাৎ করে দোর খুলে শাশুড়ীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল বউ। পঞ্চুর মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। চন্দরেরও নাক ডাকার শব্দ আসছে। কতদিন এ রকম রাগ করে সে বাইরে এসে শুয়েছে। হয় শাশুড়ী-বলেকয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে, নয়ত পঞ্চু হাত ধরে ডেকে নিয়ে গেছে। আজ সারারাত এইভাবে কাটালেও, কেউ তাকে ডাকবে না, কোন কথা বলবে না। হঠাৎ বাড়ীর উঠানে খানিকটা আলো পড়ল। কে আসে আবার এত রাত্রে? ঘাড় তুলে দেখতে গেল বউ, কিন্তু ঠিক দেখতে পেল না। একটু পরেই মনে হল একজন লোক বাড়ীর উঠানের ওপর চলাপথ ধরে এগিয়ে এসে আলোটা একবার তুলে ধরল দাওয়ার ওপর। তারপর একটু দাঁড়িয়ে গেল। এইবার স্পষ্ট চিনতে পারল বউ। হেলা চৌকিদার। হাতে লাঠি নেই, গায় জামা নেই। উঠে ঘরে যেতে চেষ্টা করল বউ, কিন্তু রাজ্যের লজ্জা এসে তার সমস্ত শরীর অবশ করে ফেলল। শাশুড়ীর গায় হাত দিয়ে ডাকল চুপি চুপি কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

মরণ আর কি! সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ল কথাটা।

তাড়াতাড়ি পথ ধরে এগিয়ে গেল লোকটা। কিন্তু তার মধ্যেই স্পষ্ট লক্ষ্য করল বউ গালাগালিটা হাসিমুখেই ধরে নিয়েছে হেলা। আলোটা অদৃশ্য হয়ে যেতে সে উঠে বসল। কান মাথা দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। উঠানের জলের কলসীটা থেকে খানিকটা জল নিয়ে মাথা মুখ ধুয়ে ফেলল। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে শরীরটা যেন জুড়িয়ে আসছে। হঠাৎ তার মনে হল যেন চারপাশের পূঞ্জীভূত অন্ধকারের ভেতর থেকে অসংখ্য হাত বেরিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরছে। ঠাণ্ডা কনকনে, শুকনো হাড়ের মত। বুকের ভেতর পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

মা গো। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সটান ঘরে চলে এসে সে একেবারে পঞ্চুর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। একটু হয়ত ঘুমিয়েছিল পঞ্চুর বউ, চন্দরের ডাকে উঠে বসল।

পঞ্চু, পঞ্চু। একবার ওঠ না। দয়া তোরে ডাকছে।

ওগো শোনছ ? দয়াবুড়ী তোমায় ডাকছে। পঞ্চুর বউ ডাকল।

কেডা ? জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু।

চন্দর বলল, দয়া রে। সাবির মেয়েডা বোধ হয় আর বাঁচে না।

আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠল পঞ্চু। নেশার জড়তা যেন কেটে আসছে।

কি হয়েছে দিদিমা ? বাইরে এসে ধপ্ করে বসে পড়ল পঞ্চু।

হবে আর কি ? য্যাত সব অনক্ষণ। শনিবার আর যে তেপেঁকে গাঁ। একটা যদি গ্যাছে ত আর দু'ডোরে টানবে।

দুটোর একটা দেখছি তোমারেই টানবে। কি হয়েছে বল দিনি, শুনি ?

দেখলে ছোট ভাই। ছেলের কথাডা শোনলে। চন্দরকে বলল দয়া বাগদি।

ঐ জন্যেই আসতে চাই নি। কি করব। নেহাৎ ছুঁড়িডা বলল, দেখলেও মায়া নাগে। একরত্তি মেয়েডা নিয়ে আঁড় হয়েল।

মেয়েটা আছে কি নেই বলবে কি ? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

আছে কি এতক্ষণ গ্যাছে কি করে বলব, বল।

বুঝিছি, চল। লাঠি গাছটা আর গামছাখানা দেত বউ।

দেরী দেখে বুঝল পঞ্চু, বউ তার আদেশ প্রতিপালন করতে ততটা রাজী নয়। অগত্যা সে নিজেই গামছা আর লাঠি নিয়ে দয়ার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

৬

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে ছ-আনি তুলেদের পাড়ায় এল পঞ্চু। ইচ্ছা করেই কদিন এ পথ সে মাড়ায় নি। ঝোপ জঙ্গলের ভেতর মাঝে মাঝে এক একখানা খড়ের চালা। আচমকা মানুষ দেখে বীভৎস চিৎকার করে উঠছে পাড়ার কুকুর। আপন মনেই পথ চলছে পঞ্চু। দয়াবুড়ীর অনর্গল বকুনির একটা জবাবও দিচ্ছে না। রুক্ষ, কঠোর একটা অভিমান তার গলা পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠেছে। সময় থাকতে একটু খবর দেওয়া কি উচিত ছিল না সাবির? অথচ পাড়াশুদ্ধ লোকের দোরে মাথা খুঁড়ে বেড়িয়েছে! সেই ফিরিস্তিই তাকে এতক্ষণ শোনাচ্ছে দয়াবুড়ী।

সাবির ঘরের দোর বন্ধ ছিল। কেমন একটা ছমছমে ভাব! খোলা জানলার ভেতর দিয়ে স্তিমিত আলোর শিখায় মনে হল পঞ্চুর মৃত্যুদূত যেন চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। পঞ্চুর পা দুটো অবশ হয়ে এল।

আস্তে আস্তে দোর খুলে বাইরে এল সাবি।

এখন কেমন আছে খুকী? দয়াবুড়ী জিজ্ঞাসা করল।

ঘরে এস তোমরা। সাবির চোখে একফোঁটা জল নেই, কান্না চিৎকারের নামগন্ধ নেই। এমন কি ঘরে মেয়ের কোন চিহ্ন নেই।

খুকী কমনে রে সাবি? দয়াবুড়ী চিৎকার করে উঠল।

দেওয়ালের গায়ে বিলম্বিত জরাজীর্ণ একখানা মহাকালীর পটের ঠিক নীচে ছেড়া কাঁথা আর কাপড় জড়ান একটা পুঁটুলির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সাবি।

নেই? এইবার পঞ্চুও চিৎকার করে উঠল।

পঞ্চুর চোখের দিকে চেয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সাবি। কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর ফুটল না।

কখন গেল ? ওমা, তুই কি পাষাণ পেরাণ লো ! কি করে চুপ মেরে আছিস ?

আঃ, চুপ কর না দিদিমা। বলে দু হাতে রগ টিপে মেঝের ওপর বসে পড়ল পঞ্চু। দিদিমা কিন্তু সে পথ দিয়েও গেল না। সত্তর বছর বয়সের একক জীবনের ভাগ্যনিয়ন্তা নিষ্ঠুর বিধাতা-পুরুষের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে নিশুতি রাত্রের নিস্তব্ধতাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে তুলল।

ওরে আমার কপাল রে ! পোড়া যমের কি চোখ কান নেই রে ! ওরে আমার ক্যাবলারে খেয়েও তোর পেট ভরেনি রে ! ওরে আমার মাণিক রে, ক্যাবলাধন রে ! আহা হা হা হা।

অনেক রকম করে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদেই চলল দয়াবুড়ী। দেখতে দেখতে, মেয়েপুরুষে, ছেলেয় বুড়োয় দু দশ জন লোকও জমে গেল সাবির ঘরের সামনে। কোন রকমে পা টেনে টেনে ছোট্ট শবদেহটার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল সাবি। অনেকে অনেক প্রশ্ন তুলল। সাবির হয়েই কোনরকমে উত্তর সেরে দিল দয়াবুড়ী।

ও মোরা জানতাম। বাঁচবার আর কোন হাল ছেল না মেয়েডার। একলা মানুষ, ব্যাওয়া বিধবা, কি করেই বা কি করবে ? ঘরের দিকে চেয়ে মন্তব্য করল তারা বাগ্দি।

অনেকে সহানুভূতি জানাল, চোখের জলও পড়ল দু এক ফোঁটা। শেষ পর্য্যন্ত ব্যবস্থাও দিল দু একজন। সাবির দিক দিয়ে না হলেও গ্রামের দিক দিয়ে তার প্রয়োজনীয়তা বড় কম নয়।

যা হবার তাত হয়েই গিয়েছে। এখন গাঁয়ের একটা নক্ষণ,

অনক্ষণ আছে ত। শনিবার। তুকুর রাত। কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করে ত সম্মাই। একটা নিমের ডাল ভেঙ্গে এনে তুয়োরের কাছে থো। আর একটা গোবরের পুতুল বার তুয়ারের কাছে বসিয়ে থো।

ধৈর্য্য হারিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পঞ্চু।

তোমরা সব বাড়ী যাও ত। যা করবার আমরাই করছি। আর যদি উব্‌গার করবার ইচ্ছে থাকে, একজনা আমার সঙ্গে থাক।

পঞ্চুর কথায় ঠিক কাজ হল। তু পাঁচজন একটু দূরে সরে গিয়ে কি মন্ত্রণা করে পায়ে পায়ে অন্ধকারের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। যাবার সময় তু একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা আলোচনা অবশ্য পঞ্চুর কানে বিঁধিয়ে দিয়ে যেতেও ছাড়ল না। ভিন গাঁ থেকে দরদ ফলাতে এয়েছে, যা পারে নিজেই করুক না।

দয়াবুড়ীর নামটার হয়ত কিছু সার্থকতা ছিল। তাই সাবির মুখ চেয়ে এবং গাঁয়ের মুখ চেয়ে যতটা সম্ভব সবই করল ; নিমডাল থেকে গোবরের পুতুল কিছুই বাদ গেল না।

এইবার একটু বুক বাঁধ দিদি, ওঠান থেকে একটু সরে শো। পঞ্চুকে ইশারায় কাছে ডাকল দয়া। মেয়ের কাছ থেকে উঠে এসে ছোট্ট একটা ঝাঁপি থেকে সিকি, তুয়ানি, আধুলিতে গোটাকতক টাকা বের করল সাবি।

ঐ কটা ট্যাকা ধরত পঞ্চুদা। টাকাটা হাতে করে নিতেই বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল পঞ্চুর। সেদিনের দেওয়া টাকাকটা কি তা হলে খরচ করেনি সাবি ?

ট্যাকা কিসে নাগবে সাবি ? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

মড়িঘাটার ভশ্চার্যি ঠাকুরকে দিয়ো। ওই জন্যেই তোমার ট্যাকাগুনো খরচ করতে পারিনি পঞ্চুদা। মায়ের আমার পেটে

একফোঁটা দুধও দিতে পারি নি ওর থেকে। বলতে বলতে রুদ্ধ আবেগে ভেঙ্গে পড়বার মত হল সাবি।

পঞ্চুর বুঝতে বাকী রইল না কেন টাকাটা খরচ করে নি সাবি। মনে পড়ল সেদিন সাবির চরিত্রের ওপর দোষারোপ করে যাবার সময় কি একটা কটু কথা শুনিয়ে গিয়েছিল।

ঘরে ট্যাকা থাকতেও মা আমার শুকিয়ে মরেছে। ওটা ওর শেষ কাজেই খরচ হ'ক। শেয়াল কুকুরে যেন বাছারে ছেঁড়াছিঁড়ি না করে।

পাকা লাঠিয়াল পঞ্চু, ছেলে মানুষের মত ডুকরে কেঁদে উঠল।

তুই ভাবিস নে সাবি। যা করবার ঠিক করব।

এইবার মাটির ওপর আছড়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সাবি।

দয়াবুড়ী পঞ্চুর হাতে ছোট্ট কাপড়ের পুঁটুলির মত খুকীর জীর্ণ দেহটা তুলে দিল।

সাবির মেয়ের সৎকার সেরে ভিজে কাপড়ে যখন ঘরে ফিরে এল পঞ্চু, রাত আর তখন নেই বললেই চলে। চন্দর আর পঞ্চুর মা দুজনেই দাওয়ায় বসে। অন্ধকারে কলকের আগুন গন গন করছে।

মেয়েডারে তুই থুয়ে এলি পঞ্চা? পঞ্চুর মা জিজ্ঞাসা করল।

হুঁ, বলে ঘরে যাবে, পঞ্চুর মা আবার জিজ্ঞাসা করল: সাবির বাড়ী হয়ে এইছিস ত?

না। ওখানে আমি আর যেতে পারব না।

গোড়ায় সেডা ভাবা উচিত ছিল বাপু। গেছিস য্যাখন, শেষ কাজডাও সেরে আসতে হয়।

মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরে গেল পঞ্চু। অন্ধকারেই কাপড় বদলাল, মাথার চুলগুনো হাত দিয়ে সমান করে নিল। মেঝেয় পাতা মাদুরটার মুখস্থ জায়গায় শুতে গিয়ে তার মনেও এল না, শয্যার অপরাংশের অংশভাগিনীর স্বতন্ত্র সত্তা বলে কিছু আছে কিনা।

আচ্ছা, তুমি কি মনে ভেবেছ বল দিকিনি। বলা নেই, কওয়া নেই, ধপাস্ করে গায়ে গা দিয়ে শুয়ে পড়লে? আমারে না খেলে কি তোমার আশ মেটছে না?

পঞ্চুর মনে হল থলথলে মাংস আর নরম চামড়া ঢাকা হিংস্র একটা পশুকে নিয়ে সে কি করে ভুলে আছে এতদিন? তার মন রাখতে এই কবছরেই সে নাজেহাল হয়ে গেল। বাপ মায়ের সামনেই তাকে আলাদা হাঁড়ি করতে হয়েছে। এ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় কত আলোচনা চলে। অথচ আজ যদি সাবি আসত ঘরে, বাপ মাকে তার মাথায় করে রাখত।

কোন কথা না বলে বিছানা থেকে সরে মাটিতে গিয়ে শুল পঞ্চু.

বড্ডো যে তেজ দেখছি। কথা কানে যায় না।

গায়ে গা দিলে দোষ হয়, ঝগড়া করলে দোষ হয় না? পঞ্চু বলল।

ঝগড়া ছাড়া আর কবে তুমি ভাল মুখে কথা কও। তার জন্যে বলি নি। তবে মেয়েডারে যে ফেলে এলে, এ সময় তোমার মড়া ছুঁতে আছে?

স্ত্রীর অভিযোগের নূতন ধরণের ভাষাটা পঞ্চুর পত্নীবিমুখ মনের সামনে দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়ালের মত পথ আগলে দাঁড়াল।

কেন রে ? ছুঁতে নেই কেন ? চামড়াঢাকা পশুটা দেখতে দেখতে আবার রূপান্তরিত হয়ে উঠল মানুষে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বউয়ের গা ঘেঁষে সরে এল।

সে খবর নেবার মন আছে তোমার ? কদ্দিন থেকে অরুচি ধরেছে খবর রাখ ?

অসহায়া বিধবা বিশেষ করে সাবির শেষ সম্বলটুকুর নিজের হাতে চিহ্নলোপ করে আসার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে অকালমৃতুর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অজস্র কৈফিয়ৎ, নজির, শাস্ত্রবাক্য নিয়ে তোলাপাড়া করছিল পঞ্চু। স্ত্রীর আবদারের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সূক্ষ্ম সুরটার ভেতরে জীবনমৃত্যুর একটা সরল অর্থ যেন আপনা হতেই তার মনের সামনে ধরা পড়ে গেল।

এ কথা আগে বলতে কি হয়েল ?

বললে আর কি করতে তুমি ?

কি করতাম ! তা বটে। না গেলে হয়ত কোন উপায়ই হতনা। পঞ্চুর নিশ্বাসটা ঝড়ের মত বউয়ের মনটাকে জোরে একটা নাড়া দিল।

সেই জন্যেই ত বলিনি। তোমায় বলে কোন নাভ নেই।

মাথা চুলকে বলল পঞ্চু, তা হ'ক্, ওতে কোন দোষ হবে না।

দোষ হলেই তোমার বড় ক্ষেতি। আমার জন্যেই য্যাখন তোমার মাথাব্যথা নেই, তার আমার পেটের সন্তান! ওত শেয়াল কুকুরের পেট ভরাতেই এয়েছে।

পঞ্চু উঠে বসল। ছ্যাখ্। ছোটবেলায় আমার একটা বেরাল ছেল। বাচ্চা হলেই খেয়ে ফেলত। তুইত কতকটা সেই গোছের দেখছি। মুখে বলছিস পেটের সন্তান, আবার তার মাথাডা চিবিয়ে খেতেও ছাড়ছিস নে।

তাই ত বলবা। মাথা কেডা চিবুচ্ছে নিজের বুকে হাত দিয়ে ছ্যাখ। অত অনাচার করলে কখন ছেলে বাঁচে? আবার আমায় বলা হচ্ছে বেরাল।

অনাচার কথাটার সরল অর্থটাই ধরে নিল পঞ্চু। স্ত্রীর ছেলে-পিলে হবার সম্ভাবনা থাকলে শবদেহ স্পর্শ করা অবিধেয়। পাড়া-গাঁয়ের লোকের এ নিষেধাজ্ঞাটা ভাল রকমই জানা থাকে। তবুও কতকটা নিজের মন বোঝাতেই বলল পঞ্চু, অজানতি কোন দোষ হয় না-রে। ওতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু বউয়ের আক্রোশটা তার গর্ভস্থ সন্তান ছাড়াও আরও অনেক কিছু জুড়ে ছিল। তাই পঞ্চুর আশ্বাসে তার ভয় গেলেও গায়ের জ্বালা গেল না।

বউকে চুপ করে থাকতে দেখে পঞ্চুও আর কথা বাড়াল না।

দূরে, অনেকখানি দূরে, ডেঙ্গামাঠের ওপারে, মুসলমান পাড়ার দরগা থেকে তখন আজান গাইতে আরম্ভ করেছে ফুলচাঁদ নিকিরি। ভোরের বাতাসে সে স্বর যেন কান্নার মত ভেঙ্গে পড়তে লাগল পঞ্চুর কানে—সে কান্না যেন তার নিজের জীবনের ব্যর্থতার প্রতিধ্বনি। তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে তার নিজস্ব কত আশা আকাঙ্ক্ষার টুকরো, সাবির চোখের জল, বউয়ের বুকের আগুন, আরও কত কি,—সব সে হিসাব করে বলতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

পঞ্চু ঘুম ভেঙ্গে উঠল বেলায়। পূর্ব্বদিকের জনালাটা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ঘর দোর নিকিয়ে তকতকে করে ফেলেছে বউ। চোখ চাইতেই নজর পড়ল দেওয়ালের গায় একখানা পটের ওপর। মাঘীপূর্ণিমার মেলায় কিনেছিল ছবিখানা। সমুদ্র মন্থনের ছবি। সৃষ্টিধর বাসুকী আর মন্দার পর্ব্বতকে দিয়ে মহাবারিধি মন্থন করছেন দেবাসুরের দল। পারিজাত, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে শূন্যে। জল থেকে সদ্য উঠে আসছে উর্ব্বশী, ঘনচিকুরসমাচ্ছন্না, অর্দ্ধনগ্না। সকালবেলা ইচ্ছা করেই এ ছবিখানা দেখে না পঞ্চু।

দুগ্‌গা, দুগ্‌গা। দু হাতের তেলোয় মুখ ঢেকে চোখদুটো ভাল করে মুছে নিল পঞ্চু। ঘরের বাইরে আসতেই যে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল তাতে তার বুকের ভেতরটা যেন শিউরে উঠল। দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে হেলা। হাসি হাসি মুখ, চোখদুটো নিঃশব্দে লেহন করছে পঞ্চুর বউয়ের দেহটা। শুধু তাই নয় হেলাকে অকাতরে সামনে রেখে একগলা ঘোমটা দিয়ে উঠান পরিষ্কার করছে বউ। দোষ দেখালেও এতে কোন দোষ খুঁজে পেত না পঞ্চু। কিন্তু তাকে দেখতে পেয়েই বউয়ের হঠাৎ সরে যাওয়াটা তার চোখে যেন বিষের কাঁটা বিঁধিয়ে দিল।

তোর কি ঘুম রে পঞ্চা? এক ঘণ্টার ওপর বসে আছি।

কেডা তোরে মাথার দিব্যি দিয়ে বসে থাকতে বলেছে। চলে গেলেই পারতিস।

হেঁ হেঁ। কেডা মাথার দিব্যি দিয়েছে জানিস নে? সঙ্গে সঙ্গেই কথার স্থুরটা ঘুরিয়ে নিল হেলা। তবে ছেলে বটে তুই পঞ্চা, যা হ'ক মায়ের দুধ খেয়েলি ভাই। তোর ইয়েতে তেল দেয় না, এমন বাবুভাই খুব কমই আছে—হে হে হে।

থাম, তোর কি চাই বল ত? তামাক খাবি এক ছিলিম? ত ঐ চকমকি রয়েছে, সাজ।

তামাক ত খাবই আর কি খাওয়াবি বল।

কেন? আমার বাবার ছেরাদ্দ না কি?

হেলা হাসল। কোঁচার খুঁট থেকে নোট বের করে ভাঁজ খুলতে লাগল হেলা। বলল, দেখবি? এই ত্যাখ্। এই রাম, দুই, তিন, চার। দশ গণ্ডা ট্যাকা! বউরে ডাক, তুলে থুক। আজ সকালে উঠে মোর মুখই দেখিলি, কেমন, নয় কি না বল?

তুই ঠিকই বলিছিস হেলা। সেই জন্যই ত ভাবছি, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। নোট কখানা নেবার কোন আগ্রহ দেখাল না পঞ্চু। হেলা কি বলতে যাবে, এমন সময় অভয় মোড়লের গলা শোনা গেল। বলি ও চন্দর খুড়ো! পঞ্চু বাড়ী আছে?

ঐ রে! শালা মোড়ল এয়েছে। ট্যাকাটা ধর পঞ্চা। পঞ্চুর হাতে একটা চাপ দিল হেলা।

মন্থনরত দেবাস্থরের ওপর নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে রইল পঞ্চু। অভয় মোড়ল ভেতরে এসে দাঁড়াল।

হেলু, দাদন দিচ্ছিস না কি রে? তা বেশ। খুড়ো কোথায় রে পঞ্চা?

জানি নে। অভয় মোড়ালের মুখের দিকে না চেয়েই উত্তর দিল পঞ্চু।

তা ত জানবি নে। মানুষ জন বাড়ী এলে বসতে একটা জায়গা দিতে হয়, সেটাও বোধ হয় জানিস নে ?

বসতে দিলেই কি আর তুমি বসবা মোড়ল। ইদিকে জমিদারের চর, ওদিকে বড় জোতদার তুমি। তবুও ঘরে গিয়ে একখানা খেজুর পাতার চেটাই এনে দাওয়ায় পেতে দিল পঞ্চু।

আর তুই ত এখন জমিদারের বরকন্দাজ রে। ছেলেবেলার এয়ার। নতুন করে পীরিত ঝালাচ্ছিস। তা বেশ, বেশ। আর লজ্জা কেন ? টাকাগুলো তুলে থো। বউয়ের গলার হার গড়িয়ে দিস।

সত্যই অভয় মোড়ল বসল না। চলে যেতে দেখে পঞ্চু বলল, ও কি ? চললে কেন মোড়ল ? বস। কার দোকানে হার গড়াতে দোব একটা পরামর্শ দিয়ে যাও।

পরামর্শ তোর নতুন মনিবই দেবে। তার জন্যে ভাবনা কি ? তবে কিনা মোড়লদের ভাত তোদের পেটে এখনও গজ গজ করছে। সেই জন্যেই বলি, বড়র সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে শেষ পর্য্যন্ত কি সামলাতে পারবি ? প্যাঁজ পয়জার দুই না হয়।

অভয় মোড়ল চলে যায় দেখে হেলা কলকে ফেলে উঠে দাঁড়াল। মোড়ল তুমি চলে যেয়ো না গো। পঞ্চার কথায় রাগ কর না বাপু। তোমরা হচ্ছ গিয়ে গাঁয়ের মাথা। চেরডা কাল তোমাদের মান্যি করে আসছি।

অভয় মোড়ল হেলার দিকে চেয়ে একটু হাসল। তবু ভাল হেলা। তোর মুখ দিয়ে দুটো ভাল কথা শুনলাম। হেলা উঠে দাঁড়াল। পঞ্চা ! আমি চললাম। মোড়লরে বসা। এক গাঁয়ে বাস করে সম্মায়ের সঙ্গে ভাব রাখতে হয়।

পঞ্চু বলল, তুই বস হেলা। এস গো মোড়ল। রাগ করে চলে যেয়ো না। তবে কথাডা যখন তুলেছ, পোষ্কার করেই যাও। মজুমদারের ট্যাকা আছে, আর তোমার আছে ধান। ট্যাকাটা এনেল হেলা আমারে দেবে বলে, ঠিক যেমন করে তোমার ভাতগুলো আমাদের পেটে গেছে। ট্যাকা আমি ফেরৎ দিচ্ছি, তোমার ভয় নেই। কিন্তু ভাতগুনো ত পেট চিরে বের করে দিতে পারব না বাপু।

সে কথাত আমি বলিনি পঞ্চু, তবে···। অভয় মোড়ল ফিরে এল। তুমি বলনি, তবে আমি বলছি। বড়নোক আছ তোমরা থাক, তবে আমাদের মিছে জড়াও কেন? আমরা গরীব, একপাশে পড়ে আছি; খাটব, খাব। কাজ দেবে, জুতো মেরে কাজ আদায় করবে। তা নয়, এমন কাজ তোমরা দেচ্ছ, যার জন্যে রাতদুকুরে আমার ছাচ্‌তলায় ঘুর ঘুর করছ তুমি। আর চোরের মত পরের হাত দিয়ে ঘুষ পাঠাচ্ছে আর একজনা। ও সবে আর নেই আমি। লাঠিকে এই সেলাম বাবা। আজ থেকে এই নাকে কানে খৎ। কোন শালা আর ও কাজ করে।

একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে একফাঁকে চলে গেল হেলা। অভয় মোড়ল পঞ্চুর কাছে সরে এল।

রাগ করিস নে পঞ্চা। তোরে ভালবাসি বলেই···। এই পর্য্যন্ত বলেই অভয়মোড়ল থেমে গেল। হঠাৎ বাইরের দিক থেকে পঞ্চুর মায়ের গলার করুণ চিৎকার শুনে দাওয়া থেকে লাফিয়ে প়ড়ে বাইরে চলে গেল পঞ্চু।

বাড়ীর পিছনে খানিকটা পোড়ো জায়গা। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আর শীতের সকালে জমাট আসর বসে এখানে। ঝরঝরে পরিষ্কার জায়গাটা।

ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের মণিবন্ধটা চেপে ধরে বসে আছে পঞ্চুর মা। তখনও দরদর করে রক্ত পড়ছে হাতখানা থেকে।

কি হয়েছে মা? কি করে নাগল?

পঞ্চুর মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল পঞ্চুর মা।

আর সহ্য হয় না পঞ্চু। আমারে তুই বেলেডাঙ্গায় পেঠিয়ে দে। বেলেডাঙ্গায় পঞ্চুর মামার বাড়ী। দূরসম্পর্কের এক মামা আছে সেখানে। জন্মে অবধি বার তুই সে তাকে দেখেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করবে, অভয় মোড়ল পঞ্চুর পেছনে এসে দাঁড়াল।

তুমি এখন যাও না মোড়ল। বিরক্তভাবে বলল পঞ্চু।

পঞ্চুর মা বলল, মোড়লরে ঐঠানটায় বসতে দে পঞ্চা। আর কেন বল বাপু, জল আনতে পড়ে মলাম হোঁচট নেগে; কলসীডাও গ্যাল, চুড়ি কগাছা ভেঙ্গে হাতটাও ওয়ার হয়ে গ্যাল।

আহা, তাই ত খুড়ী, বড্ড রক্ত পড়ছে। পঞ্চু, চট্ করে আয় আমার সঙ্গে। আমার ঘরে আইডিন আছে, নিয়ে এসে বেশ করে বেঁধে দে। আমার হরেনের ও সব বড্ড বাই। সব কম্প্লিট্ একেবারে।

আমি যাচ্ছি মোড়ল, তুমি এগোও। অভয় মোড়ল চলে গেল।

ওষুধটা নিয়ে আসি মা, তুই পিঁড়েয় গিয়ে বস্। মায়ের হাত-খানা নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল পঞ্চু। দু খানা হাতই একেবারে খালি, বিধবার মত শূন্য।

চুড়িগুনো ভাঙ্গলি কেন মা?

ও আর রেখে দরকার নেই বাবা। আজ থেকে ও মুখপোড়ার মুখ আমি দ্যাখব না। আর ওই পোড়ারমুখে ছাই-পিণ্ডি রেঁধেও দোব না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে পিঠের কাপড়টা সরে যেতেই

কতকগুনো দাগ দেখতে পেল পঙ্কু। কোনটায় রক্ত ফুটে আছে, কোনটায় রক্ত জমে কালসিটে হয়ে উঠেছে।

তোমরা কি আরম্ভ করলে বলত? রাস্তা ঘাটে কেলেঙ্কারী করতে নজ্জা নাগে না তোমাদের? ছিঃ ছিঃ।

পঙ্কুর মা মুখ তুলে চাইল। কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর, যেন রক্ত পুরু হয়ে জমে রয়েছে। জীবনে কোনদিন মায়ের লাঞ্ছনা চোখে দেখেনি পঙ্কু।

বলতেও নজ্জা নাগে। পেটের সন্তান তুই। বুড়ো বয়সে বাহাত্তুরে ধরেছে মুখপোড়ার। কাজে যাবার নাম করে পেছন পেছন ঘাটে গিয়ে হাজির। বলে এশো তোর পাশ দিয়ে গেল,—কি সব বলল তোরে, বলতে হবে। কালকের ছেলে এশো, হতে ছ্যাখলাম তারে। আ মোর পোড়াকপাল, যম একেবারে ভুলে আছে আমারে।

দুদিক থেকে দুটো সমস্যা এসে আক্রমণ করল পঙ্কুকে। বাপকে সে আর কিছুতেই কাজ করতে দেবে না। নিজে খাটবে, বাপ-মাকে খাওয়াবে। কাঠের পুতুলের মত ওঠাবে বসাবে চন্দরকে, দেখবে, কোন সাহসে মায়ের গায়ে সে হাত তোলে।

কিন্তু এই মহৎ সংকল্পের ভেতর থেকে সাপের জিভের মত লকলক করে উঠল আর একটা অপ্রীতিকর সম্ভাবনা। মনোমত না হলেও ঠেলে ফেলতে পারে না সে ভয়। স্বাধীনভাবে থাকতে চায় তার বউ। সংসারের কোন আঁচই সে গায়ে নিতে চায় না। স্ত্রীর এই আপত্তি ঠিক সমর্থন না করলেও, এর কাছে আত্মসমর্থন করা ছাড়া আর বিশেষ কোন সমাধান সে খুঁজে পায় নি এতদিন।

তুই বাড়ী চ মা। আসুক বাছাধন। আজ দেখিয়ে দোব মজা।

ও মরবে, ওর মরণপাখা উঠেছে। তুই দেখিস, ও ঠিক মরবে। মনের ঝাল মিটিয়ে গাল পাড়তে লাগল পঞ্চুর মা।

বাপ-মায়ের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার ভাঙ্গা টুকরোগুনো কুড়িয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগাবার একটা হিংস্র আত্মপ্রসাদ তার মনের মধ্যে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। বউকে গিয়ে সে এখুনি শুনিয়ে দেবে কত নিষ্ঠুর, কত দায়িত্বজ্ঞানশূন্য তার বাপ। আর স্বামী হিসাবে কত শ্রেষ্ঠ সে বাপের চেয়ে। মায়ের কাছে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে বাড়ীর ভেতর চলে গেল পঞ্চু।

ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একটা পান-চালায় রাত্রে গোয়াল আর দিনে পঞ্চুর রান্নাঘর। উনুনে কতকগুনো শুকনো পাটকাঠি দিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছিল বউ। উনুনের কাছে একটা চুপড়িতে সদ্য তুলে আনা কলমি শাক। কাপড় কাচতে গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের উপকরণ যোগাড় করে এনেছে বউ। মাটির ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসল পঞ্চু।

কি হল? মোড়লের সঙ্গে কমনে গিয়েলে সকাল বেলা?

মোড়লের সঙ্গে আর গ্যালাম কোথায়? বাবার জ্বালায় আমায় দেশ ছাড়তে হবে দেখছি।

পঞ্চুর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইল বউ।

আমার মুখের পানে তাকালে কি হবে? বেলতলায় গিয়ে দেখে আয়, মাকে মেরে রক্তারক্তি করে দিয়েছে বাবা। ও বুড়োর আজ আমি নিকুচি করে ছাড়ছি। বাড়ী আসুক একবার।

তা করবা বৈ কি? বুড়ো বাপ, তারে ধরে না মারলে আর মারবা কারে? বুদ্দি বলতে কি তোমার ঘটে কিছু ছায় নি ভগমান। বেশ রাশভারি ভঙ্গিতে বলল পঞ্চুর বউ।

আর মারে যে মেরে আধমরা করে দিল, সেটা বুঝি কিছু নয় ? মারে তুই দেখতে পারিস নে কি না, তাই অত দরদ ফলাচ্ছিস।

দেখতে পারি নে, কেডা বলল তোমারে ?

বলবে আবার কেডা ? আমি বুঝতে পারি নে ?

তা বোঝবানা ? বুদ্দির মাথা খেয়ে বসে আছ যে একেবারে।

বারবার নির্ব্বুদ্ধিতার উল্লেখে সদ্য গড়ে ওঠা পত্নীপ্রীতির মোলায়েম মনোভাবটা আপনা হতেই কোথায় মিলিয়ে গেল পঞ্চুর।

তুই একটু সাবধান হয়ে কথা বলবি বউ, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল পঞ্চু। বউয়ের ঠোঁট দু'খানার ওপর অসরল হাসির রেখা পড়ল।

ও, মারবা বুঝি ! আবার তুমি বাবারে দোষ দিচ্ছিলে। তবু কোন অমন্দ কথা বলিনি আমি।

না। বড্ড ভাল কথা বলেছিস্।

ভাল মন্দ তুমিই বুঝে ছাখ। ঘর বয়ে একমুঠো ট্যাকা তুলে দিতে এয়েল চৈকিদার ; ফিইরে দিলে ঐ মুখপোড়া মোড়লের কথা শুনে। কি ঢনঢনিয়ে দেবে তোমায় মোড়ল ? একপালি চাল, নয়ত সের দুই আঙ্গালু।

তোর ট্যাকাতেও আমার দরকার নেই, আর চাল রাঙ্গালুও দরকার নেই ! লাঠি আমি ধরব না, ব্যস্।

লাঠি ধরবা না, জন খাটবা না, তবে করবা কি শুনি ? দারোগা বাবু হয়ে কলম ধরবা ? বলেই হাত দিয়ে কলম ধরার ভঙ্গি করে দেখিয়ে দিল বউ। পঞ্চু হেসে ফেলল।

বউয়ের মনটা হয়ত ভালই ছিল, তাই পঞ্চুর হাসি দেখে তার সাহস একটু বেড়ে গেল।

তা হলে একটা জিনিস দেখাব, তুমি রাগ করতে পাবা না বল ?

কি জিনিস বল আগে। রূপোর বেলকুঁড়ি না হিংলাজের মালা ?

উঁ। তাই বই কি। মোরে একজোড়া তুল গইড়ে দিতে হবে। ঠিক যেমন এশোর মেয়ে মালতীর কানে আছে, পালম পাতার মতন গড়ন।

সে আমায় বেচলেও হবে না।

একটুখানি ইতস্ততঃ করে বলল পঞ্চুর বউ, আর যদি আমি দিতে পারি বল, তা হলে তুমি আমার কেনা হয়ে থাকবা ?

তুই দিবি ? বলিস্ কি রে ? হঠাৎ ধনদৌলত পেলি কমনে ?

পঞ্চুকে ভাববার অবসর দিয়ে শোবার ঘরে চলে গেল পঞ্চুর বউ। একটু পরেই ফিরে এল। বাড়ীর পেছনে পানচালাটা, আশপাশে ঝোপ, জঙ্গল।

বল রাগ করবা না ? একখানা হাত দিয়ে পঞ্চুর গলাটা জড়িয়ে ধরল বউ।

দিনদুপুরে এতটা আকস্মিক আক্রমণ ঠিক সহ্য করতে পারল না পঞ্চু। না, না পাগ্‌লি ! রাগ করব না, কি দেখাবি, দেখা। চারখানা দশ টাকার নোট পঞ্চুর চোখের সামনে তুলে ধরল বউ। দেখেই পঞ্চুর চোখ, মুখ সমস্ত শরীর ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠল।

কমনে পেলি ও ট্যাকা ?

ঐ ত রাগ করছ।

কমনে পেইছিস বল আগে। চিৎকার করে ধমক দিল পঞ্চু।

কাপড় কাচতে গিয়েলাম কাঁদায়, হেলার বউ হাতে গুঁজে দিল।

হেলার বউ দিল, না হেলা দিল ?

রীতিমত ভয় পেলেও, ক্ষীণ একটু হাসির রেখা চাপতে পারল

না পঞ্চুর বউ। ছুরির মত ঐ হাসির তীক্ষ্ণ ঝিলিকটা সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুর মনে কেটে বসে গেল।

বিশ্বেস না হয়, চল ভজিয়ে দিচ্ছি।

তুই কেন নিতে গেলি, শালী, শূয়োরের বাচ্ছা।

খবরদার বলছি, গাল দিয়ো না। না ন্যাও, ফিরিয়ে দোবানি। মা গো! মেরে ফেলেছে গো। প্রচণ্ড ধাক্কায় পান-চালার একেবারে নীচেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ল পঞ্চুর বউ।

কি হয়েছে গো? কোথা থেকে বাঘের মত লাফিয়ে এসে পড়ল চন্দর।

বউডোরে মারলি? বেরো বাড়ী থেকে হারামজাদা শূয়োর কমনেকারের।

বেত্রাহত কুকুরের মত বাপের সুমুখ থেকে সরে গেল পঞ্চু।

২

পঞ্চুর হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্তমনে পড়ে ছিল সাবি। তবুও মাঝে মাঝে তার বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠছিল, পঞ্চু কখন কাজ শেষ করে ভিজে কাপড়ে যমদূতের মত এসে দাঁড়াবে। তার চেয়ে যদি না ফিরে সোজা বাড়ী চলে যায় পঞ্চু, খুব ভাল হয়। কাঁদতে কাঁদতে আচ্ছন্ন অবস্থায় অনেকক্ষণ কেটে গেল। দয়াবুড়ী আঁচল পেতে মাটির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্ত ঘরখানা একেবারে খালি। খুকি আর উঠবে না, গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে কাঁদবে না, কি খাওয়াবে, কি ওষুধ দেবে, কিছুই আর ভাবতে হবে না। শেষ কিছুদিন ধরে এই জিনিসটাই যেন মনে মনে কামনা করছিল সাবি। ছোট্ট মেয়েটার দেহ আর প্রাণটাকে নিয়ে যেন তুলো পিঁজছিল যম।

একফোঁটা কচি প্রাণ আর কত সহ্য করবে ? তাই মা কালীর পটের নীচেয় সাবির মুখের দিকে চেয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চোখ দুটো যখন তার বড় বড় হয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল, গলার ঘড়ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল, সাবির মাথা থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল।

ও দিদিমা, দিদিমা। একবার ওঠ ত। খুকির মতন কেডা কানছে না ? দয়াবুড়ী সরে এসে সাবির পিঠের ওপর হাত রাখল।

ও রকম হয় দিদি। মহাপেরাণী বেইরে গেলেও আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমার শত্তুরডা যখন গ্যাল, আমিও ও রকম কতদিন শুনিছি। ও ত তোর জিনিস নয় সাবি, তোর হলে ঠিক থাকত। ও যে তোর শত্তুর। কি করবি বল !

সাবির বুকের ভেতরটা যেন নিঙ্ড়ে উঠল। শত্রু ! ক্ষীণ, নিরীহ, অসহায় একফোঁটা মেয়ে, খাইয়ে দিলে খাবে, শুইয়ে দিলে শোবে, কান্না ছাড়া যার আর কোন সম্বল নেই, শত্রু হবে সে কি করে ? দু কানে হাত চাপা দিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল সাবি।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল সাবির। সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত মনে পড়ে গেল। খুকি নেই, আর কোনদিন আসবে না, কাঁদবে না, ঘ্যান ঘ্যান করবে না। রাতের অন্ধকারে, নিঃসঙ্গতায় শোকের যে মুখোমুখি রূপটা তার চোখে পড়েছিল, মেয়ের যন্ত্রণামুক্তির প্রচ্ছন্ন নিশ্চিন্ততায় কোনরকমে সে আঘাতটা সে সহ্য করে নিয়েছিল। কিন্তু দিনের আলোর প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় সেই জিনিসটাই যে জগৎজোড়া হতাশার শূন্যতা নিয়ে তার দেহমনের ওপর নতুন করে চেপে বসতে পারে, এ অভিজ্ঞতা তার কোন কালেই ছিল না।

দয়াবুড়ী তখনও চলে যায় নি।

ওঠ্ দিদি। একবার গঙ্গায় গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসবি চল।

তা না হয় আসব দিদিমা, তারপর কি করব বল ত ?

সবই করতে হবে দিদি। বাঁচতে গেলে পোড়া পেটে আবার দিতেও হবে, পরতেও হবে, মাখতেও হবে। সব সহ্যি হয়ে যাবে ভাই, সব সহ্যি হয়ে যাবে।

সাবি উঠে বসে বিস্রস্ত চুলের বোঝা সম্বরণ করল।

আচ্ছা দিদিমা, পয়সা থাকলে বাছা বোধ হয় বাঁচত ? দয়াবুড়ীর মুখখানা করুণ হাসিতে ভরে উঠল।

না দিদি। ও কথা ভুল। যে বাঁচতে আসে, সে ঠিক বাঁচে। যে থাকবে না, কার সাধ্যি তারে ধরে রাখে। তা হলে কি আর বড়নোকেরা মরত ?

সাবিও একথা জানে, অনেক ভেবেছে, অনেক শুনেছে।

তা হলেও দিদিমা, এক ফোঁটা দুধ বাছার পেটে গেল না, এক ফোঁটা ওষুধ নয়, অমনি কি করে বাঁচবে ? রোগই ত মায়ের আমার না খেতে পেয়ে। সে কথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি নে দিদিমা।

রোগ ত কিছুই নয় দিদি, মরণডাই হচ্ছে আসল। গুইরামের জলজ্যান্ত ছেলেডা, জাম পাড়তে গাছে ওঠল, ডাল ভেঙ্গে পল, হয়ে গ্যাল। ও সব ভেবে আর কি করবি বল, এতডা বয়স হল, অনেক দ্যাখলাম।

স্নান সেরে ঘরে আসতেই সবির যেন বড্ড শীত করে উঠল। দিদিমা ক্যাঁথাখানা এনে দ্যাও ত, আমার যেন জ্বর আসছে। দাওয়ার ওপর আঁচল পেতে জড়সড় হয়ে শুয়ে পড়ল সাবি।

গঙ্গাজল ছিটিয়ে অত্যন্ত মলিন একখানা কাঁথা এনে সাবির গায়ে চাপা দিয়ে দিল দয়াবুড়ী।

জ্বর নয় সাবি। খিদেয় শরীল ও রকম করছে। তুই শো। আমি হুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে এনে দিচ্ছি।

আচ্ছা দিদিমা, আর জম্মে তুমি মোর কেডা ছিলে বল ত? দয়াবুড়ীর একখানা হাত চেপে ধরল সাবি।

তুই চুপ মেরে শো দিনি। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। মেলা বকিস্ নে। আমি যাব আর আসব।

দয়াবুড়ী চলে যেতে আপনমনে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল সাবি। কাঁপুনির বেগটা একটু একটু করে কমে আসতে লাগল। ভরা হুপুরের তীব্র জ্বালা তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ভাঙ্গা চালার ভেতর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে সাবির গায়ে। মুখের ওপর থেকে কাঁথাখানা সরিয়ে ফেলতেই তার চোখে পড়ল তার পায়ের কাছে হুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পঞ্চু বসে আছে।

পঞ্চুদা কখন এলে? পঞ্চু মুখ তুলে চাইল।

কেঁদে কেঁদে চোখ হুটো ফুলে উঠেছে সাবির। মুখখানা সিঁহুরের মত লাল।

এই এ্যালাম। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তোর?

পঞ্চুর মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সাবি।

কেউ এল না? আবার জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু।

এসে কি করবে, না আসাই ভাল। কথা বলার ভঙ্গিটা বেশ ভাল লাগল না পঞ্চুর।

কেউ যার নেই, তার ত শুয়ে থাকলে চলবে না সাবি। সাবি উঠে বসল।

আমার খাবার ভাবনা নিয়ে তুমি এই কথা বলছ পঞ্চুদা। সে ভাবনা তোমাদের ভাবতে হবে না।

ভাবতে না হয় খুব ভাল কথা। পঞ্চুর মুখখানা অন্ধকার হয়ে উঠল।

কাঁথাখানা গা থেকে খুলে খানিকটা দূরে সরিয়ে দিল সাবি। উঠে বসে কাপড় চোপড় সামলে চোখদুটো মুছে ফেলল। তারপর বলল, তুমি হয়ত রাগ করছ পঞ্চুদা, আমি কিন্তু সেভাবে কিছু বলিনি। আজ আমি কি খাব খবর নিতে এয়েছ, আর এই খাওয়া আবানে মেয়েডা আমার শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল। নিজের পেটের যোগাড় আমি করে নিতে পারব। এখন মারে খেয়ে খিদেও নেই, তেষ্টাও নেই।

বেশ। চলে যদি ভালই। তবে দরকার পড়লে আমায় খবর দিস্। মেয়ে থাকতে ঐ জেদ নিয়েই ছিলি। নইলে অপরের কথা বলতে পারিনে, তবে আমায় দোষ দেওয়া বৃথা। ঝোঁকের মাথায় কথাগুনো বললেও পঞ্চুর মুখখানা অপরিসীম ব্যাথায় অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাল।

সাবি উত্তর দেবার আগেই কলাপাতা চাপা দিয়ে একপাথর ভাত নিয়ে এল দয়াবুড়ী।

ঐঠানটায় একটু জল ছিটিয়ে দে ত পঞ্চা। ঘরের মধ্যে ঘটিতে জল আছে। পঞ্চু জল ছিটিয়ে দিতেই ভাতের থালাটা সাবির সামনে নামিয়ে দিল দয়াবুড়ী। আয়োজন সংক্ষিপ্ত হলেও যত্নের অভাব ছিল না কোনখানে। সাবির চোখে এমনিই জল ছিল, কিন্তু পঞ্চুর চোখদুটোও জলে ভরে উঠল। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা পাগলী বলত দয়াবুড়ীকে। ধান ভেনে, গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে করে দিন চালাত বুড়ী।

পঞ্চু বলল, এই জন্যেই বুঝি বলছিলি খাওয়ার ভাবনা তোর

নেই। তারপর দয়ার মুখের দিকে চেয়ে বলল, যে রকম যোগাড় তুমি করে এনেছ দিদিমা, আমারই জিভ দিয়ে জল পড়ছে।

কি আর এনিছি ভাই, মোর আর কি আছে! তিনদিন দাঁতে কুটো কাটে নি মেয়েডা। তার ওপর এই হাতীর মতন শোক। যা প্যালাম, ভাতে ভাত ফুটিয়ে এনে দেলাম। নে, হাতটা ধুয়ে ফ্যাল দিনি। যা পারিস হুটো মুখে দে।

চলে যাবার সময় বলল পঞ্চু, ঢের এনেছ দিদিমা। তোমার যা আছে অনেক রাজারাজড়ার তা নেই। খেয়ে নে সাবি, আর দেরী করিস্‌নে।

দু-চার গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই উঠে পড়ল সাবি।

ও কি রে? কিছুই ত খেলি নে।

গলা দিয়ে আর নাবল না দিদিমা। জল দিয়ে থোও, পারি ত ওবেলা খাব।

অত বাড়াবাড়ি ভাল নয় সাবি। যা হক করে বাঁচতে ত হবে।

বাঁচব বৈ কি দিদিমা। আমার কি আর মরণ আছে?

আছে বৈ কি দিদি। শোক সম্মাই সইতে পারে না। তার ওপর যদি পেটে কিছু না দিস, তা হলে ত কথাই নেই।

সাবি চুপ করে রইল। একটু পরে দয়াবুড়ীকে ডেকে বলল, হাঁ দিদিমা, পঞ্চুদা কি ঘাট থেকেই এখানে এয়েল? মনের ভুলে জিগ্যেস্‌ করতে মনে নেই।

দূর্‌ পাগলী! সে আর কতক্ষণ নাগবে?

উঃ, মা গো। এইবার গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল সাবি।

দিনটা কোনরকমে কাটল। দয়া দুঃখী মানুষ। পরোপকারের সখ নিয়ে বেশীক্ষণ থাকলে ডানহাতের ব্যবস্থা অচল হয়ে আসে। তার

ওপর আধমণ ধান ভিজিয়ে সিদ্ধ শুকন করতে হবে একদিনের ভেতর। কাঠকুটোর যোগাড় আছে। রাতের দিকে একবার এসে সাবিকে দেখে যাবে জানিয়ে সে চলে গেল। সন্ধ্যার পর শেয়াল ডেকে উঠল। সাবি উঠে আলো জ্বালল। শোনা ছিল, মানুষ যেখানে মরে সেখানে একটা বাতি দিতে হয়। মাটির প্রদীপটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখতেই সমস্ত শরীরটা তার ছমছম করে উঠল। ঘরের বাইরে অন্ধকার জমছে। হাওয়া লেগে প্রদীপের শিখা কাঁপছে আর চারদিকের অন্ধকার যেন পা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

হায় রে কপাল! পোড়া পেরাণের মায়া কি এতই বেশী? আপন মনে বলল সাবি। দয়া দিদিমা কি আজ আর আসবে না? তা ছাড়া রোজ রোজ কেই বা তাকে রাতে পাহারা দেবে?

কেডা? দাওয়ার ওপর কার পায়ের শব্দ হল।

আমি।

পঞ্চুদা? সাবি যেন বেঁচে গেল। মনে মনে এই রকমই একটা কিছু চাইছিল সে। যে কোন একটা জীবন্ত মানুষ। পঞ্চু ঘরে এল।

তোর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে সাবি?

খাওয়ার কথা ছাড়া কি আর তুমি কোন কথা জান না পঞ্চুদা? বলেই পঞ্চুর মুখের দিকে চেয়ে দেখল সাবি, মুখখানা তার একেবারে শুকিয়ে গেছে।

জানি, কিন্তু মিষ্টিকথা বলতে কি তুই একেবারে ভুলে গেছিস সাবি?

এত দুঃখেও সাবি একটু না হেসে পারল না।

তোমার কি হয়েছে বল দিকি পঞ্চুদা? মুখখানা বড্ড শুকিয়ে গিয়েছে। ঝগড়া করেছ না কি?

মুখ শুকিয়ে যাওয়ার কথায় দপ্ করে জ্বলে উঠল পঞ্চু। মুখ শুকুবে কি রে? অমন সাতদিন না খেলেও পঞ্চু মল্লিকের গায় নাগে না।

আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নি? সত্যি কথা বল।

সাবির জিজ্ঞাসায় পঞ্চুর চোখদুটো ছলছল করে উঠল। বউকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবার পর থেকেই তার মনের মধ্যে রাজ্যের গ্লানি এসে চেপে বসছিল। সঙ্গে সঙ্গে চন্দর এসে তাকে শেয়াল কুকুরের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। অথচ জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত সে বাপের কাছে গালাগালি ত দূরের কথা বিশেষ চড়া কথা কখনও শোনে নি। একটু আগেই তার মাকে ধরে আধমরা করেছে তার বাপ। স্ত্রীর গায় হাত তোলা যদি অপরাধ হয়, তবে চন্দর তাকে বকবার সাহস পেল কোথা থেকে? আর সে-ই বা উলটে সে কথা বলতে পারল না কেন তার বাপকে? বলা ত দূরের কথা, যতবার সে বাড়ী ফেরবার সঙ্কল্প করেছে মনে মনে, ততবারই দুষ্কৃতিকারীর লজ্জা এসে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

খাবার জন্যে নয় সাবি, সে ত যেখানে সেখানেই জুটতে পারে, তবে···পঞ্চু আর বলতে পারল না। চোখদুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠতেই গলার স্বরটা যেন বুজে এল।

সাবি বলল, থাক, বুঝিছি। চারটি চাল ডাল যোগাড় করে আনতে পার পঞ্চুদা? আমি তোমাকে দুটো ফুটিয়ে দিচ্ছি। পঞ্চুও ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিল, আজ কিছুতেই সে বাড়ী গিয়ে খেতে পারবে না।

এখখুনি আনছি। তুই একটু দাঁড়া।

গরম গরম ভাত বেড়ে পঞ্চুর সামনে ধরে দিতেই পঞ্চুর চেয়ে

তৃপ্তিটা যেন বেশী হল সাবির। অথচ এতটা সময় সে পঞ্চুর সঙ্গে একটা কথাও বলে নি।

তোর জন্যে ভাত থুলিনে সাবি? ঘটির জলে হাত ধুয়ে সাবির মুখের দিকে চাইল পঞ্চু।

আমার ভাত আছে, তুমি খেয়ে ন্যাও।

না, আগে চারডি তুলে নে। তা নইলে আমি খাব না। খপ্ করে সাবির ডান হাতখানা চেপে ধরল পঞ্চু। সাবি কিছু বলবার আগেই ঘনীভূত অন্ধকারের ভেতর থেকে নিঃশব্দে দোর ডিঙিয়ে ভেতরে এল দয়াবুড়ী।

পঞ্চা তুই এইঠানে, ইদিকে তোর বাড়ী যমে মান্ষে টানাটানি!

চমকে উঠে দয়ার মুখের দিকে চাইল পঞ্চু। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন? কি হয়েছে দিদিমা?

পঞ্চুর জিজ্ঞাসায় জ্বলে উঠল দয়াবুড়ী।

কি হয়েছে জানিস্ নে? সাবির মুখের গোড়ায় ঘুর ঘুরিয়ে বেড়ালে কি করে জানবি বল? সকালবেলা বউডোর কোঁকে নাত্তি মেরে মরদানি ফলিইছিস। ইদিকে পেটের বাচ্ছাডা যে যায়। কাটা ছাগলের মতন ছটফট করছে পরের মেয়েডা। শুনেই ভাতের থালা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল পঞ্চু।

এতদূর হয়েছে, তাত জানতাম না দিদিমা। সত্যি বলছ না ভয় দেখাচ্ছ, ঠিক করে বল।

বাড়ী গিয়ে দেখগে সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি।

কোন কথা না বলে সাবির বাড়ী থেকে চলে গেল পঞ্চু। এতক্ষণে ভাতের থালাখানার ওপর নজর পড়ল দয়াবুড়ীর।

ভাতকডা কি সব পঞ্চারে ধরে দিইলি সাবি? বেশ।

ঘোলাটে দৃষ্টিটা আলো থেকে আড়াল করে শানিয়ে নিতে চোখ দুটোর ওপর হাতচাপা দিল দয়াবুড়ী।

ই-কি? ভাত যে গরম দেখছি! তোর হল কি বল্‌ত সাবি? কিছুতে পায়নি ত? জলজ্যান্ত মেয়েডারে খেলি কাল রাত্তিরে; রাত পোয়াতেই চৌদ্দ পুরুষের নাউখোলা কেডা তার ঠিকানা নেই, পঞ্চার কোলে গরম ভাত ফুটিয়ে দিইছিস? ধন্যি সখ বটে বাবা!

দয়াবুড়ীর এত বড় অভিযোগে সাবির মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। শুধু চোখদুটো দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা টপ টপ করে ঝরে পড়তে লাগল। দয়াও বকতে বকতে চলে যাবার জন্য ঘর থেকে পায়ে পায় দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

তুমি চললে না কি দিদিমা?

নির্মমস্বরে উত্তর দিল দয়া, যাব না এঠাঁয় থাকতে এইছি না কি? সে বরাত কি করেলাম দিদি? বসে বসে খাওয়াবে কোন যম? শোকাতাপা মানুষ, একলাটি থাকিস, তাই মরতে মরতেও এয়েলাম। তা আর কি করব?

আমারে সঙ্গে নিয়ে চল দিদিমা। তোমার সব কাজ আমি করে দোব।

তাই নিয়ে য্যাতাম সাবি, নয়ত থেকে যেতাম আজ রাত্তিরডা। কিন্তু তোরে নিয়ে ত বদনামের ভাগী হতে পারব না ভাই।

সাবি সমস্ত শোকতাপ ভুলে গেল। দয়া তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

সাবি বলল, যেয়ো না দিদিমা। একটুখানি দ্যাড়াও। তুমি কি মনে ভেবেছ বল দিকি? আমি রাক্ষুসী না শেয়াল কুকুর?

দয়াবুড়ী থমকে দাঁড়াল। তারপর ফিরে এসে বলল, তোরে মন্দ

মনে করে আমি এ কথা বলিনি সাবি। পরে বুঝবি। তবে যদি মোর সঙ্গে যেতে চাস্, চ।

চল দিদিমা। তাই চল। এখানে আমি আর থাকতে পারছি নে।

চারদিকের গাছপালা আর বাঁশঝাড়ের ঘন সন্নিবেশের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো আকাশের বুকে নক্ষত্রের ঝাঁক ফুটে উঠেছে।

দয়াবুড়ী ফিরে এল।

না সাবি। তা হয় না। তুই একটুখানি বস্। আমি হাঁড়িডে নেবিয়েই আসছি। আজ রাত্তিরে এ ঘর ছেড়ে যেতে নেই।

দয়া চলে যেতেই দোরটা বন্ধ করে দিল সাবি।

৩

ছোট গ্রামের ছোট অধিবাসী পঞ্চু। তবুও তার অগভীর জীবনস্রোতে অন্য খাতের জল এসে মেশবার চেষ্টা করল।

রমাপতি রায় গ্রামের চিকিৎসক। নিজের দেশ ছেড়ে অন্নের সন্ধানে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কৌতুকপুরে এসে পেঁৗছায়। কৌতুকপুরের বাজারে একখানা ঘর ব্যবস্থা করে শিশি বোতলে জল আর ওষুধ ভরে রাজু ডাক্তারের প্রতিপক্ষদের নিয়ে দল পাকায়। সঙ্গে সঙ্গে হাতও পাকায়।

কি হে ডাক্তার? চলছে কেমন? ভূপতি মজুমদার খোঁজ নেয় মাঝে মাঝে। চোরাহাট থেকে তখন সদ্যপালিশ করা দেড়টা আলমারি এনে বসিয়েছে রমাপতি। বড়টায় ওষুধ, কুইনাইন, ম্যাগসালফ্, সোডিবাইকার্ব, স্পিরিট্ এ্যামন এ্যারোম্যাট্, সিরাপ

টলু, বেঙ্গল কেমিক্যালের লিকুইড এক্সট্র্যাক্ট অফ্ চিরোতা, গুলঞ্চ, কালমেঘ। পাইন কাঠের প্যাকিং বাক্সোর ওপর বসান ছোট আলমারিটায় নিক্তি, পিষ্টন, স্প্যাচুলা, ডিস্‌টিল্ড ওয়াটারের বোতল থাকে থাকে সাজান।

আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে চলে যাচ্ছে একরকম। হেসে উত্তর দেয় রমাপতি।

আমার আশীর্ব্বাদ নয় হে। শিশি বোতলের ওপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে। যেমন করে হক চলে যায়ই। ভক্তিমান রমাপতি, শক্তিও চিনত ঠিক ঠিক। তাই ভগবানের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে ভূপতি মজুমদারের আশীর্ব্বাদও আদায় করে নিয়েছিল।

শিক্ষা বিশেষ না থাকলেও সাহস ছিল রমাপতির। ইন্‌জেক্‌সন্ দিত মুক্তহস্তে, গ্ল্‌ুকোজ, ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার নির্ব্বিচারে।

পর পর দুরাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখে, সকালে একটু সুস্থ হল পঞ্চু।

বউ আবার উঠে বসেছে। মুখখানা অনেকটা সহজ। পেটের যন্ত্রণা আর নেই।

হুঁকো হাতে করে চন্দর দোরগোড়ায় এসে বসল।

ভদ্দরনোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল। পঞ্চার মুখে খবর পেয়েই ছুটে এলেন বাবু, রাম ডাক্তারকে সঙ্গে করে। বলে যত ট্যাকা নাগে ডাক্তার, পোয়াতী বাঁচাতেই হবে। কত তাগবাগ করল ডাক্তার, তুলো, ওষুধ, দাগা, ফোঁড়া। পঞ্চুর মুখের দিকে চেয়ে তার হাতে হুঁকোটা তুলে দিল চন্দর। চন্দরের আবেগ তখনও থামে নি।

দুঃখ্যু কর না মা। গাছ বজায় থাকলে আবার ফল হবে। যে হাল হয়েল, আমার ত আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।

সুস্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে মাথার কাপড়টা আরও টেনে দিল বউ।

স্বামীর লাঞ্ছনা, গর্ভস্থ সন্তানহানি, এত দুঃখকষ্টের বিনিময়ে সে অনেক কিছু পেয়েছে। তার জন্যে তীরেগাঁথা পাখীর মত ছটফট করে বেড়িয়েছে তার শ্বশুর। চোখের জলে বুক ভেসে গেছে শাশুড়ীর। ছোটছেলের মত কেঁদে বাড়ী মাথায় করেছে পঞ্চু, ভূপতি মজুমদারের পা জড়িয়ে ধরেছে, ডাক্তারের পায়ে মাথা কুটেছে। চোখের ওপর এতটা স্নেহ মমতার ছড়াছড়ি দেখে সে অনাগত সন্তানের আশা আপনা হতেই ভুলে গেছে। কোন রকমে বেঁচে ওঠবার জন্যে প্রাণটা তার আকুলি বিকুলি করেছে। তার জন্যে বাড়ী বয়ে এসেছে গাঁয়ের জমিদার। শিশি ভরে ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। সমস্ত দেহটা নিয়ে টানাছেড়া করেছে। ভাবতে গিয়ে শরীরটা তার লজ্জায় কুঁকড়ে উঠল। আড়চোখে পঞ্চুর মুখের দিকে চেয়ে দেখল, মাটির দিকে চেয়ে সে বসে আছে।

এই যে গো। ইদিকে একবার আয় না। পঞ্চুর মাকে ডাকল চন্দর।

কি বলছ? ঝুড়ি ভরতি ছেঁড়া কাপড়-চোপড় কেচে এনে বাঁশের আলনায়, চালের ওপর মেলে দিচ্ছিল পঞ্চুর মা।

বলছি কি, এইবার একস্তরে রান্নাবান্না হক। আর বার বাড়ী তের খামারে কাজ নেই।

নিজের বউকে কথাটা বললেও ছেলের বউয়ের মুখের দিকে চাইল চন্দর। হাসিমুখে চন্দরের মুখের দিকে চেয়ে মাথা নীচু করল পঞ্চুর বউ।

চন্দর কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ বাড়ীর বাইরে থেকে ডাক এল।

পঞ্চা বাড়ী আছিস? আগন্তুক রমাপতি ডাক্তার। শাদা ধুতির ওপর কাল আলপাকার কোট গায়, পাশ পকেট থেকে

ষ্টেথোস্কোপের নল দুটো উঁকি মারছে। হাতে ব্যাগ। পাৎলা চেহারা। ফর্শা রং। ঠোঁট দুখানা বেশ একটু চাপা।

আসুন ডাক্তারবাবু। ঘর থেকে বাইরে এল পঞ্চু।

এখন কেমন আছে রে? রমাপতি ডাক্তার ঘরের দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে এল।

আপাদমস্তক একখানা কাঁথা দিয়ে সর্ব্বশরীর ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করল পঞ্চুর বউ।

নরম পড়ে গেছে। পঞ্চু বলল।

ডাক্তার একটু থেমে গেল।

চন্দর বলল, তা হক ডাক্তারবাবু। আপনি একটু দেখুন।

সামান্য একটু হেসে বলল রমাপতি, কি আর বলব? তোদের দশাই এই। তা একখানা চটফট পেতে দে।

তাড়াতাড়ি একখানা খালি ধানের থলে দুভাঁজ করে বউয়ের বিছানার সামনে পেতে দিল পঞ্চু।

ব্যাগটা মাটিতে রেখে জুতোশুদ্ধ বসে পড়ল রমাপতি। গুন গুন করে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রোগিনীর ওপর ওপর চেহারাটা একবার দেখে নিল।

দেখি হাতটা। হাত সমেত সমস্ত দেহটা তখন কাঠ হয়ে গেছে পঞ্চুর বউয়ের।

হাত বের কর। ধমকে উঠল পঞ্চু।

রমাপতিও ধমক দিল সঙ্গে সঙ্গে, তুই বাইরে যা ত। পঞ্চুর মাকে পাঠিয়ে দাও চন্দর।

হাতটা দেখি। লজ্জা কিসের? সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষ স্বরটা যেন মধু দিয়ে ভিজিয়ে নিল ডাক্তার। ভদ্দরলোকের ঘরে হলে কাল পাঁচশ

টাকা উড়ে যেত। নরম পড়েছে কি আর অমনি? চন্দরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল রমাপতি।

সে ত বটেই ডাক্তারবাবু। আপনার হাত, তাই ভাল হয়েছে।

কথাবর্ত্তার মাঝখানে পঞ্চুর বউয়ের ডান হাতখানা কাঁথার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের হাতঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গুণে নিল ডাক্তার। তারপর পকেট থেকে ষ্টেথোস্‌কোপ বের করে বলল, পঞ্চুর মা কই চন্দর? আলগোছা ত রুগী দেখা হবে না বাপু।

আজ্ঞে পেঠিয়ে দিচ্ছি বলে ধড়মড় করে উঠে বাইরে চলে গেল চন্দর।

দীর্ঘঘোমটায় মুখ ঢেকে জড়সড় হয়ে ঘরে এল পঞ্চুর মা।

রমাপতি পরীক্ষা করতে লাগল। বলল এ রকম হল কেন? পড়েটড়ে গিয়েছিল?

তা হতেও পারে। ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল পঞ্চুর মা।

রমাপতি বাইরে এল। একটু জল দে পঞ্চা। ঘরে সাবান থাকে ত নিয়ে আয়।

দাঁড়ান দিচ্ছি। ঘরে গিয়ে বউকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু, সাবান কমনে আছে? দেখ দিনি, থুয়েলাম ঐ পিকচারডার পেছনে। উঠে বসল পঞ্চুর বউ, মলিন চোখমুখে তখনও সরমের লালিমা লেগে রয়েছে। পঞ্চু সাবান নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, বউ তার কাপড়ের খুঁট ধরে টানল। শোন, একটা কথা বলব।

কি? হেঁট হয়ে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু।

বউ বলল, ডাক্তারবাবু চলে গেলে একবার আসবা, কথা আছে।

রমাপতির হাত ধোয়া হয়ে যেতেই আঁচলের খুঁট থেকে দুটো টাকা বের করে তার সামনে রাখল পঞ্চুর মা।

ডাক্তার চলে যেতে পঞ্চু ঘরে এল। শিশি নিয়ে এখুনি ডাক্তার-খানায় যেতে হবে।

ওষুধ আনতে যাচ্ছ? বউ জিজ্ঞাসা করল।

হাঁ।

শিশে, শিশে ওষুধ খাওয়াচ্ছ, দাম দেবে কেডা? প্রশ্নে জটিলতা থাকলেও, পঞ্চুর মনে কোন দাগ পড়ল না।

সে ভাবনা তোর কেন?

তোমার ভাবনা নেই বলেই আমারে ভাবতে হয়। ছাগল বেচা কড়া ট্যাকা ছেল মায়ের, সব ত গেল। যা হবার তা ত হয়েই গিয়েছে। এখন নাইতে খেতেই সেরে যাবানি!

পঞ্চুর মুখখানায় ছায়া পড়ল। বউ উঠে বসে পঞ্চুকে আরও কাছে ডাকল। ডাক্তার নোক ভাল নয়।

নোক ভাল নয়? কেন রে? এ কথা বলছিস কেন?

তোমাদের চোখ নেই, তাই বলতে হয়।

অভিযোগে অপমানের আভাস থাকলেও, স্ত্রীর অভিজ্ঞতাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল পঞ্চু। না, না, গাঁয়ের নোক ত মন্দ বলে না রমাপতি ডাক্তারকে।

গাঁয়ের নোক না বলুক, আমি বলি। পুরুষমানসের দোষগুণ, তা তোমরা কি বোঝবা?

তবে ও সুমুন্দির ওষুধ আর আনব না। এখুনি রাজু ডাক্তারের কাছে চললাম।

কোন ডাক্তারের কাছে আর যেতে হবে না। আমি ভাল হয়ে

গিছি। তুমি শুধু মারে ডেকে বল, আজ থেকে খাওয়া দাওয়া একস্তরে হবে।

সেডা তুই বললেই ভাল হত না?

না। তোমার বলাই ভাল। আমি বললে ভাল শোনাবে না। এতবড় মরদ হলে, এ সব কথা বোঝ না কেন?

ক্রমাগত নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে পঞ্চুর মনটায় আর কোন বাঁধন ছিল না। যে স্ত্রীকে সে একদিন আগে কুৎসিৎ সন্দেহের বশে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল, আজ তার মধ্যেই পবিত্রতা আর সুস্থ বুদ্ধির সংমিশ্রণ দেখে ভেতরটা তার একেবারে ভরে উঠল।

দেঁড়িয়ে রইলে কেন? শিশি নেমিয়ে থুয়ে দু-দণ্ড থির হয়ে বস না।

পঞ্চু হেসে একেবারে বউয়ের গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

সর, সর। এখন ছুঁতে নেই। কেডা দেখতে পাবে। সসঙ্কোচে বউ নিজেই একটু সরে গেল।

তোর বিধেন মানতে মানতে আমার জান গেল। বামুণদের ঘরে না জরমে তুই দুলের ঘরে জরমালি কেন?

বামুণদের ঘরে জরমালে কি আরও দুটো হাত গজাত?

না, তাতে খুব ভাল দেখাত না। দু খানা হাতেই তোরে ভাল ঘরে মানায়, তাই বলছি।

সে আমার চেয়ে তোমারেই বেশী মানায়। কিন্তু তাতে ত পেট ভরবে না। যে যেমন, সেরকম চললেই তারে ভাল মানায়।

কেন? হেলার মতন চলতে যদি আমার না ভাল নাগে, তবুও চলতে হবে?

ফিক্ করে হেসে পঞ্চুর বউ বলল, হেলারে তুমি মন্দই বল আর

যাই বল, তোমাদের মতন ফুটোমাদারি নয় সে। তার ঘর দুয়োর দেখলে চোখ জুইড়ে যায়। মা নক্ষ্মী উপচে পড়ছে। গোলাভরা ধান, বউয়ের গায় সোণা রূপো ধরছে না।

আরে থো থো তোর গোলাভরা ধান আর গা ভরা গয়না। মা নক্ষ্মী মাথায় থাক। হেলার মতন কুত্তাগিরী করে বড়নোক হওয়ায় চেয়ে ভিক্ষে মেগে খাওয়া অনেক ভাল। কথাটা বলেই বউয়ের মুখখানার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল পঞ্চু। কিন্তু কোন বৈলক্ষণ্য তার চোখে পড়ল না।

সে যে কি করে তোর শুনে কাজ নেই। তবে এইটুকু মনে করে থুস্, জরমের যার গোলমাল নেই, ও পয়সা সে হজম করতে পারবে না। কথাকটা বেশ জোর দিয়ে বলল পঞ্চু। কিন্তু ভয় পাওয়া দূরে থাক, বউয়ের মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল।

হেলার কথা তুমিই জোর করে তোললে, আমি বলি নি। আমি বলছিলাম তোমার কথা। তুমি হয়েছ না ইদিক, না উদিক। না ভদ্দরনোক না ছোটনোক। এইবার পঞ্চুও হেসে ফেলল।

কে বলল আমি ছোটনোক নই? তুই বুঝি আমারে ভদ্দরনোক মনে করে সুখ পাস?

দেখ। বাপের বাড়ীর দেশে ভদ্দরনোক অনেক দেখিছি। এখেনেও দেখছি। বামুন কায়েৎ মাথার মণি, তেনাদের নিন্দে করছি নে। তবে তুমি তেনাদের অনেকের চেয়েও ভাল। বউয়ের মুখখানা সস্মিত আভায় ঝলমল করে উঠল! তবে···।

তবে কি বলছিস?

বলছি, তাতে কি তোমার পেট ভরছে? সিঁথে কেটে, জামা গায় দিয়ে, জুতো পরে তুমি যখন বেরোও, অনেক ভদ্দরনোকের

চেহারা তোমার পাশে ম্যাক্‌মেকে দেখায়। সেইজন্যেই কোনদিন চালে ওঠতে পারলে না, মাঠে কাজ করতে পারলে না, জলে নাবতেও পারলে না।

পঞ্চু বুঝতে পারল, বাপের অভিযোগগুনো মুখস্থ বলে যাচ্ছে তার বউ। বেশ গুরুজনের মতন বুলি কাটছিস যে! বাবা বুঝি তোরে পাখীপড়া করে তালিম দিয়ে নিয়েছে?

তা নয় গো, তা নয়। তা হলে আসল কথা বলি শোন। হেলার 'বউ যেদিন ট্যাকাগুনো আমার হাতে গুঁজে দেল, বলল, ট্যাকাটা তোরে দিচ্ছি; তুই, তোমার নাম করে বলল, ওরে একটু বুঝিয়ে বলিস। আমার গাডা ডোল দিয়ে উঠল। লোটকখানা ফিইরে দিয়ে বললাম, না, না আমি নোব কেন? বড়নোকের ট্যাকা আমি মেয়েনোক কেন নোব? বলল, না না, ও তারই ট্যাকা। তবে ও বোকা কি না, নইলে একমুঠো ট্যাকা কেউ ছাড়ে? তাতেও নেব না, তখন জোর কবে আঁচলে বেঁধে দিয়ে বলল, বড় নোকের ধন বারভূতে খাবে। যা বোকা তোর মিন্‌সে, ট্যাকা না নিস্‌, মদ গিলিয়ে কাজ হাসিল করবে, মাঝে পড়ে তোরই নোক্‌সান হবে। তাই বলছি, এই যে ট্যাকা পয়সা নিয়ে সাধাসাধি, সে-ত তোমার মুরোদ আছে বলেই। যদি বড়নোকের সঙ্গে না মিশতে, গতরে খাটলে ওর দশগুণ ট্যাকা তুমি আনতে পারতে। আর সে ট্যাকা আমি হাসতে হাসতে ঘরে তোলতে পারতাম।

পঞ্চু ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। উপদেশ শুনতে তার কোন দিন ভাল লাগে না। এ ধরণের ওপরপড়া শুভেচ্ছা তার মনের খেয়ালের সঙ্গে কখনই মেলে না। তবুও খর জ্যৈষ্ঠের নিস্তব্ধ পরিবেশে, তারই একান্ত নিজস্ব অধিকারভুক্ত রমণী-মনের অন্তর্নিহিত

কথাগুনো বিশ্বস্ততার আকুতি নিয়ে তার সমগ্র চেতনার ওপর ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। অধিকন্তু তার মনে হল, তার বিদ্রোহী মনকে জোর করে পরিচালিত করবার অধিকার যদি কারুর থাকে, সে তার স্ত্রীরই আছে।

পঞ্চু বলল, তোরে ত সেদিন বলেই দিইছি, লাঠি আর কোনদিন ধরব না। তবে জন মজুরও খাটতে পারব না।

তবে কি করবা ?

কাজের কি অভাব আছে রে ? নিকিরিদের সঙ্গে কঁ্যাঠাল বাগান জমা নেব। সহরে নৌকো করে কাঁঠাল চালান দেব। তারপরই ধর না কেন……

আগ্রহে বউ পঞ্চুর মুখের কাছে আরও সরে এল। স্বামীর কথাগুলো যেন বড্ড নতুন শোনাচ্ছিল। উচ্ছ্বাসের মধ্যে দুজনের কেউ লক্ষ্য করে নি দয়াবুড়ী একেবারে ঘরের ভেতর এসে দঁড়িয়েছে।

দয়া বলল, ওরে বাবা ! তোদের যে আর হুস্‌পব্ব নেই দেখছি। বউ আছে কেমন ?

পঞ্চু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল।

ভাল আছে তোমাদের আশীব্বাদে। এস দিদিমা, বস।

না বসব না। মোদের কি আর বসবার যো রেখেছে ভগমান ? তেমন কপালই নয়। কি গো বউ, ভাল আছিস্ ত ? যে কাণ্ড বেধিইলি কাল !

ভাল আছি দিদিমা। দেঁড়িয়ে রইলে কেন ? বস ঐ বিছেনডায়। নিজের বিছানা থেকে একটু দূরে প্রসারিত একখানা অর্দ্ধমলিন চট দেখিয়ে দিল বউ।

পঞ্চু কিংবা তার বউয়ের বসবার আহ্বানটা ঠিক যেন শুনতেই

পেল না দয়াবুড়ী। অধিকন্তু তার সন্ত্রস্ত চোখদুটো দোরের বাইরে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

আয় লো সাবি। দেঁড়িয়ে রইলি কেন? ঘরে আয়।

সেই মুহুর্তে যদি ঘরের ভেতর বাজ পড়ত, তাতেও বোধ হয় ততটা বিচলিত হত না পঞ্চু। নিজের পাড়ার এলাকা ছাড়া কোনদিন কোনখানে যায়নি সাবি। কে? সাবি এয়েছে? নিতান্ত বিস্ময়ের ঘোরেই কথাটা বলল পঞ্চু।

নিঃশব্দ ছায়ার মত ঘরে এল সাবি। পঞ্চুর বউয়ের সঙ্গে তার পরিচয় নেই বললেই চলে। থান ধুতির আঁচলে কপাল অবধি ঢাকা, মলিন অথচ সুপরিচ্ছন্ন মুখ, বড় বড় চোখ দুটোর ঘন পল্লব একটু যেন ভারি ভারি। সাবিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার দেখে নিল পঞ্চুর বউ।

দয়া বলতে লাগল, কাল রাত্তির থেকেই বলছে, পঞ্চুদার বউকে একবার দেখে আসি। আমি বললাম, তোর বাপু শোকাতাপা শরীল, যেতে পারবি কি? বলে, কেন পারব না? মানুষের সময় অসময় কি না দ্যাখলে চলে? পঞ্চু কি বলল ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু সাবি একেবারে পঞ্চুর বউয়ের পাশে এসে বসল।

এখন কেমন আছ বৌদি? আবক্ষলম্বিত ঘোমটা বাড়িয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল পঞ্চুর বউ।

সাবির অত্যন্ত সরল মুখখানার ওপর কে যেন সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিল। তবুও কোন রকমে আবার জিজ্ঞাসা করল সাবি, কথা কইতে কি কষ্ট হচ্ছে বউদি? ঘাড় নেড়ে দুর্ব্বোধ্য একটু সঙ্কেত করে আরও একটু দূরে সরে বসল পঞ্চুর বউ।

পঞ্চুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

পঞ্চুর বউয়ের অবস্থা খারাপ শুনে দেখতে এসেছিল সাবি। কাহিনীটা অবশ্য তার দয়ার মুখেই শোনা। পঞ্চুর ওপর দোষ চাপাতে ব্যাপারটাকে সে বেশ খানিকটা অতিরঞ্জিতও করেছিল। শুনে পর্য্যন্ত পঞ্চুর ওপর বিতৃষ্ণায় তার গা জ্বলে যাচ্ছিল। বরাবর পঞ্চুর ওপর একটা উঁচু ধারণা ছিল সাবির। হঠকারী হলেও সে যে নিষ্ঠুর নয় এই ছিল তার বিশ্বাস। রাতে দয়ার পাশে শুয়ে নিজের তীব্র দুঃখের ফাঁকে ফাঁকে এই কথাটাই তার মনের মধ্যে বহুবার উঁকি দিয়ে গেছে। বউকে আধমরা করে রেখে নির্ভাবনায় তার বাড়ী এসে বসেছিল পঞ্চু। তার বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করতে চেয়েছিল। এই অনাসক্তির মূলে যে কতটা হৃদয়হীনতা লুকিয়ে থাকতে পারে, অনেক করে ভেবে দেখেও সে ঠিক ধারণা করতে পারে নি। কিন্তু এটুকু হল তার নিজস্ব চিন্তা। এ ছাড়াও দয়াবুড়ীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতগুনো যা তার মনটার গায়ে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধিয়ে দিয়েছে, পঞ্চুর দিক দিয়ে যদি তার কিছুটাও সত্য হয়, নিজে নিষ্পাপ হলেও সে গ্লানি ত দুঃসহ বোঝার মত তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না। তবুও যখন পঞ্চুর বউ তাকে বাড়ী বয়ে আসতে দেখে একটা কথাও বলল না, একভাবে কাঠ হয়ে বসে রইল, এমন কি অতবড় দুর্দ্দান্ত স্বভাব পঞ্চুর মুখ দিয়ে একটা কথা পর্য্যন্ত বেরুল না, মনে মনে লজ্জা পেলেও, মনটা তার অনেকটা হাল্কা বলেই মনে হল। কিন্তু মন হাল্কা হলেও সময়টা যেন পাহাড়ের মত ভারী হয়েই রইল। এতগুনো প্রাণী একেবারে নির্ব্বাক। দয়া পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গেছে। মাথা হেঁট করে বসে সাবি পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখটা পরীক্ষা করতে লাগল। পঞ্চুও সম্পূর্ণ হতবাক।

হঠাৎ পঞ্চুর বউ কাপড় চোপড় সামলে দাঁড়িয়ে উঠে কারুর দিকে

না চেয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই পঞ্চুর যেন জ্ঞান ফিরে এল। ওকি ? কমনে যাচ্ছিস ? ডাক্তার উঠতে মানা করে দিয়েছে··· ।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে পঞ্চুর মুখের ওপর অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাইরে চলে গেল বউ।

হেই মা। ধন্যি বউ পেয়েলি পঞ্চা ! গড় করি মা বউয়ের পায়।

একবার দয়া, একবার সাবির মুখের দিকে চেয়ে মাথা নীচু করল পঞ্চু।

বউদিরে তুমি ঘরে ডেকে আন পঞ্চুদা। আমরা চলে যাচ্ছি। সাবি বলল।

চললি। তা আর একটু···কথাটা শেষ করতে পারল না পঞ্চু।

হাঁ। তুমি মনে দুঃখ্যু কর না পঞ্চুদা। আমার সময় এখন খুব খারাপ ! সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন ?

কিন্তু যেতে যেতে দু একটা মন্তব্য না করে পারল না দয়াবুড়ী।

কালে কালে আরও কত দ্যাখব ? অতি বড় শত্তুরও মানষের বাড়ী বয়ে এলে অমান্যি করতে নেই। ছিঃ, ছিঃ।

তুমি চুপ কর দিদিমা। দুটি পায় পড়ি তোমার। সাবি দয়ার কাপড়ের আঁচলটায় একটু টান দিল।

আর কোন কথা না বলে সাবিকে সঙ্গে করে চলে গেল দয়াবুড়ী।

৪

সাবির লাঞ্ছনা চোখের ওপর দেখেও তার কোন প্রতিবিধান করতে পারল না পঞ্চু। দিনকতক বউয়ের সঙ্গে একটা কথাও বলল না। কিন্তু তাতেও সে প্রতিপক্ষের দিক থেকে আত্মসমর্পণের কোন

লক্ষণই দেখতে পেল না। এ কদিনের মধ্যে বাড়ীর অবস্থা যেন একেবারে বদলে গেছে। সকাল হতে না হতেই পঞ্চুর মা বউকে ঘুম থেকে তুলে, কাপড় ছাড়িয়ে গরম গরম ভাত খাইয়ে পরের বাড়ী কাজ করতে চলে যায়। চন্দর জন খেটে এসে দাওয়ায় গামছা পেতে বসে। তারপর পঞ্চুর বউকে ডাকে। কই গো মা, পয়সা কড়িগুনো থোও।

বউ বেরিয়ে এসে শ্বশুরকে পাখার বাতাস করে, হুঁকোকলকে চকমকি কাছে এগিয়ে দেয়।

আজ শরীলডে কেমন আছে গো? জ্বর টর হয়নি ত? চন্দর জিজ্ঞাসা করে।

জ্বর হয় না ত। হেসে হয়ত জবাব দেয় বউ।

পঞ্চুর মা তরকারির কড়াটা উনুন থেকে নামিয়ে রেখে বলতে থাকে। জ্বর হয় না ত কি? ভেতরে ভেতরে ঘুষঘুষে জ্বর হয়। নইলে একরাশ চুল হুদিনে সিঁটকি হয়ে যায়। রোজ হুবার করে পচা ডোবায় গা বুড়িয়ে আসবে। চন্দর হুঁকো নামিয়ে রেখে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে ওঠে।

পচা ডোবায় গা বুড়িয়ে আসে আর তুই শাম খুঁটি হয়ে বসে থাকিস?

এতেও কোন বাঁকা উত্তর দেয় না পঞ্চুর মা। বললে কি শোনে? কত মানা করি।

ঘরের ভেতর দেখে নিয়ে বলতে থাকে চন্দর। এ সব ঐ গোডার ভূতটার জন্যে।

চুপ কর বাবা। ঘরে আছে। তাড়াতাড়ি শ্বশুরকে সাবধান করে দেয় বউ।

পঞ্চু কিছুই বুঝতে পারে না। বাপমায়ের সঙ্গে বউয়ের এই আত্মীয়তা তার ভালই লাগে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয় স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রীতিবন্ধন ক্রমশই যেন আলগা হয়ে আসছে। এমন কি রাগ অভিমান ইত্যাদি দাম্পত্য জীবনের অব্যর্থ অস্ত্রগুনো যেন আপনা হতেই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রে স্বামী স্ত্রী একঘরেই শোয়। পঞ্চুর কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে বউয়ের জন্য নিজের হাতে বিছানা পেতে দেয় পঞ্চুর মা। দিন কতক সহ্য করে শেষ পর্য্যন্ত আর থাকতে পারল না পঞ্চু। মাকে ভাত দিতে দেখে, দাওয়া থেকে ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল।

কি রে? শুলি যে? খাবি নে? পঞ্চুর মা জিজ্ঞাসা করল।

না। গম্ভীরভাবে জবাব দিল পঞ্চু।

কেন? শরীল খারাপ করেছে? পঞ্চুর ইচ্ছা হল বলতে, শরীল খারাপ তোর ঐ নবাবের বিটী সোহাগী বউয়ের হতে পারে, কিন্তু চেপে গেল।

ডাকলে কথা কস না কেন বলত? কি হয়েছে তোর?

আজ থেকে আর তোদের বাড়ীতে খাব না। উত্তর শুনে পঞ্চুর মার গলা শুকিয়ে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল, এ কদিন পঞ্চু তার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি। সারাদিন ঘরে বাইরে অবিশ্রান্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে ছেলের এই নীরবতার গুরুত্ব সে ঠিক অনুমান করতে পারে নি।

পঞ্চুর মা বলল, আয় বাবা। রাগ করিস নে। যা হক দুটো মুখে দিয়ে আমায় ছুটি দে। সেই কোন সাতসকালে উঠিছি। গা গতর ভেঙ্গে পড়ছে।

তাড়াতাড়ি বসে গব্ গব্ করে দু চার গ্রাস ভাত খেয়ে নিয়ে ঢক ঢক করে একঘটি জল নিঃশেষ করে উঠে পড়ল পঞ্চু। পঞ্চুর মার বুঝতে বাকী রইল না, তাকে কোন রকমে ছুটি দিতে যা হোক করে খাওয়া সেরে নিল পঞ্চু।

রাতে শুতে এসে আজ আর চুপ করে থাকতে পারল না বউ। উঃ, মা গো। কি একটা কামড়াল, বড্ড জ্বালা করছে।

পাড়াগাঁয়ের খর গ্রীষ্মের রাত। পঞ্চুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। কমনে কামড়াল ? দেখি। তাড়াতাড়ি উঠে দেশলাই জ্বালল পঞ্চু। থাক্, আর মায়া দেখাতে হবে না। ঢের হয়েছে। ফুঁ দিয়ে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা নিভিয়ে দিল বউ। বাইরে তখন চন্দরের নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে। সর্পাঘাত সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা থাকলেও এ ক্ষেত্রে একটু ভুল করল পঞ্চু। কেরোসিনের লম্পটা জ্বেলে ফেলে সে বউয়ের সমস্ত দেহটা পরীক্ষা করতে বসল।

কমনে কামড়াল, ছ্যাখা। আচ্ছা দঁ্যাড়া। দোব খুলে বাইরে গিয়ে গোটাদুই কাঠি নিয়ে এল পঞ্চু। পাশাপাশি চতুষ্কোণ দুটো ঘর কেটে তার ওপর হাত দুখানা রাখল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল বউ।

এইবার বুঝতে পারল পঞ্চু, কি একটা কামড়াল ইঙ্গিতটা ছল ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাত্তিরে ও সব কথা বলে ঢং করা ভাল নয়।

তোমারে ত বলিনি যে নতায় কেটেছে আমারে। তা হলে ত বেঁচে যাই তোমার হাত থেকে।

কদিন কথাবন্ধের পর বউয়ের মুখ থেকে প্রথম কথা পেয়েও মনটা ঠিক সন্তুষ্ট হতে চাইল না পঞ্চুর। সে দিন সাবির সঙ্গে

দুর্ব্যবহারের পর থেকে বউয়ের ঔদ্ধত্য দিন দিন বেড়েই চলেছিল। পঞ্চু আবার চুপ করে গেল।

একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বলল পঞ্চুর বউ, আমারে যদি না ভাল নাগে, বলে দিলেই পার। চোরের ওপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খেয়ে কি নাভ ?

তোরে আমার ভাল নাগে না, সেইটে জানা বুঝি বড্ড দরকার হয়ে পড়েছে। না ?

তা বইকি ? বাবা আমার অসুখের খবর পেয়েছে। দু এক দিনের মধ্যে কেউ না কেউ আসবে। মনে করেলাম দু দিন ঘুরে শরীলডা সেমলে আসব। তা তোমার যদি না পোষায়, আর আসব না। শেষের দিকটা তার স্বর কান্নায় বুজে এল।

ও, সেই জন্যেই বুঝি যাবার আগে সম্বন্ধ মিটিয়ে থুয়ে যাচ্ছিস ? ভাল। তা তোর যা ভাল মনে হয় করিস। আমারে কিছু জিগ্যেস করিস নে।

আমি আর কি মনে করব। মনে ত তুমিই করিয়ে দেচ্ছ।

আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি কি রকম ?

বুঝে ছাখ। আমি ত ভুলে থাকতে চাই। মনে করি কপাল য্যাখন পোড়া, চুপ মেরে থাকাই ভাল।

পঞ্চু উঠে বসল। কপাল পোড়া নয়। তবে যদি নিজের কপালে নিজে আগুন ধরাস, আমি কি করব বল ?

নিজের বরাতে কিসে আগুন ধরালাম ? তোমার পীরিতের সাবির পায় তেল দেই নি বলে ? খ্যাংরা মারি তার মুখে। এবার যদি বাড়ীর মধ্যে পাই, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।

পঞ্চুর মনে হল উঠে গিয়ে বউয়ের টুঁটিটা টিপে ধরে। কোন

রকমে দাঁতে দাঁত চেপে সে শুয়ে পড়ল। পঞ্চু যদি উঠে এসে সত্যই বউয়ের গলা টিপে ধরত, তাতে হয়তো কিছু শান্তি পেতো বউ।

কিন্তু পঞ্চু যে এতবড় আঘাতটায় প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা, একেবারে গুম হয়ে পড়ে রইল, এতে তার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিছে কামড়াতে লাগল। নির্দ্দোষ হলে নিশ্চয়ই এত বড় কথাটা হজম করতে পারত না পঞ্চু। সে রকম স্বভাবই নয় তার। তা হলে লোকের কথা বা তার সন্দেহ একেবারে মিথ্যা নয়। আর তার পঞ্চুর সঙ্গে কথা বলতে প্রবৃত্তি হল না।

বস্তুতঃ পঞ্চুর বউয়ের বিশেষ কোন অপরাধ ছিল না। যে দিন আঘাত বশতঃই হক, বা যে কারণেই হক, দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে সে জানতে পারল তার গর্ভস্থ সন্তান অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে দয়াবুড়ীর মুখে শুনতে পেল পঞ্চু নির্ব্বিকার চিত্তে সাবির বাড়ী বসে আছে, তখন তার মনে হল সন্তানের সঙ্গে তার নিজস্ব জীবনের মিয়াদ নিঃশেষ হয়ে গেলেই ভাল হয়। কিন্তু যখন পঞ্চু উন্মাদের মত ছুটে এসে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করে হৈচৈ বাধিয়ে দিল, তখন তার খেয়াল হল, তারই অবাঞ্ছিত প্রাণটাকে জোর করে আটকে রাখতে বাড়ীশুদ্ধ লোকের আগ্রহের শেষ নেই। হঠাৎ কি করে তার জীবনটা এতখানি মূল্যবান হয়ে উঠল, ঠিক বুঝতে না পারলেও চারিদিকের সহানুভূতির সুরটা তার ভালই লাগছিল। ঠিক তার পরের দিন যখন রমাপতি ডাক্তার রোগ দেখার চেয়েও রোগিনীকে বেশী করে দেখে গেল, এবং তার পরেই সাবি তাকে দেখতে এল, তার মনে হল সহানুভূতির ছদ্ম আবরণে তার চারপাশ জুড়ে একটা লাঞ্ছনার ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে। মনের এই দুঃসহ অবস্থায় পঞ্চু যখন তার সঙ্গে হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিল, শ্বশুর শাশুড়ী

তুজনেই যেন তার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল। তাদের এই অযাচিত স্নেহের ওপর ভর করে তার মন আশ্রয় পেল, কিন্তু শান্তি পেল না। চন্দর পুত্রবধূকে বরাবর স্নেহ করত। তার সামনে পঞ্চুর চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে আক্ষেপ জানাতেও দ্বিধা করল না। সেই সঙ্গে সে গোপনে বউয়ের বাপের কাছে তার অসুস্থতার খবরটাও পাঠিয়ে দিল। পঞ্চুর বউ সব জানত। তুচার দিনের মধ্যে তার বাপ এসে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে, এ কথাও চন্দর তাকে জানাল। তাই সে মনে মনে ঠিক করে রাখল, বাবা এলে তাকে যা হক কিছু বুঝিয়ে ফিরিয়ে দেবে। স্বামীর এই দোটানা অবস্থায় তাকে একলা ফেলে সে কোনখানে গিয়ে শান্তি পাবে না। সেইটুকু জানাবে বলে সে ছলছুতা করে পঞ্চুর কাছে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করছিল।

অন্ধকার ঘরে তুচোখের জলে তার বুক ভেসে যেতে লাগল। পঞ্চু জেগে আছে কি ঘুমিয়েছে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। একটানা নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে হয়ত কোথায় কুকুর ডেকে উঠছে। ঘরের পেছন দিয়ে সশব্দে কি একটা ছুটে চলে গেল, শেয়াল কি কুকুর যা হক কিছু। ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, নক্ষত্রে ভরা। পঞ্চুর মুখে এক দিন শুনেছিল, কোথা থেকে শুনে এসেছে, ওখানেও নাকি মানুষ থাকে। শুনে তার হাসি পেয়েছিল। তা কখন হতে পারে? আকাশে কখন মানুষ থাকে, না থাকতে পারে? ছোটবেলায় দিদিমার কাছে হেঁয়ালি শিখেছিল, বল দিনি, 'একথালা সুপুরী, গুনতে পারে না ব্যাপারী' মানে কি? বলতে না পারায় দিদিমা বুঝিয়ে দিয়েছিল। নক্ষত্র। আজ তার মনে হল হয়ত পঞ্চুর কথাই সত্য। রাক্ষসীর মত চোখ মেলে

তারা মানুষের জানলা ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে সব কিছু দেখে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে সে জানলাটা বন্ধ করতে গেল। বন্ধ করবে এমন সময় তার মনে হল, জানালার ধার থেকে মানুষের মত কি যেন একটা সরে গিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

বাবা গো! চিৎকার করে সে পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

কি হয়েছে? চেলাচ্ছিস্ কেন? পঞ্চুর নীরস জিজ্ঞাসাটা তার ভয়সন্ত্রস্ত মনটাকে যেন ছুরি দিয়ে চিরে দিল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, জানলার ধারে মানুষ দেঁড়িয়ে।

পঞ্চু উঠে আলো জ্বালল। সঙ্গে সঙ্গে চন্দর জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে র‍্যা পঞ্চা? বউডো চেঁচাল কেন?

পঞ্চু তখন জানালা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। দূরে দু তিনটে কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠল।

মনুষই বটে। ঘরের আড়া থেকে লাঠির গোছা পেড়ে একগাছা লাঠি টেনে নিল পঞ্চু। মনে করেলাম লাঠি আর ধরব না। কিন্তু শালানরা তা হতে দেবে না।

দোর খুলে একলাফে দাওয়া থেকে নেমে পড়ল পঞ্চু।

বউয়ের দুদিকে চন্দর আর পঞ্চুর মা বসে আছে। উপু হয়ে বসে দু হাতে হুঁকো জড়িয়ে তামাক টানছে চন্দর। পঞ্চু ফিরে এসে লাঠিগাছটা যথাস্থানে তুলে রাখল।

কি রে? কিছু দেখলি? পঞ্চুর মা জিজ্ঞাসা করল।

কিছু নয়। তোমরা শোও গে, পঞ্চু বলল। চন্দরের কথাটা ঠিক মনে লাগল না! তবে যে বললি মানুষ?

মানুষ না ঢেঁকি। ·এই দশখানা গাঁয়ের কোন শালা মানুষের

ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে পঞ্চু মাল্লিকের জানালা দিয়ে উঁকি মারবে ?

তা হতেও পারে। ছেলে মানুষ, ভয়-তরাসে. ভয় খেয়েছে। পঞ্চুর মা বলল।

ওসব কথা বাদ দে। কখন নতায় কাটছে, কখন নোক দেখছে। একটু পরে বলবে ওর মাথাডাই কেডা কেটে নিয়ে গিয়েছে। বাপ মায়ের সামনে স্ত্রীর দুর্ব্বলতা নিয়ে এতটা বিশ্লেষণ কখন করে নি পঞ্চু।

হতেও পারে। গাঁ কি আর গাঁ আছে ; বজ্জাতে ভরে গেছে। চন্দর পুত্রবধূর পক্ষ সমর্থন করল।

তা হলে তুমি ওরে চৌকি দিয়ে বসে থাক, আমি শোব। সস্ত্রীক ঘর থেকে দাওয়ায় এল চন্দর।

৫

সকালে ঘুম থেকে উঠে পঞ্চু দেখল, বাবা মা দুজনেই কাজে বেরিয়ে গেছে। বউ উঠে ঘর দোর পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে। ঘরের সংলগ্ন দাওয়াটা নিকান। এককোণে পান্তাভাত চাপা দেওয়া রয়েছে। পাশে একঘটি জল, খানিকটা নুন, গোটাকতক কাঁচা লঙ্কা। কিছুদিন থেকে এইভাবেই তার খাবার সাজান থাকে। বিনা নিমন্ত্রণে ঢাকা কাঁসিখানা খুলে ফেলে খেতে বসে যেত পঞ্চু। আজ তার মনটা হঠাৎ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেঁকে বসল। যেই তার খাবার রাখুক না কেন, মা কি বউ যেই হক, তার কি উচিত হয় না তাকে একবার ডেকে খাবার কথাটা বলা ? মুখ হাত পা ধুয়ে এসে মুখস্থ মত খাবারের কাছে না বসে সে তামাক সাজতে বসল। চক-

মকি ঠুকতেই বউ একবার তার দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে আবার কাজ করতে লাগল। পুরো এক ছিলিম তামাক শেষ করেও সে বউয়ের মুখ থেকে একটা কথাও শুনতে পেল না। পরনের কাপড়-খানা ফেরতা দিয়ে পরে, গামছাখানা গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বাইরে আসতেই বউ বলল, না খেয়ে চললে যে ?

আমার খুসি।

বড্ডা যে তেজ ফলান হচ্ছে ! ঘরের ভাত ভাল নাগছে না। তা আমাদের হাতে খেতে কি মিষ্টি নাগে ?

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলেও, কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল পঞ্চু। দু এক পা এগিয়ে যেতেই বউ একেবারে সামনে এসে তার পথ আগলে দাঁড়ল।

সকাল বেলা যাওয়া হচ্ছে কম্‌নে ? দুটো গিলে নিয়ে গেলেই হত না ? হাত দুখানা ধরে বউকে-একপাশে সরিয়ে দিল পঞ্চু, বলল, তুই খেয়ে নিস।

কথাটার সুরে আঘাত লাগল বউয়ের। রাত থেকে একরকম না খেয়েই আছে পঞ্চু। তার ওপর একবার বাইরে গেলে কখন যে ফিরবে কিছুই স্থির নেই। তাই গত রাত্রের প্রচ্ছন্ন মান অভিমান এবং প্রকাশ্য অপমানের জ্বালা অগ্রাহ্য করে সে পঞ্চুর সঙ্গে যে আলাপের উপযাচকতা করছিল, সে শুধু অভুক্ত স্বামীকে খাওয়ান ছাড়া আর অন্য কোন কারণে নয়।

আমার খাওয়াটাই ত তুমি ছ্যাখ, বলে সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ায় উঠে ভাতের বড় জামবাটিটা বাইরে এনে আঁস্তাকুড়ে সমস্ত ঢেলে দিল বউ।

খানিকটা চুপ করে থেকে বাড়ীর সামনে রাস্তায় এসে দাঁড়াল

পঞ্চু। তারপর পথের দুদিকে চেয়ে দেখল, একটা দিক উত্তরমুখে সোজা চলে গেছে গ্রামের বুড়োশিবতলা ছাড়িয়ে, বেরষনাড়ার পাশ দিয়ে বাজারে, গঙ্গার ঘাটে, ভূপতি মজুমদারের বাড়ীর দিকে। আর একটা দক্ষিণ দিকে গিয়ে দয়াবুড়ী চণ্ডীবাগদির চালাঘরগুনোর পাশ দিয়ে আবার পূর্ব্বদিকে চলে গেছে হাড়ীপাড়া, মালপাড়া ছাড়িয়ে।

ডেঙ্গামাঠের পাশ দিয়ে দূর্গাপুরে, বন শিউলি আর নাটাকাঁটার ঝোপে ঘেরা দেশী সেগুন আর বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছ আনি তুলেদের পাড়ায়, সাবির বাড়ী পর্য্যন্ত। না। এ দু দিকের কোন দিকেই আজ সে যাবে না। এ সমস্ত উত্তর জীবনের আবর্জ্জনার মত তার পথ আটকাচ্ছে। আজ সে একটু অবসর চায়, তাই চায় নিজস্ব ছোট্ট একটা কোণ। একলা একটু ভাবতে চায়। নিজেকে সে ভাল করে দেখতে চায়। ভাল করে যাচাই করতে চায়, কি তার গেছে, কি কি নতুন পেয়েছে। পশ্চিম দিকে বামুন পাড়া ছাড়িয়ে, হৃদয়তুলেদের বাড়ীর পাশ দিয়ে, বাঁওড়ের কাঁদা পার হয়ে চরসরাটির মাঠ—ধূ ধূ করছে ফাঁকা। আউস ধান আর পাট ক্ষেতের ওপর দিয়ে সিরসির করে বাতাস আসছে, খর নিদাঘে শুষ্ক, অনতিতপ্ত; দেশী ঝাউ, পিটুলি আর কুল ঝোপে বাধা পেয়ে সোঁ সোঁ করে শব্দ করছে। ছোট্ট একটা ঝোপের পাশে গামছা খানা পেতে বসল পঞ্চু।

পঞ্চা। ছ্যাখ, ছ্যাখ, কি রকম কুল হয়েছে গাছে।

দূর্। এখন কি কুলের সময়?

তবে ওগুনো কি?

দেখবি? ও হচ্ছে গুটি। ওর মধ্যে রেশম থাকে।

রেশম? সিল্ক? সে-তো চাষ হয়। দশ বারটা জামা আছে আমার সিল্কের, তোকে একটা দেব, দেখিস।

গাছে উঠে গুটি পেড়ে ভাঁজ খুলে দেখিয়েছিল পঞ্চু ভূপতি মজুমদারকে, পোকাগুলো তখন গুটি কেটে বেরিয়ে গেছে। তাই নিয়ে বাড়ীতে, পাড়ায় কত বাহবা দিয়েছিল ভূপতি পঞ্চুকে। পঞ্চা আমাকে রেশমের গুটি দেখিয়েছে কুলগাছে। এতও জানে পঞ্চা! খবর পেয়ে দলে দলে পাড়ার ছেলেরা গুটি দেখতে এসেছিল মাঠে।

কিরে পঞ্চু? এখানে একলাটি বসে? ছোট একটা কঞ্চির ছড়ি হাতে আল পথ দিয়ে আসতে আসতে বলল অভয় মোড়ল।

বাতাসে তখন রৌদ্রতাপে আলোড়ন স্থুরু হয়েছে। চাক বেঁধে ঘুর্ণি উঠছে মাঝে মাঝে। দূরে. আরও দূরে, যত দূর চোখ যায়, সপের জিভের মত লক লক করে আগুনের শিখা উঠছে। পঞ্চুর মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল।

একলাটি বেশ ভাল নাগছে মোড়ল, তাই বসে আছি।

অভয় মোড়লের জমকালো গোঁফের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠল। বলল বৈরিগী হবি না কি রে, লোটা কম্বল নিয়ে? তা যদি মনের মতন সেবাদাসী পাস বেরিয়ে পড়। সংসার ধর্ম্মে অনেক জ্বালা, অনেক ট্রাবল্।

ঠাট্টা তামাসা করতে হয় মোড়ল অন্য নোক ছ্যাখ। আমি ছাড়া কি গাঁয়ে আর মানুষ নেই? অভয় মোড়লের দিকে পিছন ফিরে গঙ্গার পাড়ের ধূসর সীমারেখার দিকে চেয়ে রইল পঞ্চু। অভয় মেড়ল একেবারে পঞ্চুর কাছে বসল।

বিড়ি খাস, ত নে ধর্। অনিচ্ছাসত্বে মোড়লের হাত থেকে বিড়ি দেশলাই হাতে নিল পঞ্চু।

ঠাট্টা করিনি রে পঞ্চা। তোরে ভালবাসি বলেই কথাটা বললাম। মনে ভাবিস নে, আমার নিজের জন্যে বলছি। আমাদের

হক্কের জমি, রাজার আইন রয়েছে। কোন শালার তোয়াক্কা রাখি নে। পঞ্চুর হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলল অভয় মোড়ল।

বাল্যস্মৃতি মন্থন ছেড়ে ততক্ষণ নিজের ধাতে ফিরে এসেছে পঞ্চু। আমারে তুমি ভালবাস মোড়ল, তা বলে এত ভালবাস না যে নিজের ভাবনা ছেড়ে আমার কথা ভাবছ।

ঐ-ত। বললে তুই বিশ্বেস করবি নে। ওরে ইডিয়েট্‌! আমরা হচ্ছি চাষী লোক। ও সব মন রাখা কথা বলা আমাদের চোদ্দ পুরুষের ধাতে নেই। সে সব বামুন কায়েতরা করবে; যাদের জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব করাও চাই, আবার নিজের হাতে করবার মুরোদও নেই। পাঁচ বিঘে ভুঁই নাঙ্গল দিয়ে, ঢেলা ভেঙ্গে তৈরী করে দেব একবেলার মধ্যে, কই করুক দেখি কোন বেটা বামুন কায়েতের বাচ্ছা, দেখি কত টেংরির জোর! বলেই দাঁড়িয়ে উঠে লাঙ্গল দেবার ভঙ্গীতে সমস্ত শরীরটা টান করে দেখিয়ে দিল অভয় মোড়ল। পঞ্চু হাসি চাপতে পারল না। বলল, বস মোড়ল। কি হয়েছে, বল দিনি?

আমার আবার হবে কি। কোন্‌ শালার ধার করে খেইছি! বাপ পিতোমোর আমলের বিশ বিঘে ভুঁই পেয়েছিলাম। গতরে খেটে আরও বাড়িয়েছি। তারি ওপর টাঁক করে বসে রয়েছে যত রাজ্যির শকুনের ঝাঁক। কব্‌জীর জোর থাকে আটকাব, নয়ত লুটে পুটে নেবে, যে জনা বেশী করে মায়ের দুধ খেয়েছে। কোমর থেকে গামছা খুলে মুখের কপালের ঘাম মুছে ফেলল অভয় মোড়ল।

এতো হল তোমার নিজের কথা মোড়ল। আমার কথা কি বলছিলে? অভয় মোড়লের উত্তেজিত মুখখানায় ছায়া পড়ল।

দেখ পঞ্চা। আমরা চাষী লোক। পাকা ফসল কেটে ঘরে তুলি। আগে বীজ তুলে থুয়ে তবে পেটের চিন্তে করি। তোরে দিয়ে যদি কাজ পাই, তোরে আগে বাঁচিয়ে তবে ত কাজ। তা নয়ত তোর কাছ থেকে কাজ নেব, আবার তোরই গলা টিপে মারব! বল, আমি ঠিক বলছি কি না? ঠিকমত না বুঝেই ঘাড় নেড়ে সায় দিল পঞ্চু।

মদ খাইয়ে কাজ হাঁসিল করা, নয়ত পরের বউ-ঝির হাত দিয়ে ট্যাকা পাঠিয়ে মেয়েলোকের মন ভোলান, এসব বন্নের সেরা বামুন কায়েৎ—মাথার মণি, বড়লোক ভাইরাই পারে, আমাদের মত চাষীলোকে পারে না।

এইবার পঞ্চুর মুখখানায় খর রৌদ্রের উত্তেজনা এসে ছড়িয়ে পড়ল। কেডা কি পারে না পারে সে জমাখরচে এখন দরকার নেই মোড়ল। তবে পরের কথা নিয়ে মজা মারতে কেউ কম যায় না। তার ওপর মন্দ জিনিস হলে ত আর কথাই নেই।

পরের কথা নিয়ে মজা মারতে গেলে আমাদের পেট চলে না পঞ্চু। তুই একটু বুঝে সম্‌ঝে কথা বলিস্। তবে তোর মতন তো উদোমাদা নই, সাত কাজের মধ্যেও সব দিকে আমাদের চোখ-কান থাকে। তোর বউরে যদি ট্যাকা পাঠিয়ে দেয় মজুমদার হেলার বৌয়ের হাত দিয়ে, কথা কেন উঠবে না বল? বোয়ের কম্‌নে একটু অসুখ করল, আর খাল কেটে কুমীর এনে ঢোকালি ঘরে। যদি পারিস, রমাপতিবাবুর ডাক্তারখানার পাশ দিয়ে ঘুরে আসিস্। দেখবি পরের কথা নিয়ে মজা মারছে কেডা?

রাগে গস্ গস্ করতে করতে আলপথ ধরে চলে যাবার যোগাড় করল অভয় মোড়ল। এক লাফে এগিয়ে এসে তার একখানা হাত চেপে ধরল পঞ্চু। চোখ মুখ দিয়ে তার আগুন বেরুচ্ছে।

চললে কমনে মোড়ল ? কি শুনেছ, খুলে বলতে হবে।

খুলে কি বলব রে পাগ্‌লা। পাঁচ জনার মুখে শোনা। পেনোর দোকানে যাচ্ছিলাম ত্নটো নাদা কিনতে, বিষ্টু ঘোষ কথাটা বলল। রমাপতি আর ভূপতি মজুমদার বলাবলি করছিল, গাঁটা দিয়ে শুনেছে।

আর কোন কথা না বলে মাঠ বয়ে গাঁয়ের দিকে ফিরে গেল পঞ্চু। অভয় মোড়লের কথাগুনো নিয়ে তোলাপড়া করতে করতে যখন সে বাড়ী এসে পোঁছুল, ত্নপুরের সূর্য্য তখন চারদিকে আগুন ছড়াতে আরম্ভ করেছে। বাড়ী এসে প্রথমে তার মায়ের সঙ্গে দেখা হল।

কমনে গিইলি রে পঞ্চা ? কুটুম এয়েছে বাড়ীতে আর তুই বাইরে বাইরে ঘোরছিস ? ঘরের দিকে চেয়ে গলার স্বর ছোট করে বলল পঞ্চুর মা।

পঞ্চু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। আগন্তুক যে তার শ্বশুর বুঝতে বাকী রইল না তার। পূর্ব্বরাত্রে এইরকম আভাস পেয়েছিল সে বউয়ের কথায়। শ্বশুর সজ্ঞাধারী এই প্রাণীটিকে আদৌ সহ্য করতে পারত না পঞ্চু। স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্তজয়ের পথে ত্নরতিক্রমণীয় পাহাড়ের মত মনে হত এই লোকটিকে। বাপের স্নেহ সামর্থ্যের ওপর ভর করে অনেকদিন তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছে তার বউ। বাপের বাড়ী চলে যাবার ভয় দেখিয়েছে কথায় কথায়। তবুও তার মনের মধ্যে যে আত্মপ্রসাদটা-মূলধন করে সে এতদিন মাথা খাড়া করে ছিল, সেটা হচ্ছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অভিমান। আর সে অভিমানের সমস্ত শিকড়গুলো লুকিয়েছিল তার পারিপার্শ্বিক ভদ্রসমাজের তথাকথিত আভিজাত্যের মাটিতে। ছোট লোকের ছেলে হলেও সে লেখাপড়া জানে। কথা বলবার আদব-কায়দা তার মুখস্থ। শ্বশুরের আর একটি

জামাতার মত তাড়ি খেয়ে, মদ খেয়ে সে ঢলাঢলি করে না। অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা তার স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু হঠাৎ এই দ্বিপ্রহর বেলায়, এক মাথা রুক্ষ চুল আর একহাঁটু ধুলো নিয়ে সে নিজেকে বড় বিপন্ন বলে মনে করল। তাড়াতাড়ি গামছাখানা দিয়ে পায়ের ধুলো যথাসম্ভব পরিষ্কার করে, নিঃশব্দে রান্না ঘরের দিকে যেতে গিয়ে সে একবার আড়চোখে বড় ঘরের দিকে চেয়ে দেখল। আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে তার নজরে পড়ল, ঘরের মেঝেয় বসে আছে তার ভায়রাভাই দেশো, শ্বশুর নয়; আর বউ তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করছে। বেঁটে খাটো চেহারা দেশোর। চওড়া বুকের ছাতি। পেশী বহুল শির ওঠা হাত দুখানা আর মসিকৃষ্ণ গায়ের রং। ছোট ছোট চোখ আর জোঁকের মত কাল মোটা মোটা ঠোঁটের ওপর বেপরোয়া নির্লজ্জ জাতের একরকম হাসি সব সময়েই যেন লেগে থাকে। দেশোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পঞ্চু ধরা পড়ে গেল।

কি ভায়া? বলি আছ কেমন? একেবারে যে ডুমুরের ফুল। বাড়ী বয়ে এসেও দেখা পাবার যো নেই। মামুলি ধরনের রসিকতা, কিন্তু তাতেই একেবারে গলে গিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল পঞ্চুর বউ।

পঞ্চু বলল, এই একরকম চলে যাচ্ছে। আপনি ভাল ত?

ও ভায়া যে একেবারে ভদ্দরনোক হয়ে গ্যাছ হে। আপনি, আজ্ঞে, তা বেশ, বেশ। হাঁ রে ছুটকী, পঞ্চু তোরেও কি আপনি আজ্ঞে করে কথা কয় না কি? কাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লাল কাল ছোপ ধরা দুপাটি দাঁত বের করে নিজের রসিকতায় প্রাণ ভরে হেসে ফেলল দেশো।

এইবার কিন্তু প্রতিবাদ করল পঞ্চুর বউ। আমারে আপনি আজ্ঞে ত করবার কথা নয়। তবে তুমি যদি দিদিরে তাই কর, সে আলাদা

কথা কিন্তু তোমারে ত তুই তোকারি করেও কোন দিন কথা বলে না।

দেশো সে কথায় কান না দিয়েই পঞ্চুকে ডেকে বলল, চললে কেন হে? কদ্দিন বাদে দেখা, দু দণ্ড বস, কথা বার্ত্তা বল।

চানটা করেই আসছি। বড্ড বেলা হয়ে গেছে।

পঞ্চুকে চলে যেতে দেখে অগত্যা প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করল দেশো। পঞ্চা শালা ত পগার পার হল। একটু তামুক টামুক দে বাপু। কখন এইছি, ধোঁয়াযাত্রা না করে মুখে ঘাস গজিয়ে গেল মাইরি।

ও মা! তামাক দেওয়া হয়নি ত! দ্যাঁড়াও, আমি সেজে এনে দিচ্ছি। ঘর থেকে বাইরে গেল পঞ্চুর বউ।

সমস্ত দিন একরকম কাটল। দেশো সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। বউকে অনেক কথা বলবার আছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা। অভয় মোড়ল সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে সকালে। পঞ্চুর শ্বশুরের প্রতিনিধি হয়ে বউকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছে দেশো। পরের দিন সকালেই তারা যাত্রা করবে। চন্দর মত দিয়েছে।

বিকেলের দিকে মেঘের ঘনঘটার সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল, প্রায় মাসখানেক খরার পর। দাওয়ার ফাঁকে খুঁটির গায়ে গায়ে খেজুর পাতার ঝাঁপ বেঁধে দিয়ে হুঁকো কলকে চকমকি সমেত জাঁকিয়ে বসল চন্দর দেশোকে পাশে নিয়ে।

তোমার আয়পয় আছে কুটুমের পো। জ্যৈষ্ঠে খরার পর আষাঢ়ের সুরুতেই জল নাবল। এবার আগুরি বিষ্টি। পনেরদিনের মধ্যেই লল করবে বীজ। সোঁত ছেরাবন আর ভাদ্দরে বুকসমান ধান হবে। হুড়িয়ে পড়বে একেবারে।

তা বলা যায় না তাউই। দেয়া টেনে যেতেও পারে। মুরুব্বিয়ানা চালে মন্তব্য করল দেশো।

না, টানবে না, তুমি দেখে নিয়ো। বিষ্টির ফোঁটা দেখলেই বোঝা যায়। যেখানে পড়ছে দু'আঙ্গুল গর্ত্ত হয়ে যাচ্ছে। বলে, 'দিনে জল রাতে তারা, তবে জানবা সুখের গোড়া।'

বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হতেই ব্যাঙের ডাকে নিশুতি রাত শব্দিত হয়ে উঠল। পাশাপাশি এক জায়গায় নিজের হাতে দুজনের বিছানা পাতল পঞ্চুর বউ। পঞ্চু বুঝল এই নতুন ঝালান সম্প্রীতি বউয়ের বাপের বাড়ী যাবার আনন্দের পূর্ব্বাভাস। আসন্ন বিরহ মুহূর্ত্তে নিতান্ত ছিটেফোঁটা দান। দরজা বন্ধ করে কেরোসিনের ডিবেটা ফু' দিয়ে নিভিয়ে বউ আস্তে আস্তে বিছানায় এসে বসল।

আজ যে বড় ফুরতি দেখছি? অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না, না হলে দেখতে পেত পঞ্চু বউয়ের চোখদুটি জলে টল টল করছে। বউকে নির্ব্বাক দেখে ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠল পঞ্চু। কারে দিয়ে খবরটা পাঠান হয়েল শুনি? আমারে বললে আমি কি থুয়ে আসতে পারতাম না?

আমি ত খবর পাঠাই নি। বউয়ের চোখদুটো শুকিয়ে উঠল। নে, নে। আর ন্যাকামো করতে হবে না। তুই কি করছিস্, না করছিস্ আমার জানতে বাকী নেই।

কি করলাম তোমার? মানুষে কি দু দিন বাপের বাড়ী যায় না? বাবা কি আমারে তোমাদের কাছে বেচে খেয়েছে নাকি? তোমার কাছে থেকে আমার কি সুখ? মুখে আঁচল গুঁজে উদ্যত কান্নার বেগটা সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল বউ।

আমার কাছে থেকে তোর সুখ নেই ? পঞ্চুর ভেতরের অভিমান পাঁচ বছরের ছেলের মত হাত পা ছুঁড়ে আছড়ে পড়ল।

কি সুখ দেচ্ছ তুমি নিজেই বুঝে দ্যাখ। পেরথম্ ফলটা পর্য্যন্ত তোমার জ্বালায় বাঁচল না। তুমি আবার মানুষ ?

তাত বলবিই রে। আমি কি আর মানুষ ? তা নইলে রাত বিরেতে ঘরের জানালায় মানুষ খুজে বেড়াস ?

এতবড় নির্লজ্জ অভিযোগে পঞ্চুর বউয়ের সমস্ত ধৈর্য্য হারিয়ে গেল। কি বললে ? ঘরের জানলায় লোক খুঁজে বেড়াই আমি ? আমি জানি তুমি ঐ কথাই বলবা। তা তুমি য্যাখন মনেব মানুষ খুঁজে পেয়েছ, আমারেও খুঁজে নিতে হবে। দুঃখে, অভিমানে ফুলতে ফুলতে বালিশটা মাটিতে আছড়ে ফেলে পঞ্চুর কাছ থেকে দূরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বউ।

অথচ একটু আগে কতই না সঙ্কল্প আঁটছিল পঞ্চু। বউকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলে নিজে সঙ্গে করে তার শ্বশুরশাশুড়ীর কাছে রেখে আসবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

পঞ্চুর বউকে দেখতে গিয়ে যেদিন লাঞ্ছিতা হয়ে ফিরে এল সাবি, দয়াবুড়ীর অনর্গল বকুনির একটাও তার কানে গেল না। দয়া তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সামনে বসে খাওয়াল। রাতটাও সেখানে থাকতে বলল কিন্তু বিকেল হতেই সাবি নিজের ঘরে ফিরে গেল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই শূন্য ঘরখানা দপ্ করে তার চোখে পড়ল, কিন্তু অন্য দিনের মত চোখে জল না এসে মাথাটা তার টন টন করে উঠল। একমাত্র সন্তানের বিয়োগযন্ত্রণার মহাশূন্যতার মধ্যে তার বাঁচবার, দাঁড়াবার, আশ্রয় করবার পৃথিবী আরও অনন্ত শূন্যতায় যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। স্বামী মারা যাবার পর তার বাপের সম্পত্তি ছিল। ধান, পান ছিল। প্রথম প্রথম তার উপস্বত্বে কিছুদিন চল্‌ল। তারপর জ্ঞাতিদের চক্রান্তে বাকী খাজানার দায়ে সে সবও যখন গেল, তখনও গহনাগাঁটি পেতল-কাঁসায় তার দিন কেটেছিল। সব যখন শেষ হয়ে এল, মেয়ের আশাভরসাও সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেল। বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে যখন দেখতে দেখতে তার নিজস্ব রক্তমাংসে গড়া সন্তান দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, কাঁন্নাকাটি, দাপাদাপি করে শেষ পর্য্যন্ত অর্দ্ধাহার আর রোগে একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ল, সাবির মাতৃমনের সমস্ত কোমল পর্দ্দাগুনোও আঘাত খেয়ে খেয়ে অসাড় হয়ে এল। সেই সঙ্গে সে নিজের খাওয়া পরা, জীবনধারণের চিন্তাটাকে যেন জোর করে গলা টিপে ধরে আর মাথা তুলতে দিল না।

এ কদিন দয়াবুড়ীর সাহচর্য্যে সে ভাল করে বুঝতেই পারেনি, মেয়ে মারা যাবার পরেও তার নিজস্ব খাওয়া পরা, বেঁচে থাকার সমস্যা বলে কিছু থাকতে পারে। কিন্তু যেদিন পঞ্চুর বউ তাকে মানুষ বলেও মানতে চাইল না, বিশেষ করে পঞ্চু পর্য্যন্ত এর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলতে পারল না, তখন তার আপনা হতেই যেন মনে হল, মানুষের কাছ থেকে হাত পেতে নেবার মত যোগ্যতা বলতেও আর তার কিছু অবশিষ্ট নেই। তা না হলে এই বয়সে সে বিধবাই বা হবে কেন, বাপমা-ই বা যাবে কেন, একটিমাত্র সন্তান এত দুর্গতি ভোগ করে মরবে কেন ?

হাঁ। শূন্যই বটে। অতবড় চারচালা ঘরখানার মধ্যে জিনিস বলতে আর এমন কিছু নেই, যার বদলে দুদিন তার খোরাক চলতে পারে। আচ্ছা, ভিটের জমিটুকু ত আছে। বিক্রী না করলেও কেউ ত বন্ধকও রাখতে পারে। হায়, হায়, এ কথাটা তার এতদিন মনে পড়েনি কেন ? তাহলে মেয়েটা হয়ত বাঁচত ! এতক্ষণ পরে ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল সাবি। ঘরের পেছনে তেঁতুল গাছটার আড়ালে সূর্য্য নেমে গেল। আষাঢ়ের বিলম্বিত বেলা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময় দয়া এসে তাকে ডেকে তুলল।

জানি। একলাডি থাকলে কেবল কেঁদে মরবি। আমারও ঐ রকম হয়েল রে, সে শত্তুরডা যখন গ্যাল। তখন দিনকাল ভাল ছেল। ছিরিধর তখন বেঁচে, তোর ঐ এশোর বাপ। কি রকম বাড়বাড়ন্ত তখন ছিরিধরের। চার চারটে খেটিয়ে বেটা, বউ, ঝি, নাতি-নাতকুড়ে বাড়ী ভরতি। বলল, 'দয়া, পুত্তুরশোকে রাবণরাজা ফোঁপরা হয়ে গিয়েল, তার মানুষ কি ছার। এখন কি আর দুঃখ্যু

ধান্দা করে খেতে পারবি ? আমার গোলার ধান আছে, আর আমার পুতবৌয়ের হাতে হেঁসেল আছে। যদ্দিন পারিস, এই ঠেঁয়ে ড়ুডো খাবি।'

যখন তোমার ক্যাব্‌লা মারা গেল, তখন তোমার বয়েস কত ছিল দিদিমা ? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

ছুঁড়ির কথা শোন। তা কি আর মোর মনে আছে ? যেবার আশ্বিনে ঝড় হয়েল, সেই বছরেই আমার ক্যাব্‌লা মারা যায়। তা ত্যাখন মোর বয়স আছে বৈকি ! শোকেতাপেই না বুড়ো হয়ে গিছি।

সত্যিই তখন দিনকাল ভাল ছিল দিদিমা। আজকাল হলে অনেক কথা হত।

আ মোর পোড়া কপাল ! কথা কি তেখুনি হয়নি ? মেয়েমান্‌ষের কাঁচা বয়সে সোয়ামী মরলে কথা ওঠবেই, তা সেকালেই হক আর একালেই হক। তবে নিজে ঠিক থাকলেই হল, নোকের কথায় কি বয়ে গেল ?

সবাই কি ঠিক থাকতে পারে দিদিমা ?

তা ত পারেই না। তা না হলে এই সাতখানা গাঁয়ের নোক আজ দয়াবাগদির নাম করে কেন ?

দয়ার চোখের ওপর চোখ রেখে কতকটা আবিষ্টভাবে বলল সাবি, তুমি সতীনক্ষ্মী দিদিমা। তোমারে টেনে কিছু বলছি নে। একটা কথা বলব। পঞ্চুদা কটা ট্যাকা দিয়ে গিছল মেয়েডারে ডাক্তার দেখাতে। এই বনের মধ্যে থাকি, তবুও সঙ্গে সঙ্গে নোকের চোখে পড়ে গেল। ঘেন্নায় সে ট্যাকা আর বাছার জন্যে খরচ করতে পারলাম না। তাই বলছিলাম, এত দুখ্যুঃকষ্ট করে ভাল থেকেও ত ভাল কিছু হল না। সব্বনাশ ত হলই, বদ্‌নামও ত বাদ যাচ্ছে না।

অন্ধকার তখন ঘোর হয়ে এসেছে। সাবির মুখখানা ভাল করে দেখতে পেল না দয়াবুড়ী। পেলে হয়ত বুঝতে পারত, শোক দুঃখের মামুলী তীব্রতা ছাড়াও কি একটা জিজ্ঞাসার যেন উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে সাবি।

দু'বছর সে মারা গিয়েছে। বাবা মারা গিয়েছে আজ ছ'বছর। কি বলব দিদিমা, এই ক'বছরেই কত জনা কত কথা বলল। কারুর কথা শুনিনি। তাই না আজ শুকিয়ে মরে গেলেও, কেউ এ পাড়া দিয়ে হাঁটে না। মেয়েডা যে এতটা কাল ধরে ভুগল, চলে গেল, এক তুমি আর পঞ্চুদা ছাড়া কেউ উঁকি মেরেও দেখেনি। কথা বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সাবি।

কেঁদে আর কি করবি বল? ভগমানকে ডাক। সেইজনাই সব ঠিক করে দেবে। আঁচল দিয়ে সাবির চোখ দুটো মুছিয়ে দিল দয়া।

আর কি আছে দিদিমা, যে ঠিক করে দেবে? সবই ত খেয়ে বসে আছি।

দয়ার বুকের ভেতরটা টন টন করে উঠল। সত্যই দুঃখী বটে মেয়েটা। দয়ার সেই অবস্থা হলেও, অনেকদিন স্বামীর ঘর করেছে সে। সে তুলনায় সাবি তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখী।

সেইজন্যেই ত তোর জন্যে পেরাণডা কেঁদে ওঠে সাবি। কি পাপ যে করিলি আর জর্‌মে, এ জর্‌মে কোন সুখ পেলি নে। ওমা! দেখছিস্? কথায় কথায় সব ভুলে গিছি। কখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। তোরে নিয়ে যাব বলেই এয়েলাম। তা চ। আমার ওঠানেই চ। যা হক দুডো মুখে দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিবিখুনি।

না দিদিমা। আজ আর আমি কোথায় যেতে পারব না। গাটা কেমন জ্বর জ্বর করছে। মাথাটা টিপ টিপ করছে। আমি একটু শোব।

ও কিছু নয়। মন খারাপ থাকলে ও রকম হয়। দয়া সাবির কপালে হাত দিয়ে দেখল। না। গা ভাল আছে।

না দিদিমা। সত্যিই আমার শরীল ভাল নেই। কাল যদি ভাল থাকি, যাব।

দয়া চলে গেলে ছেঁড়া কাঁথাখানা পেতে শুয়ে পড়ল সাবি। মেয়ে মারা যাবার পর একা ঘরে শোয়া অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। রাত তখনও বেশী হয়নি। চেষ্টা করেও ঠিক ঘুমুতে পারল না সাবি। মনে হল, মাথাটা যেন কামড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে বুকের ভেতর থেকে কাঁপুনি উঠছে। তবে কি জ্বর আসছে না কি? কাঁথাখানার অর্দ্ধেকটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা দিতে তার বেশ ভালই লাগল। ঝিম ঝিম করছে রাত। সমস্ত ভাবনা সরে গিয়ে মাথার মধ্যে একটা শূন্যতা ঝাঁ ঝাঁ করছে। গা, হাত, পাগুলো টান করতে বেশ আরাম মনে হয়। এমনি করেই সে শুয়ে থাকবে। আর যদি উঠতে না হয়, মন্দ হয় না। কিন্তু যদি বেশী জ্বর হয়, তা হলে কি করবে? একঘটি জল গড়িয়ে দেবারও ত লোক নেই। শরীর যদি আনচান করে, কে দেখবে তাকে? তাড়াতাড়ি মুখের ওপর থেকে কাঁথাখানা সরিয়ে ফেলল সাবি। কপালে হাত দিতেই মনে হল গরম নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাক মুখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

একভাবেই জ্বর চলল তিনদিন, কখন বাড়ে কখন কমে। জ্বরের ঘোরে দেখে পঞ্চুকে, অল্প জ্বরে দয়াকে। পেটে যা কিছু যায়, বার্লির জল, নয়ত সাবুর জল, সেটুকু দয়ার হাত দিয়েই আসে। সাবি বুঝল, দয়াই তাকে দেখাশুনা করে, পঞ্চু নয়। একদিন যাচাই করতে জিজ্ঞাসা করল দয়াকে। আচ্ছা দিদিমা। কত আর তুমি করবা বল ত? একলা মানুষ নিজের দুঃখ্যু ধান্দা আছে।

দয়া বলে, কি করব বল। তোর যে আর কেউ নেই সাবি। সেদিন বললাম, আমার ঘরে চ, তা গেলিনে, এখন কি করি বল ত? তাও ত জ্বর নরম পড়ছে না। উপ্‌রি হাওয়া-টাওয়া নয় ত? একবার মাণিকরে ডাকলে হত।

সাবি বুঝল তার ধারণাই সত্য। পঞ্চু আসে নি। অধিকন্তু পঞ্চুর নামটা যেন ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেল দয়া। রোজা হিসাবে পঞ্চুর নামডাক মাণিকের চেয়ে বেশী।

কাউকে ডাকতে হবে না দিদিমা, আমি এমনিই ভাল হয়ে উঠব। আমার কি আর মরণ আছে?

মরণের কথা ত নয় সাবি। মরণ মান্‌ষের একবারই হয়। ভোগান্তির জন্যেই বলছি। কেডা ভোগে বল্ ত? দয়া উঠে চলে গেল।

সাবি আরও বুঝল পঞ্চুকে না ডেকে মাণিককে ডাকার কথায় সে রাজী হয় নি বলেই হয়ত রাগ করে গেল দয়া। বিকেলের দিকে আরও দু একজন কে তাকে দেখে গেল। জ্বরটা বড্ড বেশী থাকায় ঠিক বুঝতে পারল না সাবি। কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙ্গে সে একেবারে অবাক হয়ে গেল। দয়া আবার এসেছে, পঞ্চুকে নিয়ে নয়, মাণিককে নিয়েও নয়, একেবারে গাঁয়ের সেরা ডাক্তার রমাপতি রায়কে সঙ্গে করে। সাবির কাপড়খানা টানাটানি করে গায় মাথায় যা হক করে জড়িয়ে দিল দয়া। একমাথা রুক্ষ চুল চোখমুখের ওপর থেকে সরিয়ে কোন রকমে খোঁপা করে জড়িয়ে দিল। ঘরের কোণ থেকে একখানা কাঠের পিঁড়ি এনে পেতে দিয়ে ডাক্তারকে বসতে বলল।

সাবির জ্বরে ঝলসান দেহটা ভয়ে শিউরে উঠল। ভূপতি মজুম-

দারের ডান হাত রমাপতি ডাক্তার। এ নিয়ে অনেক আলোচনা সে শুনেছে।

ভূমিকা পাড়ল দয়া ঠিক সময় বুঝে।

তোমার দয়ার শরীল ডাক্তার বাবু। গরীবের মা বাপ তোমরা। মেয়েডা বড্ড দুঃখী বাবু। মুখ চাইবার কেউ নেই পিরথিমে।

তুমি চুপ কর। সকাল থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশবার তোমার ঐ এক কাঁদুনি শুনছি। কেন, রাজু ডাক্তারের কাছে গেলে না কেন? আরও কিছু বলতে ইচ্ছা ছিল রমাপতির, কিন্তু রুগ্না হলেও রূপের অভাব ছিল না সাবির।

কতদিন জ্বর হয়েছে? সাবির বাঁ হাতের মণিবন্ধটা টিপে পরীক্ষা করতে লাগল রমাপতি।

দয়া বলল, জ্বর? তা অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। বলে না কাউরে।

আজ নিয়ে চার দিন, সাবি বলল।

মোটামুটি পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর করল রমাপতি। দয়ার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, দেখাশুনো কে করবে? তুমি?

মোর ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কি করব বল? বলে যত মড়া এই কঁ্যাঠাল গাছে জড়া।

তুমি পারবে কি না বল? বাজে বকবার আমার সময় নেই।

পারব না কি বলছ! মুই আবার কি না পারি! এখনও যা পারব, ধাড়ী ধাড়ী হাতীরা তাতে হিম সিম খেয়ে যাবে।

রমাপতি ভ্রুকুটি করে দয়াকে চুপ করতে বলল। বুঝেছি। আমার সঙ্গে চল, ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আমি ত দাম দিতে পারব না ডাক্তার বাবু। রমাপতি চলতে আরম্ভ করেছিল, সাবির কথায় ফিরে দাঁড়াল।

সেরে উঠে দিয়ো। ওষুধের দাম আমার বাকী থাকে। রমা-পতি দয়াকে যেতে বলে চলে গেল।

সাবি চেয়ে দেখল ডাক্তার আছে কি না। তারপর বলল, কেন তুমি আমরে জিগ্যেস্ না করে ডাক্তার ডাকতে গেলে দিদিমা? তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

কেন? দোষটা কি হয়েছে শুনি? ভুগে ভুগে মরবি, সেইডেই ভাল? দু শিশে ওষুধ খেলেই নরম পড়ে যাবে।

দু শিশেতে যদি না সারে, তখন দাম দেব কি করে?

য্যামন করে পারবি দিবি। হাত পা গতর রয়েছে কি জন্যে? আর বকিস্ নে দিনি। চুপ মেরে শুয়ে থাক।

সাবির তখন জ্বর বাড়ছিল। আপাদমস্তক কাঁথা মুড়ি দিয়ে সে উপস্থিত সমস্যাটা সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করল।

বিকেলের দিকে রমাপতি আবার এসে দেখল। সাবি বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। জ্বর দেখল ১০৬°। সকালের ওষুধ একদাগ মাত্র খালি হয়েছে। গায়ের কাঁথা সরে গেছে। কাপড় চোপড় ঠিক নেই। রমাপতির চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। কিন্তু বুকের ভেতরটায় যে আলোড়ন স্ুরু হল তাতে লোভাতুর মানুষের হিংস্র ক্ষুধা ছাড়া হয়ত আরও কিছু ছিল। চিকিৎসা করতে এই ক বছরে সে মানুষের যত রকমের অসহায় অন্তিম ছবি দেখেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী করুণ দেখাল এই মেয়েটিকে।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে এল রমাপতি।

সন্ধ্যা হতে তখনও একটু দেরী ছিল। দুতিনটে বাঁশ ঝাড় আর জঙ্গলে ভরতি ডোবার একটু পরেই তারা বাগদির শোবার ঘরগুনো তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে সে চিৎকার করে তারাকে

ডাকল। একটু পরেই প্রণাম করে দাঁড়াল তারার ছোট ভাই শ্যামা। রমাপতিকে সবাই ভয় করত। গ্রামের সেরা চিকিৎসক হিসাবেও বটে, ভূপতি মজুমদারের অনুগ্রহপুষ্ট হিসাবেও বটে।

দাদা কোথায় তোর? রমাপতি শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করল।

এখনও ভুঁই থেকে ফেরেনি।

তোর দাদার বউ কোথায়? উত্তর দিতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল শ্যামা।

তোর বউদিকে পাঠিয়ে দে। একটা মানুষ এখানে মরে যাচ্ছে, আর তোরা নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছিস।

কেডা মরে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু? শ্যামা জিজ্ঞাসা করল।

আমি। তোকে যা বললাম কর।

শ্যামা চলে যাবার চেষ্টা করতেই তাকে ডাকল রমাপতি।

বৌদিকে পাঠিয়ে দিয়ে, তুই দৌড়ে আমার ডাক্তারখানায় চলে যা। হাবুলকে বল, আমার ব্যাগটা নিয়ে যেন একখুনি ছুটে আসে। বুঝলি?

হেসে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল শ্যামা। এবারে এসে প্রণাম করে দাঁড়াল—শ্যামার দাদা তারা।

ডাক্তারবাবু ডেকেছেন আমারে? কেন? সাবির অসুখ বলে? বলতে বলতে সাবির ঘরের দাওয়ায় উঠে ঘরের ভেতরটা একবার উঁকি মেরে দেখে নিল তারা।

রমাপতি বলল, তোমার বউকে একবার পাঠিয়ে দিতে পার তারা? নয়ত, দয়াবুড়ীকে খবর দিতে পার?

দুপাটি দাঁত বের করে হেসে বলল তারা, আমার বৌয়ের চারদিন জ্বর, একেবারে শয্যাগত। তারে কেডা দেখে তার ঠিকানা নেই।

আপনিই দেখুন না ডাক্তারবাবু। ডাক্তারের কাছে আবার নজ্জা কি? প্রাজ্ঞব্যক্তির মত উপদেশ দিল তারা।

লজ্জা ডাক্তারের থাকে না, রুগীরও সব সময় না থাকতে পারে। তবে তোমাদের একটু লজ্জা থাকা উচিত। এবারও হাসল তারা, তবে সমস্ত দাঁতগুলো আর বেরুল না।

আপনি রাগ করছেন ডাক্তারবাবু, নইলে অমন্দ কথা আমি কিছু বলিনি।

না, না। আমিই কি তা বলছি। শুধু তোমাকে একটু তারিফ করছিলাম যে, মিথ্যে কথাটা কেমন বেমালুম বলে যেতে পার। রমাপতির মুখে হাসি দেখা দিল।

মিথ্যে কথা! কি যে বলেন ডাক্তারবাবু। তারা হাত কচলাতে লাগল।

না, না। মিথ্যে কি তুমি বল? তবে না কি তোমার বউয়ের বড্ড অসুখ বলছিলে, একেবারে শয্যাগত। তা অসুখ শরীরেই বোধ হয় ভিজে কাপড়ে জল আনছিল তোমার বউ, একটু আগেই যেন দেখলাম।

সাবি জল চাইতেই রমাপতি ঘরে চলে গেল।

তারাও পা টিপে টিপে পেছনে এসে দাঁড়াল।

কেডা পঞ্চুদা? কখন এলে? তখনও গায়ের কাপড় ভাল করে সামলাতে পারে নি সাবি।

রমাপতি বলল, পঞ্চু নয়, আমি। জল খাবে? রক্তবর্ণ চোখ দুটো বিস্ফারিত করে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল সাবি। সঙ্গে সঙ্গে কাঁথাখানা টেনে নিয়ে মাথা থেকে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ফেলল।

জল খাবে? ডাক্তার আবার জিজ্ঞাসা করল।

বড্ড তেষ্টা ডাক্তারবাবু, একটু জল দিন। চাতকের মত বেদনাহত কণ্ঠে মিনতি জানাল সাবি।

ঘরের কোণে কাৎ করা একটা মাটির কলসি দেখিয়ে তারাকে বলল রমাপতি ; তারা ! দেখত ঐ কলসিতে জল আছে কি না ? থাকে ত ঐ গেলাসটায় একটু গড়াও।

তারা জল এনে ডাক্তারের হাতে দিল। গ্লাসটা হাতে নিয়ে দোরের কাছে এগিয়ে গেল রমাপতি। উদ্দেশ্য জলটা ভাল করে পরীক্ষা করা।

ইস্ ! এ যে পোকা বিজবিজ করছে ! একটানে গ্লাসের জলটা বাইরে ফেলে দিল রমাপতি।

এখানে কোথায় একটু ভাল জল পাওয়া যায় না তারা ? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল।

কেন যাবে না ডাক্তারবাবু, আমি জল এনে দিচ্ছি।

তারা চলে গেল। রমাপতি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু জল দিলেন না ডাক্তার বাবু ?

বনজঙ্গলের ছায়াচ্ছন্ন প্রায়ান্ধকার চালাঘর। হঠাৎ রমাপতির চোখে পড়ল, বুকে হেঁটে সাবি জলের কলসিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ও কি করছ ? তারা জল আনতে গেছে। একখুনি এল বলে।

এতগুলো কথার একটাও বোধ হয় সাবির কানে গেল না। রমাপতি বুঝল দুর্দ্দান্ত জ্বরের ঘোরে পিপাসা ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই সাবির। তাড়াতাড়ি সাবিকে ধরে বিছানায় এনে শুইয়ে দেবে, তারা জল নিয়ে ঘরে এল। তখনও সাবির অসাড় হাত দু'খানা রমাপতির গলায় জড়িয়ে আছে।

সাবির জ্বর ছাড়ল। তবুও রমাপতি রোজ আসে, দেখে যায়। শেষে তাকে সাবি একদিন বারণ করল। আমি ভাল হয়ে গিছি ডাক্তারবাবু। আর আপনার কষ্ট করে আসতে হবে না।

রমাপতি হাসল, কিন্তু কথাগুনো বলল গম্ভীরভাবে। আসবার যখন আর দরকার হবে না, আমি নিজেই আসব না। কিন্তু তুমি বোধ হয় অন্য কিছু ভাবছ সাবিত্রী, কেমন নয় কি?

সাবির মাথাটা বুকের ওপর নেমে এল। তবুও রোগশীর্ণ মুখে যে বর্ণাভা ফুটে উঠল, রমাপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটা ধরা পড়ে গেল।

আমি ডাক্তার, পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসা করি। অর্দ্ধেক লোক ওষুধ খেয়ে দাম দেয়, অর্দ্ধেক লোক দেয় না। তবুও আমি হাতের রুগী ছাড়ি না। এতেও রাজু ডাক্তারের চেয়ে আমি ঢের বেশী রোজগার করি। রমাপতির কথায় দম্ভ থাকলেও তার কৈফিয়তের সুরটা তার নিজের কানেই তেমন ভাল শোনাল না। সুন্দরী যুবতী হলেও, নীচজাতের ঘরের অশিক্ষিতা মেয়ে সাবি।

আপনি আমার যা উব্‌গার করেছেন, আপনারে অন্য কিছু মনে করলে আমার নরকেও জায়গা হবে না। সাবির সংযত উচ্ছ্বাসে রমাপতি চমকে উঠল। নীচজাতের মেয়ের মত ত ঠিক কথা বলে না সাবি।

তবে ও কথা বলছিলে কেন? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল। সাবির চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

রাজু ডাক্তারের কথা যখন জানেন, তখন আমার কথাও আপনার জানতে বাকী নেই। সেই কথা মনে পড়লে বড্ড দুঃখ্যু হয় ডাক্তারবাবু, যে আপনার মতন লোক থাকতেও মেয়েটা আমার বিনে চিকিচ্ছেয় মরে গেল।

কি করব বল। তুমি ত আমাকে খবর দাও নি। তোমার মেয়ে বাঁচত কিনা বলতে পারি নে, তবে বাঁচাবার চেষ্টা হত।

রমাপতি আরও কিছু বলত, কিন্তু সাবিকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখে আস্তে আস্তে উঠে গেল।

একটু পরেই কোন অনির্দ্দেশ্য দুষ্কৃতিকারীর চোর্দ্দপুরুষ নরকস্থ করতে করতে সাবির উঠানে এসে দাঁড়াল দয়া।

যমের অরুচি। বলে শগুনের চোখ গোভাগাড়ে। যত সব অলপ্পেয়ে ড্যাক্‌রা। খেজুরতলায় যাবি কবে?

কারে কি বলছ দিদিমা? সাবি জিজ্ঞাসা করল। সাবির জিজ্ঞাসায় আরও জ্বলে উঠল বুড়ী।

আর তোর ছুঁড়িরও য্যামন মরণ নেই। তাই নিজেও মরবি আর আমারেও মারবি। দাওয়ায় উঠে ধপ্ করে বসে পড়ল দয়াবুড়ী। সাবি জানত দয়াকে তাগিদ দিয়ে কোন লাভ নেই। দম দেওয়া লাট্টুর মত নিজের মনের খেয়ালে সে শেষ পর্য্যন্ত বকে যাবে।

আর তোরেও বলি সাবি। তোরও একটু ঢলানি আছে বাপু। তা নইলে এত কথাই বা তোরে নিয়ে ওঠে কেন বল্‌ত?

এইবার সাবি আর চুপ করে থাকতে পারল না।

আমায় নিয়ে কি কোন কথা উঠেছে দিদিমা? বলতে বলতে সাবির চোখ দুটো জলে ছাপিয়ে উঠল? তুমি ত জান, আর ভগমানও জানে, আমি ত কোন দোষ করিনি। সঙ্গে সঙ্গে কথার সুর ঘুরে গেল দয়াবুড়ীর।

তাই জানি বলেই ত বলছি। মুখপোড়ারা কি খেয়েদেয়ে কাম পায় না গা? মিছিমিছি ভাল মানুষের নামে দোষ দিলে ও মুখ

খসে যাবে, খসে যাবে, খসে যাবে এই পেরাতঃবাক্যিতে বলছি, তুই দেখিস্।

কেডা কি বলল দিদিমা ?

বলুক্‌গে। ও সব পাপ কথায় মোদের কি দরকার ? মোরা দুঃখী, গরীব মানুষ। পেরাণে অত সখও নেই, ও সব রসের কথা শুনতে ভালও নাগে না। আপন মনে মাথার উকুন চুলবুতে লাগল দয়াবুড়ী।

সাবি বলল, জ্বর ত আর হয় না দিদিমা। তবুও শরীল সারছে না কেন ? সারলে তোমার কাজটাজগুনো কিছু করে দিতে পারি।

হ্যাঁ। তোরে বলব কি রে সাবি। মুই আসছেলাম ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেন্‌সিল থেকে। বলি যদি ওষুধটষুধ কিছু ছ্যায়, মেয়েডা গায় বল পাচ্ছে না। ঐ এশো পোড়ারমুখো বলে কি জানিস্ ? বলে, কি গো দয়া দিদি, ডাক্তার কি দেল তোমারে ? বললাম, দেবে আবার কি ? এই এতডা বয়েস হল কাউর কাছে ত হাত পেতে কিছু নেই নি। তবে থাকত যদি তোর বাপ ছিরিধর, সে সব নোক ছেল আলাদা। তখন বলে কি জানিস্ ? বলে, 'না, সে কথা নয়, পাঁচজনা পাঁচকথা বলছে, তাই তোমারে জিগ্যেস্ করছি।' তখন ছটপট করে ধরলাম। পাঁচজনা কি বলছে, বল ? বলে, 'ডাক্তার কি আর সাধে যাচ্ছে সাবিরে ছ্যাখতে ? ঘর থেকে ওষুধ দেচ্ছে ! মধু পেয়েছে, তাই দেচ্ছে।' মুই বললাম একথা কেডা রটাচ্ছে রে এশো ? ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করিস, বুঝে সমঝে কথা বলবি। বলে, 'শাপ মন্যি দিয়ো না দিদি। মোরা হচ্ছি ভিন্‌পাড়ার নোক। তারই ঘরের পাশের নোক নিজের চোখে দেখেছে, ডাক্তারের গলা জইড়ে ধরে সোহাগ করছে সাবি।' অনেক করে জিগ্যেস্ করলাম,

ঘরের পাশের কেডা, কেডা দেখেছে চোখের মাথা খেয়ে ? এতটা অসুখ গেল, কোন বেটাবিটি একবার উঁকি মারল না ! তা কিছুতেই নাম করল না।

সাবির মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। ঘরের পাশের লোক ? কে সে ? মনু ? শ্যামা ? না তারাদা ? নিজের চোখে দেখেছে ডাক্তারের গলা জড়িয়ে ধরেছে সে ! ভাবতে লাগল সাবি। প্রকৃতপক্ষে জ্বরের সময়কার সব কথা তার মনেই নেই। রমাপতি তাকে বাঁচিয়েছে। ওযুধ দিয়েছে। এখনও দেখে যাচ্ছে। কিন্তু কেন ? কি তার স্বার্থ ? কতদিন হয়ত একলা এসেছে। একলা ঘরে, তবে কি ......

টলতে টলতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল সাবি।

কি লো ? শুলি যে ? শরীল খারাপ করছে ?

হাঁ দিদিমা। আর আমি বসতে পচ্ছি নে।

তোর জন্যে এই মুড়ি এনেলাম। জুড়ো খাবি ? বেশ গরম আছে। মচমচে।

আমার খিদে নেই দিদিমা।

তবে এই ঠোঙ্গাশুদ্ধু ঘরে থোলাম। খিদে পেলে খাস। দয়া চলে গেল।

সাবির মনে হল তার আবার জ্বর আসছে। ঘাড় থেকে মাথা পর্য্যন্ত টনটন করে খসে পড়ছে। কুড়ি একুশ বছরের জীবনটা, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এপর্য্যন্ত সমস্তটা একসঙ্গে ঘুলিয়ে উঠে তার মনটাকে একেবারে বিস্বাদ করে তুলল। উচ্চবর্ণের আদর্শ উজ্জ্বল জীবনধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার চেষ্টা করে এখানকার প্রত্যে-কটি প্রাণী। নিম্নকোটি হলেও রামায়ণ মহাভারতের মাপকাঠি নিয়ে নাড়াচড়া করে এরাও। এ আদর্শনিষ্ঠা তাদের সমষ্টিমনের

স্বয়ংপ্রসূত ব্যাপার। সাবির মনে হল, তার নিজস্ব বলতে, ভাল বলতে যা কিছু ছিল, উপর্য্যুপরি ভাগ্যবিপর্য্যয়ে যার কিছুই নষ্ট হয় নি এতদিন, সে সমস্তই যেন কোন দেবতার অভিশাপে একেবারে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

হঠাৎ সে ধড়মড় করে উঠে বসল। ভাঙ্গা জানালার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে, এ সমস্ত মিথ্যা কথা। কেউ জোর করে রটিয়েছে। যতই অঘোর অচৈতন্য হক, মরে ত সে যায় নি। তা ছাড়া ভদ্রলোক, লেখাপড়া জানা ডাক্তার। কত রোগী দেখে, এ রকম খারাপ স্বভাব হলে কি লোকে তাকে ডাকত? না, না। তা হতেই পারে না। এ নিশ্চয়ই কেউ রটিয়েছে।

এই ভাবেই অবশিষ্ট দিনটা কাটল। পরের দিনও সমস্ত বেলাটা কেটে গেল। দয়াবুড়ী তখনও এল না। দয়ার আনা মুড়িকটা ত সকালেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তন্ন তন্ন করে ঘরের তাক, কুলুঙ্গীগুলো খুঁজে দেখল সাবি। কোন রকমের খাবার বলতে কিছু নেই। দয়াদিদিমার কি হল? মেয়ে মারা যাবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত দয়া তাকে খাইয়ে এসেছে। রমাপতি তার যতই করুক, দয়া না থাকলে এতবড় রোগটায় সে কিছুতেই বাঁচতে পারত না। দয়া যদি আর না আসে, শেষ পর্য্যন্ত তাকে না খেয়েই মরতে হবে। শরীরে এমন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই, যার জোরে সে কারুর বাড়ী থেকে কিছু চেয়ে আনবে।

চারদিকে চেয়ে দেখল সাবি—উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি বনশিউলির ঝোপে ভরে উঠেছে। কেমন একটা বুনো বুনো তীব্র কটু গন্ধে পড়ন্ত বেলার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ছ আনি দুলেদের সারি

সারি পড়ো ভিটে। পাঁচ ভাই ছিল তার বাপের। ছেলেবেলায় তিন কাকাকে সে দেখেছে। ছেলেতে মেয়েতে বাড়ীগুনো ভরতি। মহাকালের অদৃশ্য হাত তখনও তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয় নি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিন কাকাই যখন গেল, প্রহ্লাদ গামছার খুঁটে চোখ মুছে বলেছিল, সাবির এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে 'ছ আনি বংশের পিদ্দিমের তেল ফুরিয়েছে, আর বেশীদিন নয়।' সে কথা মনে পড়লে আজও তার বুক শুকিয়ে ওঠে। বড় হয়ে পর্য্যন্ত অনেকদিন রাতে সে ঘরের বাইরে আসতে পারে নি।

পাশাপাশি পড়ো বাড়ীগুনোর ভাঙ্গা চালের আড়ায় কারা যেন পা ঝুলিয়ে বসে আছে। বাড়ীর পেছনে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার ওপর হুতুম পেঁচা ডাকত। হাঁড়ির ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রাত যেন। ধ্বংসাবশিষ্ট পাড়াটার চারপাশে যেন কালপুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাতৃহারা ছোট মেয়ে সাবি, বাপের বুকের কাছে আরও সরে গিয়ে শুত।

দয়ার গলার স্বর পাওয়া গেল, সাবির ঘরের ঠিক পিছন দিক থেকে। ওলো, ও সাবি! কেমন আছিস লো ছুঁড়ি। বড্ডা দেরী হয়ে গ্যাল। কি করব বল? আসতে কি দ্যায়? মাঝারি গোছের একটা পিতলের গামলায় নতুন একখানা গামছা চাপা দিয়ে উঠিপড়ি হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সাবির দাওয়ায় এসে কোমর থেকে গামলাখানা নামিয়ে রেখে তার পাশে বসে পড়ল দয়াবুড়ী এবং সাবি জিজ্ঞাসা করবার আগেই আদ্যন্ত পরিচয় পাড়তে আরম্ভ করল।

সকাল থেকে তিনবার বলে গেল হেলা চৈকিদার, ডাক্তারবাবু অতি অবিশ্যি করে একবার যেতে বলেছে। রামহরি বোষ্টমের বোয়ের তখনও একধামা চিঁড়ের ধান দোভাবা করে পড়ে। জুইড়ে

থুয়ে কি করে যাই। তাড়াতাড়ি পাড় দিয়ে কাঁড়ি করে থোলাম। বললাম, তুই নেড়ে নে বৌ, মুই ঝক্ করে এ্যালাম বলে। গিয়ে বললাম, কেন ডেকেছ গো বাবু, হাতের কাজ সেরে আসতে বুকে খিল ধরে গিয়েছে। এই যাই বলা, সে কি যত্ন, আয়িত্বি। অতিবড় আপনার জনও অমন পারে না। বলে তুমি তাড়াতাড়ি মাথায় জল দিয়ে ন্যাও। বেলা আর নেই। যাহক্ তুড়ো মুখে দিয়ে খানিকটে জিরোও। খেইয়ে দেইয়ে এই এতক্ষণে ছাড়ল। সাবির মুখের দিকে চেয়ে গামলার ঢাকা খুলে জিনিসগুনো তার চোখের সামনে মেলে ধরল-দয়া।

তোর জন্যে কত সামিগ্যিরী দিয়েছে ছ্যাখ্। বল্লে শুধু ওষুধ দিলে ত হবে না, পত্যিও ত চাই। একা তুমি গরীব মানুষ, কত জোগাবা।

খিদেয় তখন বত্রিশ নাড়ীতে টান ধরেছে সাবির—রোগোত্তর বুভূক্ষু দৃষ্টির সামনে অনেক কিছু উপকরণ, আঙ্গুর, বেদানা, নেবু, মিছরি আরও কত কি। তবুও রমাপতি ডাক্তারের এই ক'দিনের ব্যবহারের নাটকীয়তায় সে আনন্দ করবে, কি ডাক ছেড়ে কাঁদবে ঠিক করে উঠতে পারল না। শেষ পর্য্যন্ত সে কেঁদেই ফেলল, ডাক ছেড়ে না হলেও নিঃশব্দে।

আমার বড্ড খিদে পেয়েছে দিদিমা। তুটো ভাত কি মুড়ি যাহক কিছু আনতে পারলে না?

দয়া গলা ছেড়ে হেসে উঠল। বলে তোর খাবার জন্যেই না এত? কত জিনিস রয়েছে খা না।

সাবির বলতে ইচ্ছা হল, সমস্ত তার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু পারল না। আমরা ভাতের ক্যাঙ্গাল দিদিমা, ও সব আমাদের ভাল নাগে না।

ভাল লাগে না ? দয়া চমকে উঠে সাবির মুখের দিকে চাইল।

না। মাথা হেঁট করে উত্তর দিল সাবি।

দুর্দ্দান্ত ক্ষিপ্ত ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলে যে ভাবে থমকে দাঁড়ায়, দয়ায় ঠিক সেই অবস্থা হল। নিজস্ব পরোপকার প্রবৃত্তির সঙ্গে ডাক্তারের আচরণ ঠিক ঠিক মিলে যাওয়ায়, সে সমস্ত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সোজা বলেই ভেবে আসছিল। সাবির প্রত্যাখ্যানটা যেন হঠাৎ চোখে আঙ্গুল দিয়ে সেই একই জিনিসের বিপরীত অর্থটা তাকে দেখিয়ে দিল।

তুই কি অন্য কিছু ভাবছিস সাবি? সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল দয়া।

তবুও ঠিক সোজা উত্তরটা দিতে পারল না সাবি। অত্যন্ত সংযতভাবে বলল, এতে কথা হবে দিদিমা, এ সব না নেওয়াই ভাল।

কথা কি হতে বাকী আছে না কি? কিন্তু তা হলে ত বিনি ওষুধে তোকে মরে যেতে হত সাবি ?

সাবিকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলতে লাগল দয়া। মুই বলি কি, কেডা কি বলবে মনে করে নিজের মহাপেরাণীকে কষ্ট না দেওয়াই ভাল। তাছাড়া, যে জনা তোরে বেঁচিয়ে তোলল, তার কথাডা অমান্যি করবি ছোটনোকেরা কথা বলবে বলে ?

দয়াবুড়ীর কথাবার্ত্তায় সন্দেহের নামগন্ধ ছিল না। সাবির মনটাও যেন একটু সহজ হয়ে উঠল। খাবারগুনো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে যথাস্থানে সেগুনো নামিয়ে রাখল।

এসব ত ওষুধের মতন খেতে হয় দিদিমা। খিদের মুখে এতে কি হবে বল ত ? ছোট্ট মেয়ের মত ঠোঁট ফুলিয়ে বলল সাবি।

আ রে পোড়াকপালি ! তবে দাঁড়া। তুড়ো ভিজে ভাত থুয়েলাম, নিয়ে আসছি। দয়া চলে গেল।

এইবার খাবার জিনিসগুলো ভাল করে দেখতে লাগল সাবি। অপরিসীম খিদের তাড়নায় একডেলা মিছরি গালে ফেলে দিল। মিছরিটা চিবিয়ে খেয়ে জল আনতে যাবে, এমন সময় যেন ভূত দেখে চমকে উঠল। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রমাপতি একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাবির মুখ তখনও প্রায় ভরতি। সামনে ছোট বড় ঠোঙ্গাগুলো খোলা পড়ে রয়েছে। রমাপতির মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল।

সাবি কোন কথা না বলে ঘরের ভেতর চলে গেল। কিছুক্ষণ ধরে তার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে রমাপতির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

কি গো সাবিত্রী। বাইরে দাঁড়িয়ে আছি যে। কিন্তু সাবি বাইরে এল না, কোন সাড়াও দিল না।

তোমার কি শরীর খারাপ করছে ? রমাপতির জুতোর শব্দ সাবির ঘরের দোরের কাছে স্পষ্টতর শোনাল।

আপনি একটু দাঁড়ান ডাক্তারবাবু, আমি যাচ্ছি। এতক্ষণে সাবি উত্তর দিল।

তবু ভাল। আমি মনে করলাম মাথা ঘুরে পড়ে গেছ হয়ত। এখনও তোমার ওঠাবসা না করাই ভাল। তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি চললাম। এই পাড়ায় একটা রুগী আছে কি না। তাই আসতে হয়েছিল। ভাবলাম একবার দেখে যাই।

রমাপতি চলে যাবে ঠিক সেই সময় কলাইকরা সানকিতে ভাত নিয়ে দয়াবুড়ী সাবির বাড়ী এসে হাজির হল।

ও কেডা? হ্যাদ্ ছ্যাখ। ডাক্তারবাবু কখন এলেন? বলেই ভাতের পাত্রটা আঁচলে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করল দয়াবুড়ী।

এই আসছি। ভাত কার জন্যে আনলে?

ভাত! এই ইয়ে, কি বলে······

কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। তবে যদি তুমি দরদ করে এনে থাক, আমি বলছি ওগুলো ঐ আঁস্তাকুড়ে ঢেলে দাও। আর যদি কেউ খাবে বলে বায়না করে থাকে, তাকে বোল, আবার যদি অসুখ বাড়ে, সে যেন আমার কাছে না গিয়ে রাজু ডাক্তারের কাছে যায়। কাউকে বিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে গট্ গট্ করে চলে গেল রমাপতি।

দয়া খানিকটা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সূক্ষ্ম একটা অপরাধ বোধ তার সত্তর বছরের রক্তের ভেতর সিরসির করে উঠল। রমাপতি যে রাগ করে চলে গেল, তার জন্য না হলেও, তাকেই কেন্দ্র করে অল্পবয়সী এই দুটি নরনারীর ভেতর কি রকমের একটা মান অভিমানের অভিনব সুর বেজে উঠল, যেটা তার এতটা বয়সের অভিজ্ঞতাকে হঠাৎ যেন গ্লানির বাষ্পে ভরিয়ে তুলল। সাবি ঘর থেকে বাইরে এল।

ভাতকডা মুই ফিইরে নিয়ে চললাম সাবি। বুড়ো মেরে খুনের দায়ে পড়তে পারব না বাপু। মোদের জ্বর হয়। জ্বরগায়েই পান্তভাত, তেঁতুল গোলা সব গিলি। তোদের বাপু তুষুক পেরাণ, ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যাস্। তোদের কথা আলাদা।

বল, বল দিদিমা, যত পার বল তোমরা। যে যত পার বল। হারে আমার কপাল! সজোরে নিজের কপালে আঘাত করল সাবি। সমস্ত শরীরটা তখন তার থর থর করে কাঁপছে। দয়া বুঝল, অতি

দুর্ব্বল দেহটা নিয়ে সাবি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল, ডাক্তারের দেওয়া খাবারগুনো পেয়েও সে শুধু দুটো ভাতের জন্য এখনও পর্য্যন্ত শুকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সাবিকে ধরতেই সে দয়ার বুকের ভেতর মাথা গুঁজে একেবারে এলিয়ে পড়ল।

৩

চন্দরের কথাই শেষ পর্য্যন্ত সত্য হল। আষাঢ়ের প্রারম্ভেই বর্ষা নামল পূর্ণ উদ্যমে। বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে ত, পূর্ব্ব পশ্চিম যে কোন দিক থেকে পাহাড়ের মত মেঘ জমে সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ স্নুরু হয়ে যায়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির তোড়ে ঝাপসা কুয়াসার মত চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে ওঠে।

দেশোর সঙ্গে বউকে পাঠিয়ে দিয়ে পঞ্চু দিনকতক আর কোনখানে বেরুল না। চন্দর মাঝে মাঝে জন খেটে আসে। বর্ষার জন্য সবদিন পূরো কাজ করতে পারে না। বাপকে পেলেই গল্প করতে বসে পঞ্চু। দিনে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে যখনই ফাঁক পায়। কিন্তু একভাবে বেশীক্ষণ বসতে পারে না। বাপের মামুলি গল্পে বিশেষ কিছু উপাদানও আর সে খুঁজে পায় না। একদিন চন্দরকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু। আচ্ছা বাবা! জল পেয়ে পিরথিম ঠাণ্ডা হল! ভূপতি মজুমদার, অভয় মোড়ল এরাও কি সব ঠাণ্ডা মেরে গেল? চন্দর বলল, ঠাণ্ডা মারে যদি ত ভগমানের দয়া বলতে হবে। তবে তা কি আর হবে? বিকেল থেকেই সেদিন আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছিল। সন্ধ্যা হতে না হতেই দাওয়ার ঝাঁপগুনো ভাল করে বেঁধে দিয়ে পঞ্চুর মা কতকগুনো শুকন কাঁঠাল বিচির খোসা ছাড়াচ্ছিল। পঞ্চুর মা বলল, ট্যাকার গরম কি আর জলে ঠাণ্ডা হয়? বাধা দিয়ে বলল চন্দর,

ট্যাকার গরম না হাতী? ও হল রীতের দোষ! পঞ্চু বলল, তার জন্যে বলছি নে। মারামারি কাটাকাটি থানা পুলিশ সব একেবারে জুড়িয়ে গেল।

চন্দর বলল, জুইড়ে গেল আবার চাগাড় মারতে কতক্ষণ? ও কি থামে? তবে আর বলছি কি? পঞ্চপাণ্ডবকে বনে পেঠিয়ে দিয়েও দুর্য্যোধন তেনাদের পেছনে ফিংয়ের মত নেগে ছিল। পুড়িয়ে মারতে জতুগৃহ তৈরী করিয়েল। ভরাবর্ষার সজল আমেজে মাঝে মাঝে হুঁকো থেকে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল চন্দর।

পঞ্চুর মা বলল, মারামারি কাটাকাটি করতে হয়, নিজেদের মধ্যে করলেই হয়। গরীবের ঘাড়ে পড়া কেন বাপু? বউডোরে পেঠিয়ে দিয়ে বেঁচিছি! ট্যাকা থাকলেই রীত খারাপ হয়। সেইজন্যেই বলছেলাম, ট্যকার গরম।

ও কথা কেন বলছিস মা? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

কি জানি বাপু? ষাঁড়গুনোর জ্বালায় নোক কি স্বস্তিতে বউ ঝি নিয়ে ঘর করতে পারে? চন্দর ও পঞ্চু দুজনেই পঞ্চুর মায়ের মুখের দিকে চাইল। এইবার চন্দরকে শুনিয়ে স্পষ্ট করে বলতে লাগল পঞ্চুর মা, তোমরা ত এলোহাড়ার মতন তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে এনে বউরে দেখালে। নেহাৎ আমি ছেলাম, তাই আর হাত বাড়াতে পারল না। এই সাবিডার দুদিন অসুখ করেল। দুদিন দেখে আর দু শিশে ওষুধ খেইয়ে একেবারে মাথা কিনে নিয়েছে রামডাক্তার। গতরে খেটে দেনা শোধ করাবে বলে নিজের বাড়ীতে গিয়ে ঝিগিরী করতে বলছে। ঐ নোকের বাড়ী গিয়ে ওঠলে কি আর ওর জাতজর্ম্ম কিছু থাকবে? চন্দর বউকে ধমক দিল। ওসব কথায় তোর কি দরকার? যে যা ভাল বোঝবে, করবে।

পঞ্চুর কিন্তু মায়ের কথা শুনে সমস্ত শরীর দিয়ে একটা জ্বালা উঠে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সাবির অসুখ করেল? কবে? চোখদুটো বড় বড় করে মাকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু।

তা এই হয়েল দিনকতক আগে। ভাসাভাসা উত্তর দিল পঞ্চুর মা।

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখল পঞ্চু। মেঘ, বৃষ্টি, অন্ধকার যেন তাকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সাবি কি কাজ করছে না কি ডাক্তারের বাড়ীতে? পঞ্চু আবার জিজ্ঞাসা করল।

কি জানি বাপু, করছে কি না? পঞ্চুর মা বলল। করে করুক, না করে না করুক, ও সব মেয়েপাঁচালীর কথায় বেটাছেলের কি দরকার? চন্দর বিরক্তি জানাল।

পঞ্চু সে কথা কানেই তুলল না। কতকটা আত্মগতভাবে বলল, একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় যাবে ঝিবিত্তি করতে। গুম্ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল সে। এমন কি তার পর থেকে খাওয়ার সময় পর্য্যন্ত একটা কথাও বলল না।

পঞ্চু ঘরে দোর দিয়ে শুয়ে পড়তে, হুঁকোটা নামিয়ে রেখে বউয়ের পাশে শুয়ে পড়ল চন্দর। জলের ছাট আর বেঙের ডাকে বাইরের কথা ঘরে যায় না। চন্দর বলল, বুড়ো হয়ে মরতে চললি এখনও বুদ্ধি হল না।

কেন, কি করলাম তোমার?

কেন ও সব কথা পঞ্চারে শোনাতে গেলি? সাবির নাম শুনলে গোড়ার মুখ দিয়ে নাল গড়ায়। আমার ছেলে যে কি করে এত মাগীমুখো হল বলতে পারি নে। পঞ্চুর মা একটু রসিকতার লোভ সামলাতে পারল না। তোমার ছেলে ত বটে। তুমিই বা কম

যাও কিসে ? ও কথা আর বলতে হয় না। এ গাঁয়ের কোন মাউই বলতে পারবে না চন্দর ভুলে কখন কাউর মুখ পানে তেকিয়েছে।

আচ্ছা, ন্যাও। খুব বাহাদুর তুমি। এখন চুপ মেরে ঘুমোও দিনি। পঞ্চুর মার চোখে ঘুম জড়িয়ে ধরছিল।

চন্দরের পুরাতন ব্যাধি আবার দেখা দিল। তুই যে বললি ডাক্তার এখেনে কুমতলব নিয়ে এয়েল, তুই কি করে জানলি? তোরে কিছু বলেল বুঝি ?

পঞ্চুর মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আ মরে যাই! বুড়ো হয়ে মরতে চলেছেন, কি বুদ্ধিই না হয়েছে। আর কিছু বলল না পঞ্চুর মা।

অগত্যা চন্দর আবার জিজ্ঞাসা করল, কই বললি নে ?

কি বলতে হবে ?

চন্দর চুপ করল। কিন্তু কথাটা পরিষ্কার করা দূরে থাক, পঞ্চুর মা নিশ্চিন্ত মনে বোধ হয় ঘুমের চেষ্টাই করতে লাগল।

নিরুপায় চন্দর আপন মনেই বলতে লাগল, দু দিন মোটে ডাক্তার এয়েল, তাও মোদের সুমুখে। কসেন থেকে যে কথা পাস্ তোরাই জানিস। বলে বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি। পঞ্চুর মা ঘুমিয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে থেমে গেল চন্দর।

পঞ্চু ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমুতে পারল না। বউ চলে যাবার পর থেকে সে মনে মনে সঙ্কল্প আঁটছিল কি করে মন্ত্রৌষধি বশীভূত সাপের মত স্ত্রীরত্নটীকে তার পাশে এনে ফেলবে। তার বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আর কোনদিন বাপের বাড়ী যাবার নামও করবে না। যুবতী নারীর এই অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের আশায়, ভরাবর্ষার জল আর স্নিগ্ধ জলো হাওয়া, রাতভোর বেঙের ডাক আর ঝুপ ঝাপ জলের শব্দে তার কল্পনা ময়ূরের মত পেখম তুলে নেচে

বেড়াত আর সে নিজে আফিমখোরের মত সেই নেশায় ক্রমশঃ বিভোর হয়ে একসময় কখন ঘুমিয়ে পড়ত।

একটু আগেও পঞ্চু ভাবতে পারে নি, নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের জন্য এতখানি ক্ষুধা, এতটা উদ্বেগ তার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। সাবি কাজ করছে রমাপতি ডাক্তারের বাড়ী? ভূপতি মজুমদার খেয়ালী লম্পট। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী ধূর্ত্ত রমাপতি ডাক্তার। একবার তার হাতে পড়লে আর কিছু থাকবে সাবির?

বৃষ্টি থেমে গেছে। চারদিক নিশুতি। গাছপালা থেকে তখনও থেকে থেকে জল ঝরে পড়ছে। আস্তে আস্তে ঘরের দোর খুলে বাইরে এল পঞ্চু। একহাঁটু জলকাদা ভেঙ্গে দয়াবুড়ীর চালাঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। দোরের ওপর হাত বুলিয়ে দেখল, বাইরে থেকে শিকলের ওপর তালা ঝুলছে। মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দোরের সামনে সে বসে রইল। তারপর উঠে সোজা এগিয়ে চলল রাত্রিচর শ্বাপদের মত, দুর্গাপুরের ছ-আনি দুলেদের পাড়ায়। আস্‌সেওড়া আর বনকচুর ঝোপ মাড়িয়ে সোজা সাবির ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল পঞ্চু। কিন্তু তার সন্দেহ হল সাবি হয়ত ঘরে নেই। এই দুর্য্যোগে কি রমাপতির বাড়ী থেকে ফিরেছে? দোরের কাছে এগিয়ে আসতেই ঘরের ভেতর থেকে গভীর নাকডাকার শব্দ তার কানে এল। কিন্তু ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। এত লাঠিবাজি নয়, যে গলাবাজি করে নিজের পরিচয় দেবে? রমাপতির ঘরের বন্ধ দরজাও নয়, যে লাথি মেরে ভেঙ্গে ঘরে ঢুকবে। অথচ না ডেকেই বা করে কি? সাবির সম্বন্ধে শোনা কথাটা ভাল করে যাচাই না করে সে

যায় কি করে? অগত্যা দোরের শিকলটা সে বার দুই নেড়ে দিল। তারপর আরও দুবার। তবুও কোন সাড়া এল না, কিন্তু নাকডাকার শব্দটা থেমে গেল। এইবার পঞ্চু সাবির নাম ধরে ডাকল। সাবি। ও সাবি। ঘরে আছিস্?

ডাকের মোলায়েম সুরেই হক বা যে জন্যই হক, ঘরের ভেতর থেকে নিঃশঙ্ক প্রশ্ন এল, কেডা রে? কোন ঘাটে পড়া, ওলাউঠো মরতে এয়েছে রাত দুকুরে?

কে? দিদিমা? দুয়োরটা খোল না একবার।

তুই কোন নবারের বেটা রে, যে রাত দুকুরে দুয়োর খুলতে হবে? দূর হ। দূর হ। এটে বেশ্যে বাড়ী নয়।

কিন্তু দয়ার কথা শেষ হতে না হতেই সাবির পরিষ্কার কথাগুলো পঞ্চুর কানে যেন মধু ঢেলে দিল। ও কি বলছ দিদিমা? পঞ্চুদা এয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর আলো জ্বলে উঠল ও একটু পরেই দোরটাও খুলে গেল। শুধু তাই নয়, বিহ্বল পঞ্চু ও ততোধিক বিস্মিতা সাবির চোখের সামনে এক হাতে কাঁথা বালিশ জড়িয়ে ধরে, আর এক হাতে প্রচুর ধূমউদ্গারী কেরোসিনের ডিবে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সাবির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দয়া। পঞ্চু কি একটা বলল, কিন্তু দয়া কোন উত্তর দিল না।

একি সর্ব্বনাশ করলে পঞ্চুদা? অন্ধকার ঘরের মধ্যে ডুকরে কেঁদে উঠল সাবি। কিন্তু আলো জ্বেলে পঞ্চুর মুখের দিকে চাইতেই বুঝতে পারল লাঞ্ছনার চিহ্ন সেখানেও বড় কম পড়ে নি।

দিদিমা বোধ হয় খারাপ ভেবে চলে গেল, না রে সাবি? পঞ্চু বলল।

না, খুব ভাল মনে করে চলে গেল। তা বেশ হয়েছে। এখন আমায় গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে। সাবির স্পষ্ট অভিযোগে পঞ্চুর চোখে জল এসে পড়ল। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, তা কেন মরতে হবে? তুই দুয়োরটা বন্ধ করে নে। আমি এখ্খুনি বুড়ীরে সব বুঝিয়ে বলছি। তোর কোন ভয় নেই।

আর ধাষ্টামো বাড়িয়ে কাজ নেই। ঢের হয়েছে। এখন কি বলতে এয়েছ বল। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে এস।

এইবার সাবির মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল পঞ্চু। চোয়ালের হাড় দুখানা ঠেলে ওঠায় বড় বড় চোখদুটো বসে গেছে। হাড় পাঁজরা জিরজির করছে। এতটা সুশ্রী সাবির রূপ বলতে আর কিছু নেই। পঞ্চু ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। তোর একি চেহারা হয়েছে রে সাবি? বড্ড কাহিল হয়ে গিছিস একেবারে।

সামান্য একটু হাসল সাবি। তারপর বলল, এ আর কি দেখছ পঞ্চুদা? ঐ বুড়ী না থাকলে এতদিন হয়ত এই হাড়কখানা ফেলতে আবার তোমার ডাক পড়ত। তা যাক। বলা নেই, কওয়া নেই, রাতদুকুরে কি মনে করে বলত?

বলছি। কিন্তু সত্যি করে বল্‌ত, দয়াবুড়ী ছাড়া কি আর কোন গতি নেই তোর? ততক্ষণে পঞ্চু একটু সামলে নিয়েছে।

সেটা কি তুমি নিজেই জান না? গাঁয়ের কোন নোকটারে তুমি না চেন বলত? এখন আর ও কথা বলে কোন নাভ নেই। যা হবার হয়ে গিয়েছে। নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল সাবি।

চুলোয় যাক বুড়ী। আসে আসবে, না আসে না আসবে। কি ভেবে কথাটা বলল পঞ্চু ঠিক বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল সাবি। আবার বলল পঞ্চু। উব্‌গার যা করেছেন

জানতে আর বাকী নেই। পাড়ায় ত কান পাতবার যো নেই। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না সাবি, কিছুতেই হতে দেব না।

কি বলছ পঞ্চুদা? আমি বুঝতে পারছি নে। পঞ্চু বলতে লাগল, তা নইলে কি শুধু শুধু এত রাত্তিরে তোর বাড়ী ছুটে এইছি? কেন? দুলে-বলে কি আমরা মানুষ নই? তাই বাগে পেয়ে আমাদের ঘরের ঝি বউদের নিয়ে বাবুরা মজা মারবেন? এ কি মগের মুলুক না কি? ঘরের মেঝের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল পঞ্চু। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না সাবি। পঞ্চুর অনুমান অকাট্য না হলেও, রমাপতির গায়ে পড়া ব্যবহারগুনোর ঠিক মানে সে খুঁজে পায় না। সাবি বলল, শোন পঞ্চুদা। ডাক্তারকে না ডাকলে হয়ত এবার আমি বাঁচতাম না। তবুও আমার তাকে ডাকবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এতে ত কথা ওঠবার কিছু নেই। তোমার বৌয়ের অসুখেও ত সে দেখেছিল। কই, তাতে ত কোন কথা হয় নি?

কে বলেছে তোরে কথা হয় নি? তুই জানিস কিছু? কিন্তু কি বলে তুই রাজী হলি সাবি?

রাজী হলাম? কিসে রাজী হলাম?

তার বাড়ী কাজ করতে।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সাবি। তোমরা কি জ্যান্ত মাছে পোকা পাড়াও পঞ্চুদা। আমি ত কই কিছু জানি নে। কেডা বলেছে এ কথা?

সাবির এতখানি অভিযোগে পঞ্চু কিন্তু একটুও দমল না।

জানিস নে, আর দুদিন পরে জানবি। নইলে ঘর বয়ে তোরে দেখে গেছে, ওষুধ দিয়েছে, অত দয়ার শরীল ওদের নয় রে। ওরা

একটা উব্‌গার করলে সাতপুরুষ ধরে খিজমৎ খেটে ওদের দেনা মেটে না। আর তুই অত সহজে পার পাবি ভেবেছিস্? সে উঠে দাঁড়াল, বোধ হয় চলে যেতে। যাবার আগে বলল, আমারে নিয়ে অনেক কথা ওঠবে। কিন্তু মনে জানিস, তোর ভালর জন্যেই আমি এয়েলাম আর দয়াবুড়ী ছাড়া আপনজন এ গাঁয়ে তোর আছে। বুঝলি ?

পঞ্চু চলে যায় দেখে সাবি তার কাপড় ধরে টানল। দোহাই পঞ্চুদা। তুমি রাগ করে যেয়ো না। তুমি রাগ করে থাকলে আমার আর গতি নেই। তোমার দুটি পায় পড়ছি। সাবি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। পঞ্চুর মান, অভিমান, লজ্জা, ভয় এককালে সরে গিয়ে তার ভেতরকার খাঁটি স্বরূপটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আমি রাগ করে থাকব না, তোর ভয় নেই। তোর জন্যে আমি পারি নে কি ? তুই নির্ভয়ে থাক। যে যা বলে বলুক। কারুর দোরে তোরে যেতে হবে না। তুই দুয়োর বন্ধ কর, আমি চললাম। আর একটু দ্যাঁড়াও। সাবি পঞ্চুকে বাধা দিল।

আবার কি বলবি ?

হয় দয়া দিদিমার বাড়ীতে আমায় থুয়ে এস নয়ত তারে ডেকে দ্যাও।

কেন ? এই ত বললি, তারে ডেকে আর ধাষ্টামো করে কাজ নেই। কেন ? একলা থাকতে পারবি নে ?

একলা ? এ্যাদ্দিন ত একলা ছেলাম। মরা মেয়ে বুকে করেও রাত কাটিইছি। কিন্তু আর সে সাহস হয় না। পঞ্চু বুঝল, সাবির ভয় নিতান্ত মিছে নয়।

আচ্ছা চল, দেখি বুড়ী কি বলে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক ডাকাডাকি করেও যখন দয়া দোর খুলল না,

এমন কি একটা সাড়াও দিল না, দুজনেরই তখন বুঝতে বাকী রইল না, সাবির শেষ আশ্রয়টুকুও চলে গেছে।

দীন দুঃখী হলেও সাবির বংশগৌরবের মূল শিকড়টা অনেকদূর পর্য্যন্ত হয়ত বিস্তৃত ছিল। তাই দয়াবুড়ীর অবহেলা সহ্য করেও তার অকলঙ্ক স্বভাবেব কাছেই সে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ণা দিয়ে পড়ল। দিদিমা গো। তুমি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ কর না। পঞ্চুদা, তুমি বাড়ী যাও। আমি এই দোর গোড়াতেই পড়ে থাকব।

না সাবি, তা হবে না। তোরে আমি এভাবে ফেলে থুয়ে যেতে পারব না। সাবির হাত ধরে তাকে টেনে তুলল পঞ্চু। তারপর জোর গলায় বোধ হয় দয়াকে শুনিয়েই বলল, আমারও ঘর দুয়োর আছে, বাপ মা আছে, সেখানে তোর একটু জায়গা হবে। আর ভাববার সময় নেই সাবি, চল।

একরকম জোর করেই নিজের বাড়ীতে সাবিকে নিয়ে চলল পঞ্চু।

৪

পঞ্চু আর সাবি যখন পঞ্চুর বাড়ী এসে পৌঁছুল, আষাঢ়ের স্বল্প-মেয়াদী রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাল করে ভেবে দেখবার মত মনের সহজ অবস্থা না থাকলেও সাবি অন্ততঃ রাতটুকুর মত পঞ্চুর ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল। দয়া যে তাকে এ ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে, এটা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু শুধু পরের খেয়ালের ওপর নির্ভর করে অনাত্মীয়ের আশ্রয়ে এসে দাঁড়ান যে কি জিনিস, সেটা বেশ ভাল করেই বুঝল সাবি চন্দোরের বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে। নিজে কোন কথা বলা দূরের কথা, পঞ্চু পর্য্যন্ত যখন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, ডেকে বাপ মায়ের ঘুম ভাঙ্গাতে

পর্য্যন্ত সাহস করল না, সাবির মনে হল, যা হয় হবে, সে নিজের বাড়ীতেই ফিরে যাবে। কিন্তু সাবির ভাগ্যনিয়ন্তার হয়ত তাকে নিয়ে একটু কৌতুক করবার সখ ছিল। তাই নিজেরা উপযাচক হয়ে পরিচয় পাড়বার আগেই চন্দর জেগে উঠল।

ওঠানে দেঁড়িয়ে কেডা র‍্যা ?

পঞ্চুর মায়েরও শেষরাতের পাৎলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু চন্দেরের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির ওপর তার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল না বলেই হয়ত ধমকে উঠল।

কেডা আবার দ্যাড়াবে। শুয়ে শুয়ে ভূত ভ্যাখছ না কি ?

কিন্তু ভূত যখন সত্য সত্যই পঞ্চুর গলায় সাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তুজনেই তখন বিছানা থেকে উঠে বসল।

ফিকে অন্ধকারের সঙ্গে ক্লান্তবর্ষণ মেঘের ছায়া তখনও জমাট হয়ে ছিল। চন্দরের ঘোলাটে চোখে তুটো মানুষের চেহারা ঠিক ধরা পড়ল না। পঞ্চুর মা বলল, কেডা ? পঞ্চা ? কি হয়েছে ? ওঠানে দেঁড়িয়ে কেন ? দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাতেও পঞ্চু উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পেল না। সঙ্গে ও কেডা ? এ জিজ্ঞাসাটাও পঞ্চুর মায়ের!

আমি সাবি, খুড়ী, বড্ড বিপদে পড়ে তামাদের বাড়ী এইছি।

কেডা, সাবি ? তোর আবার কি বিপদ হল রাত্ত তুকুরে ? চন্দরের জিজ্ঞাসায় আর যাই থাক, প্রসন্নতা ছিল না। পঞ্চুর অবস্থাসঙ্কট বেশ জটিল হয়ে উঠল। বাপকে যে কোনদিন ভয় করে নি, এক কথার বদলে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে, আজ সেই বাপকেই তার বাঘের মত ভয়াবহ মনে হল। চন্দর কি বিজবিজ করে বলল ঠিক বোঝা না গেলেও, তার মনের ভাবটা বুঝতে কারুর বাকী থাকল না।

পঞ্চুর মা কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারল না। ব্যাপারটা যাই হক না কেন, এভাবে চুপ করে থাকলে কোন কিছুই বোঝা যাবে না। তা দেঁড়িয়ে রইলি কেন? ইদিকে আয়। পা ধুবি ত ধো। বার-কলসিতে জল আছে। দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে লম্প জ্বালল পঞ্চুর মা। আহা হা ওঠানে বসছিস্ কেন মা? নজ্জা কিসের? আয়, পা ধুয়ে আয়। সাবিকে হাত ধরে পা ধুইয়ে আনল পঞ্চুর মা।

সঙ্কটের প্রথম পর্য্যায়টা যে এত সহজে কেটে যেতে পারে, একথা যদি একটু আগে গাঁয়ের জাগ্রত দেবতা—বাবা বুড়ো শিব, সাবি আর পঞ্চুর সামনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে জানিয়ে দিতেন, তা হলেও কেউ বিশ্বাস করত না। পঞ্চু তাড়াতাড়ি পা দুটো ধুয়ে ফেলে সটান ঘরের ভেতর চলে গেল।

চন্দেরের এ সব কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না। সন্ধ্যা রাত্রের আলোচনার পরিণতি যে রাতারাতি এই ভাবে এসে দাঁড়াবে, বলা নেই, কওয়া নেই, ভরযুবতী পরের ঘরের বিধবা মেয়েটাকে গাঁ শুদ্ধ লোকের চোখের ওপর নিজের ঘরে এনে তুলতে পারে পঞ্চু, তার ছেলে হয়ে, চোখে দেখেও এত বড় অসম্ভব ব্যাপারটা তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। ইদানিং পঞ্চু আর সাবিকে সন্দেহ করত চন্দর। সেই সঙ্গে আরও বুঝতে পারত এই জন্যই নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক বনিয়ে চলতে পারছে না পঞ্চু।

পরিচয় দিতে গিয়ে যত না কথা বলল সাবি, চোখের জল ফেলল তার চেয়ে অনেক বেশী। নির্ভাঁজ দুঃখের পরিচয়। আর সেই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল স্ত্রীজাতিসিদ্ধ আত্মসম্মান বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা। বলা বাহুল্য কথা হচ্ছিল সাবি আর পঞ্চুর মার মধ্যে। শেষ পর্য্যন্ত চন্দর আর চুপ করে থাকতে পারল না।

সবই ত বোঝলাম সাবি। কিন্তু এখেনেই বা তোরে রক্ষে করবে কেডা? নিজেও মরবি, আমাদেরও মারবি। পঞ্চুর মার আর সহ্য হল না। বলল, সব কথা ভাল করে না শুনে কথা কও কেন বলত?

চন্দর আরও রেগে গেল। কথা বলি কি সাধ করে? তোদের রীত দেখে বলতে হয়। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠ্যাকল, অমন অনেক ছ্যাখলাম। সোমত্ত ব্যাওয়া বিধবা ঘরে পুরে থুয়ে তার ম্যাও সামলান কি চাড্ডিখানি কথা না কি?

তা হলে রাতটা পোয়াক, তারপর না হয় গলায় হাত দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিয়োখুনি। রাতটায় আর ভেড়িয়ো না। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেলেও ওর নিজেকে রক্ষে করবার ক্ষ্যামতা নেই। চোখের মাথা খেয়েছ, না? ওর শরীলডার দিকে তাকিয়ে ছ্যাখ দিনি, কি আছে ওতে? থাকলই বা ছুদিন, একটু সেরেসুরে যা হয় করবেখন।

চন্দরেরও যে দয়ামায়া ছিল না এমন নয়। তবে পঞ্চুকে সে সাধারণ ছুলের ছেলের মতন কোনদিনই ভাবে নি। তাই তার ছেলে হয়ে সে পরের মেয়েকে নিয়ে চলাচলি করবে, হয়ত বউ থাকতেই নিকে করে ঘরে তুলবে, নয়ত আলাদা ঘর বেঁধে দিয়ে প্রকাশ্যেই তাকে নিয়ে বাস করবে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এরকম বহু অনাচারের স্মৃতি একাঙ্গী হয়ে মিশে আছে বলেই সাবির দুঃখের প্রকৃত রূপটা তার চোখে পড়ে নি।

চেয়ে দেখল চন্দর, সাবি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েছে। অত্যন্ত শীর্ণ চেহারা, তার ওপর ততোধিক জীর্ণ কাপড়, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়ার ওপর গেরো বাঁধা, চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। তারই অপরিসর বিস্তারের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাবির বুক

পিঠের পাঁজরাগুনো একটার পর একটা। রুক্ষ চুলগুনো মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। চন্দর নরম হয়ে এল।

না, না। সে কথা কেন বলব? বলছেলাম কি, দয়ারে যে ঘেটিয়ে এল পঞ্চা, কাল সকালে আর পাড়ায় কেউ কান পাততে পারবে? ওরে ত আমি চিনি। লোকের উব্‌গার করতেও য্যামন, আবার পেছনে নাগতেও তেম্‌নি। বয়েসডা যে তোর খারাপ সাবি, তা নইলে আর কথাডা কি বল?

কথাটা যে কি সাবি এতদিন ভেবেও ঠিক করতে পারে নি।

আমিও ত তাই বলছিলাম চন্দর কাকা, দয়াদিদিমারে তোমরা একটু বুঝিয়ে বল।

এইবার ঘরের ভেতর থেকে কথা বলল পঞ্চু, হ্যাঁ, বুঝিয়ে বল, রমাপতি ডাক্তারের কাছে ঘুষ খেয়ে যেন তোরে তার ঘরে তুলে ছ্যায়। জানতে আর কিছু বাকী নেই। ভারী উবগারী মাউই রে!

ছিঃ, পঞ্চুদা, কারে কি বলছ তুমি? দয়াবুড়ীরে এ দেশটার লোক কেডা না চেনে? ঘর থেকে বাইরে এল পঞ্চু।

দেশের লোক চিন্নুক আর না চিন্নুক, তুই তারে এখনও চিনিস নি সাবি। নইলে আমারে তোর বাড়ীতে দেখলে সে জ্বলে মরে, কই, ডাক্তারকে ত সে রকম ভাবে না? নিজের জাতের লোককে সে বিশ্বেস করে না, আর বড় লোকের বেলা চোখ বুজিয়ে থাকে, এ যে কোনদিশী সতীগিরী, সেই জানে আর তুই জানিস। ইচ্ছে হয়, তুই বাড়ী চলে যা। আমারে কযে গালমন্দ করলে সে আবার তোর কাছে যাবে। তারপরে যদি কিছু হয়, মাথা খুঁড়ে মরলেও এ শম্মারাম আর যাচ্ছে না।

তাই হবে পঞ্চুদা। কাল সকালেই আমি চলে যাব। আমারে

দেখতে হবে না কাউর। আমি যেমন করে পারি চালাব। কত দুঃখে যে কথাটা বলল সাবি, পঞ্চু বা চন্দর দুজনের একজনও ঠিক বুঝল না।

পঞ্চুর মা শেষ পর্য্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। পঞ্চা, তুই চুপ কর। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি যখন রইছি, গতরে খেটে খাচ্ছি, খাওয়াচ্ছি, ওর দুডো পেটের ভাত আমি দিতে পারব। সাবি আমার পাশে এসে শুয়ে পড় ত মা। পঞ্চা, তুই শুগে যা। সাবিকে নিজের কাছে টেনে নিল পঞ্চুর মা।

আজ সারাটা রাত সাবিকে নিয়ে লোফালুফি করেছে তার অদৃষ্ট। পঞ্চু আর দয়ার শুভেচ্ছার ধাক্কায় তার শরীর মন একেবারে অসাড় হয়ে পড়েছিল। পঞ্চুর মার বলিষ্ঠ আশ্বাস পেয়ে তার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সাবি।

পঞ্চুর মা বলল, তুই চুপ কর সাবি। যদি আমার পেটের মেয়ের ঐ রকম কপাল পুড়ত, তারে কি ভেসিয়ে দিতে পারতাম? শুনে সাবি ত দূরের কথা, পঞ্চুর পর্য্যন্ত চোখদুটো জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেই পঞ্চুর মনে হল, ভাবনা, চিন্তা, লজ্জা, গ্লানি বলতে আর কিছুই কোনখানে খুঁজে পাচ্ছে না। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গল পঞ্চুর সাবির ডাকে।

পঞ্চুদা ওঠ। কি ঘুম গো তোমার? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি নড়াই কর না কি?

কদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ নতুন রোদ উঠেছে সকালে। চন্দর কাজে বেরিয়েছে, পঞ্চুর মা রোজই বেরয়। পঞ্চুর মায়ের একখানা সাড়ি পরেছে সাবি।

দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।

তুমি একটু বাইরে যাও পঞ্চুদা, আমি ঘরটা একটু পরিষ্কার করি।

ও থাক, তোর শরীল অসুখ, তুই পারবি নে!

দেখি পারি কি না। মা গো! কি ঘরদোরের ছিরি! তোমার বউ কি নোংরা পঞ্চুদা? ঘরখানা একটু গুছিয়ে থুয়েও যায় নি!

বউয়ের ঘাড়ে অপবাদটা পড়লেও, আসলে এর জন্য দায়ী

সাবি বলতে লাগল, খুড়ী বুড়োমানুষ; তার ওপর সাতবাড়ীর কাজ। ইদিকে তোমাদের ভাতজল আছে। একলা মানুষ আর কত পারবে? হাঁড়ি, কলসি, ছেঁড়া চেটাই, তুলোবেরুন বালিশ, তামাকের গুল, কয়লা, ছাই চারিদিকে ছড়ান। চালের আড়া থেকে একখানা মাছধরা জাল লম্বা করে টাঙ্গান। আঁসটে গন্ধ আসছে তার থেকে। মাছধরা ঘুনী দু তিনটি ওপর ওপর সাজান রয়েছে এক কোণে। একদিকে আছে কতকগুনো বাঁশের কাঠি সরু সরু করে চাঁচা, পাশেই একবোঝা চেঁচাড়ি পড়ে রয়েছে। পঞ্চু বাইরে চলে গেল। আধঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে যা দেখল, তাতে সে নিজের চোখকেই ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। যতদূর সম্ভব পরিপাটি করে ঘরটা সাজিয়েছে সাবি। এত আবর্জ্জনা যে এভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে তার মত অগোছাল লোকের চোখেও এত ভাল দেখাতে পারে, আজ এই প্রথম বুঝল পঞ্চু।

এ তুই করেছিস কি সাবি? সপ্রশংস দৃষ্টিতে সাবির দিকে চাইল পঞ্চু।

কি আবার করলাম?

ফোঁস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল পঞ্চু।

ঘরের ভেতরের ময়লাগুলো ঝাঁট দিয়ে একসঙ্গে জড় করে একটা ঝুড়িতে তুলতে তুলতে বলল সাবি। বউ কবে আসছে পঞ্চুদা? দাঁড়াও, দাঁড়াও, কি চাই তোমার? তামাক? আমি সেজে দিচ্ছি। অনেক কষ্টে ঘরটা গুছুলাম, এক্‌খুনি নোংরা কর না। এ রকমের নিষেধ বউয়ের মুখে কখন শোনে নি পঞ্চু। দাওয়ার উপর উবু হয়ে বসে সে সাবির তামাক সাজা দেখতে লাগল। ভাবতে লাগল, নিজের ঘর বাড়ী ছেড়ে এসে একদিনের মধ্যে পরের ঘর দোর নিজের করে নিল কি করে সাবি?

কই বললে না? কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল সাবি।

কি?

বউকে কবে আনছ? সাবির রক্তশূন্য মুখখানা হয়ত আগুনের আঁচ পেয়ে একটু লাল দেখাল।

মনে করছি, আর আনব না। হাত বাড়িয়ে কলকেটা নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তামাক টানতে লাগল পঞ্চু।

কেন বৈরিগী হবে না কি? মুখ টিপে হেসে নিজের কাজ করতে লাগল সাবি।

বউকে আর আনবে না বলে একটু রসিকতা করবার লোভ ছিল পঞ্চুর। কিন্তু বিয়ে করা বউকে ত্যাগ করবার ছদ্মসঙ্কল্পে বিস্মিত হওয়া দূরের কথা, সাবি যখন হেসে পাল্টা রসিকতা করে বসল, পঞ্চুর মন থেকে হাসি কৌতুকের হাল্কা ভাবটা আপনা হতেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

ও বাড়ী একবার যাবি নে সাবি? সবই ত সেখানে পড়ে রইল।

যা রইল আমি গেলেও রক্ষে হবে না। ভাঙ্গা চালটা এ বর্ষায় আপনিই পচে নেবে যাবে।

তা হলেও একটু খুঁচিখাঁচা দিয়ে এ সনটা খাড়া রাখতে হবে ত ?

খুঁচি দিলে শুধু খড় নষ্ট হবে। একখানা ব্যাখারিও আস্ত নেই, সব পেড়ে ছাওয়া কি সোজা কথা ?

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসল পঞ্চু। তা হলে ত একবার দেখতে হয়। বরষার জল পেয়ে দেওয়াল গুনোও থাকবে না।

এখন কি তুমি দেখতে চললে না কি ? সাবি জিজ্ঞাসা করল। হাঁ, একবার দেখে আসি। তোদের ভাগের বাঁশঝাড় নেই সাবি ?

আছে, তবে ভাগ আছে কি না বলতে পারি নে। কিন্তু তোমার হল কি বলত পঞ্চুদা ? এত বেলায় উঠে না খেয়ে ঘর দেখতে বেরুচ্ছ ?

আমি এখন খাব না সাবি। রাত্তিরে ঘুম হয় নি, পেটটা ঠোষ মেরে রয়েছে। আমার ভাতকডা তুই খেয়ে নে।

সাবি একটু হাসল। তুমি আমায় বিদেয় করতে পারলে বাঁচ না পঞ্চুদা ?

পঞ্চু একটু লজ্জা পেল, জিজ্ঞাসা করল, এ কথা কেন বলছিস সাবি ?

তা না হলে নিজের বাড়া ভাত পরের মুখে তুলে দিচ্ছ ?

সাবির কথায় পঞ্চুর বুকের ভেতরটা চমকে উঠল। সাবিকে সে জোর করেই নিজের বাড়ীতে এনেছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছার মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার চেয়ে হঠকারিতার ঝোঁক যে কতখানি ছিল, সেটা সে বুঝতে পারল সাবি যখন দ্বিধাশূন্য মনে পরের আশ্রয় স্বীকার করে নিল। সাবিকে সে ভালবাসত, কিন্তু সে ভালবাসার আর এমন শক্তি ছিল না যার জোরে বিবাহিত জীবনের পর্ব্বতপ্রমাণ বিরুদ্ধতা কাটিয়ে সে তাকে সহজভাবে নিজের বাড়ীতে পাকা আশ্রয় দিতে

পারে। সাবিকে সে রক্ষা করতে চায়। চায় তাকে অযথা অপমান আর কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু তা বলে নিজের সুখশান্তি ত নষ্ট করতে চায় না। তা হলেও এত সহজে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গাও চলে না। নিজের বাড়ীতে জায়গা দেবে বলেই না সে তাকে দয়ার কাছ থেকে জোর করে টেনে এনেছে।

বিবর্ণ মুখেই বলল পঞ্চু, না, না, তা কেন? সত্যিই আমার খিদে নেই।

কেন মিছে কথা বলছ পঞ্চুদা? তোমোর খিদের খবর কি আমি জানি নে মনে কর? রায়বাবুদের বাড়ী দুগ্যোপূজোর ভরপেট নেমন্তন্ন খেয়ে এসে বাজী রেখে তুমি একসের চিঁড়ে আর এক হাঁড়ি দই খেয়েছিলে।

পঞ্চুর মনে পড়ল কথাটা। তর্কটা হয়েছিল সাবির স্বামী গনেশের সঙ্গে সাবির বাড়ীতে বসে। বিগত দিনের কথাগুলোর মধ্যে কিছুক্ষণ যেন ডুবে রইল পঞ্চু। তারপর—

হেসে বলল পঞ্চু, সে হল গিয়ে জেদের কথা।

হাঁ আর এটাও হচ্চে গিয়ে জেদের কথা। জান ত আমার জেদ খুব বেশী।

তোর সঙ্গে পারবার যো নেই। তা দে, কি দিবি ছাই।

দাওয়ার ওপর জল ছিটিয়ে কাঠের পিঁড়ি পেতে জায়গা করল সাবি। তারপর পঞ্চুকে বসতে বলে, কাঁসার একটা বড় জামবাটিতে পান্ত ভাত, গোটাকতক লঙ্কা আর খানিকটা নুন এনে তার সামনে নামিয়ে দিল। পঞ্চুকে খেতে দিয়ে তার সামনে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল সাবি। অশক্ত শরীরে অনেকটা পরিশ্রম করে সে হাঁপিয়ে পড়েছিল।

কি রে? অমন করে রইলি কেন? ও সাবি! ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু।

ও কিছু নয়, তুমি খাও। চোখ বুজিয়েই বলল সাবি।

ভিরমি টিরমি যাবি নাকি বাপু? কেন তুই সকালে উঠে অত খাটতে গেলি? খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়বার উপক্রম করল পঞ্চু।

উঠো না। ভয় কি? কোনরকমে নিজেকে শক্ত করে পঞ্চুর ডান হাতখানা চেপে ধরল সাবি।

যে রকম তুই চোখ কপালে তুলে ঘাড় নটকে পড়লি, দেখে কার না ভয় হয় বল?

খুব বীরপুরুষ তুমি, এখন খেয়ে ন্যাও দিনি। তোমার সামনে শরীল খারাপ হলেও শোবার বসবার যো নেই, বেশ যা হক।

বা রে! কখন আমি তোরে শুতে বসতে মানা করলাম? পঞ্চুর মুখখানা অপ্রতিভ দেখাল।

মানা করবে কেন? একটুখানি চোখ বুজিইছি ত কচি ছেলের মত আঁৎকে উঠলে। সত্যি ভিরমি গেলে কি করতে? দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে ত?

আর কোন কথা না বলে ঘাড় গুঁজে খেতে লাগল পঞ্চু। রহস্যের ছলেও পৌরুষের অমর্য্যাদা সে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু যদি একটিবারও চোখ তুলে চাইত, তা হলে দেখতে পেত সাবির চোখ দুটো জলে টল টল করছে।

বর্ষার জল পেয়ে নদীনালা, মাঠঘাট ছাপিয়ে উঠল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ঘুলিয়ে উঠল দুর্গাপুর আর কৌতুকপুরের অবস্থা।

মেঘের আসরেই আরও জমাট আসর বসল রমাপতির ডাক্তারখানায়। রুগীপত্তরের ভীড় কম। দোকানের বেচা-কেনা নেই বললেই চলে। দু একজন নামজাদা দোকানদার, নিত্যই প্রায় রমাপতির অনুরক্ত সহচর, ফতুয়ার পকেটে বিড়ির বাণ্ডিল নিয়ে বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বসল।

দু একটা ধোঁয়া টোঁয়া ছাড় না হে ডাক্তার।

ঐ যে ঐ কৌটোয় বিড়ি রয়েছে খাও। টেবিলের ওপর একটা কৌটা দেখিয়ে দিল রমাপতি।

কালর ওপর শাদা কাপড়মারা ছাতাটা মুড়ে ঝাঁপ তুলে ঘরে ঢুকল হেলা। বাবু আসছেন।

কে মজুমদারবাবু? কই? রমাপতি নড়েচড়ে উঠল।

আগাগোড়া বর্ষাতি ঢাকা একটি মূর্ত্তি অন্ধকার থেকে ঘরের ভেতর এল।

কি বিষ্টি রে বাবা! বর্ষাতি খুলতে খুলতে ঘরের ভেতরের লোকগুনোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল ভূপতি মজুমদার।

বস, বস। তারপর বিষ্টু, পাঁচকড়ি, কি খবর সব?

আজ্ঞে এই চলে যাচ্ছে একরকম আপনার আশীর্ব্বাদে। হাত কচলে উত্তর দিল বিষ্টু ঘোষ।

বসুন দাদা। সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে দিয়ে কাঁচি সিগারেটের একটা প্যাকেট দেশলাই সমেত এগিয়ে দিল রমাপতি।

জলন্ত বিড়িদুটো বেঞ্চির কাঠের ওপর চেপে নিভিয়ে দিল বিষ্টু আর পাঁচকড়ি।

বিষ্টু যাবে না কি? পাঁচকড়ি উঠে দাঁড়াল।

চল যাই।

চললে কেন হে? বস। মুখখানা বেঁকিয়ে গালের একপাশ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল মজুমদার।

আজ্ঞে যাই। কাজকর্ম্ম একটু দেখতে হবে। বিষ্টুও পালাবার ফাঁক খুঁজছিল।

তোমার ত এবার পোয়াবার হে পাঁচকড়ি। পাটের দাম হু হু করে বাড়ছে। বলল মজুমদার।

ও শেষ পর্য্যন্ত নেবে যাবে বাবু। কতকগুলো টাকা দাদন দিইছি। এখনও পাট ভূঁইয়ে। যে বর্ষা এবার, সব উঠলে বাঁচি। শেষপর্য্যন্ত মূলে হাবাৎ না হয়।

আরে সুদে বাড়ুক না হে। মহাজনের টাকা কি আর মারা পড়ে?

না বাবু। তা কি আর হয় সব সময়? আজ্ঞে পেরাত প্রণাম বাবু

বিষ্টু পাঁচকড়ি বেরিয়ে যেতেই হেলাকে বলল মজুমদার, টুলটা নিয়ে ঐ ঝঁপটার কাছে বস্ হারামজাদা। সিগ্রেট খাবি ত ধর। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের উচ্ছিষ্ট সিগারেটটা হেলার হাতে ছুঁড়ে দিল মজুমদার।

তারপর ডাক্তার গুডিভ্। শিকার যে ফস্কে গেল। রমাপতির দিকে চেয়ে চোখ টিপে টিপ্পনী কাটল মজুমদার।

শিকার আর ধরলাম কোথায় দাদা, যে ফস্কাল। কথাটা কানে তুলল না মজুমদার। বলল, জানতাম ও বাগাতে পারবে না। ভায়া, তোমরা ডালে ডালে চল, ত আমি চলি পাতায় পাতায়।

দাদার যেমন কথা। সুন্দরীই বলুন আর যুবতীই বলুন, আমাদের কাছে পচা মড়া। জান পহচান হয়, হয়ত জ্বরে ঠক ঠক করে কাঁপছে, নয়ত ভেদবমি হয়ে মুখখানা শুকিয়ে আম্সি মেরে

গেছে। মাথা চুলকে ওষুধ ঠিক করব, না ভাবে গদগদ হব। ভূপতি মজুমদার কিন্তু অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। ও ত হল রোগের সময়কার কথা। তারপর যখন রোঁয়া কাটিয়ে খাসা তাজা হয়ে ওঠে, তখন বোধ হয় বছর বিউনি, অম্বুলে রুগী ঘরের গিন্নীটির চেয়ে বেশ ভালই লাগে। কি বল?

সাবির কথা বলছেন? আমার বাড়ীর অবস্থা ত জানেন। কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তাকে বাড়ীতে কাজ করবার কথা তুলিনি।

মন্দ উদ্দেশ্য! রাম কহ! বরং ভদ্র মহিলাটি দিন কতক বেঁচে যেতেন। দুদিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন। উদ্দেশ্য যথার্থই মহৎ, তবে পাত্রীটি ঠিক চিনতে পারনি ভায়া।

রমাপতি চুপ করে গেল। মজুমদার আপন মনেই বলতে লাগল। পঞ্চার সঙ্গে ওর অনেকদিনের ভাব। কেমন নয় রে হেলা? রমাপতির মুখের ওপর একটা চোখ রেখে আর একটা চোখে হেলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল মজুমদার।

ভাব বলে ভাব। একেবারে আটাকাঠি। গণশা শালা থাকতেই মাখামাখি। ঐ জন্যেই ত পঞ্চার বোয়ের সঙ্গে এক লহমাও বনে না।

ছোট লোকের কিন্তু অত আস্পর্দ্ধা ভাল নয় দাদা। বউ থাকতেই আর একটা মাগী নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলল, এগুনো কি ভাল? রমাপতির উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল মজুমদার। তোমরা যা ভাবছ, তা নয়।

কি নয়? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল। ভূপতি মজুমদার বলল, ছোটলোক যদি না বুঝে কোন কাজ করে, সেইটেই হয় তার ছোটলোকমি। এতে সে ভদ্দরলোকের মাথায় জুতো মারল।

অপমানবিদ্ধ মুখখানা কুঁচকে বলল রমাপতি, ভদ্দরলোকের মাথায় জুতো মারল কিসে?

কিসে বুঝতে পারছ না? তুমি যাকে বাড়ীতে আনবে মনে করলে, তাকেই সে বেমালুম নিজের ঘরে তুলল।

রমাপতির মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। তা হলে আপনি ভুল শুনেছেন বলতে হবে। আমি কোন কথাই বলিনি। এমন কি এ নিয়ে সাবির সঙ্গে আমার কোন কথাই হয়নি। কিরে হেলা? তুইই বল্ না। হেলাকে সেই বরং বলেছিল, ডাক্তারবাবু আমার যা উপকার করেছেন গতরে খেটে আমি শোধ করব।

মজুমদার হেলাকে জিজ্ঞাসা করল, কি রে হেলা, তাই নাকি?

আজ্ঞে হুজুর, যথাত্থ কথা।

টেবিল ল্যাম্পের কম্পমান শিখায় মনে হল মজুমদারের ফর্সা মুখখানা কাল হয়ে উঠেছে।

বস্তুতঃ সাবির ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন থেকে একটা আক্রোশ ছিল মজুমদারের মনে। অভিভাবকহীন, নিঃসম্বল বিধবার কাছে তার আবেদন নিস্ফল হয়েছিল একদিন, তারও মূলে ছিল ঐ পঞ্চু। সাবির অসুখের সূত্র ধরে রমাপতিও যে শেষ পর্য্যন্ত জড়িয়ে পড়বে, এ জিনিসটা সে প্রথম থেকেই অনুমান করেছিল। তারপর হেলার মুখ থেকে যেদিন শুনল রমাপতির গড়াপেটা উদ্দেশ্যকে বেফাঁস করে দিয়েছে সাবি, পঞ্চুর কাছে সে মনে মনে হার স্বীকার ত করলই, অধিকন্তু সমাজজীবনের অত্যন্ত নিম্নস্তরের এই প্রাণীগুলির স্বচ্ছন্দ জটিলতাশূন্য আচার ব্যবহারের তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলেই তার মনে হল।

মজুমদার বলল, আচ্ছা হেলা। ধর পঞ্চা যদি সাবিকে নিকে

করে বউয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকে, এ নিয়ে তোদের সমাজে কোন গোলমাল হবে না ?

গোলমাল আবার হবে না ? তবে সামনে কেউ কিছু বলবে না। সব আড়ালে গুজ্ গুজ্ করবে।

দেখলে ডাক্তার ? আবার আমাকেই তুমি বলছিলে শাসন করতে ! একি চুরি ডাকাতি করেছে যে ধরে এনে দু ঘা জুতিয়ে দেব ?

বেশ ! আপনারা কিছু না করেন, আমি কিন্তু ছাড়ব না। ওষুধের দাম আর আমার ফির সমস্ত টাকা আমি পঞ্চার ঘাড় ধরে আদায় করব। অত যখন দরদ, তখন টাকাও দিক। রমাপতির কথায় সায় দিয়ে বলল হেলা, নিশ্চয় ! দেক ট্যাকা। দেখা যাক্ বাছাধনের কত মুরোদ।

তুই থাম রে শালা। সব বুঝিস্ তুই। দেখ ডাক্তার, তুমি অবশ্য তোমার পাওনা চাইতে পার ; কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হবে না।

কেন ? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল।

তুমি মনে করছ তুমি তাগাদা করবে, আর সে দিতে পারবে না। তা হলেই তুমি তাকে জব্দে ফেলবে। আমার কি মনে হয় জান ? সে তোমার পাই পয়সাটি মিটিয়ে দেবে। বলেই আপন মনে মাথা নাড়তে লাগল মজুমদার।

আমার টাকা পেলেই হল। হাত নেড়ে বলল রমাপতি।

ওটা ত হল শেষ কথা ডাক্তার। সত্যিই ত তুমি টাকাটা পাবে বলে খরচ কর নি ?

রমাপতি আর তর্ক করল না। মজুমদার আবার বলল, তোমরা

হয়ত মনে করছ, চালে খড় জোটে না, এক কথায় অতগুনো টাকা সে কি করে দেবে? কিন্তু আমি জানি সে টাকা দেবে। ইচ্ছে করলেই সে টাকা যোগাড় করতে পারে।

তা চুরি ডাকাতি করলেই টাকা যোগাড় হবে। এ আর বেশী কথা কি? রমাপতি বলল।

তা করলে কি এতদিন সে বাইরে থাকতে পারত? পুলিশের খাতায় ওর নাম উঠে গেছে। আর হেলাও কত ঘুরেছে ওর পেছনে।

হেলা আর চুপ করে থাকতে পারল না। তা হুজুর যদি মনে করেন, তাকে বাঁধতে কতক্ষণ?

না রে বেটা তা নয়। দু হাতে রগ টিপে মজুমদার কি খানিকটা ভেবে নিল। এই হেলা, এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছিস, আজ আর বুঝি চৌকি হাঁকতে বেরুবি নে। দিব্যি বাদলা পেয়েছিস। মাচার সুখে বেড়াল ঘুমোয়, কেমন না রে বেটা? মজুমদার উঠে দাঁড়াল। হেলা এ সঙ্কেত বোঝে, অতএব সেও উঠে দাঁড়াল।

কিছু মনে কর না ডাক্তার। তোমাকে ভালবাসি, দুটো ঠাট্টা বিদ্রূপ করি, বুঝলে না?

আজ্ঞে না, মনে করবার কি আছে? এর মধ্যেই চললেন? এখনও রাত বেশী হয় নি।

না হে। আকাশের গতিক ভাল নয়। একটু ধরণ করেছে। এই বেলা সরে পড়া যাক। হেলাকে আগে নিয়ে মজুমদার ডাক্তার-খানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বৈঠকখানায় এসে কলকেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে লাগল হেলা। মজুমদার ইজিচেয়ারখানায় বসে তাকে কাছে ডাকল।

কেমন শুনিয়ে দিলাম ডাক্তারকে। আমি যেখানে হেরে

গেলাম, সেখানে উনি গেছেন ডাল গলাতে। বেটার আস্পর্দ্ধা দেখ একবার!

সে কথা আর বলতে বাবু। ও মুই গোড়া থেকেই জানতাম। বাবুর দোড়ড়া একবার দেখে নেলাম। পেছন ফিরে অম্বুরীতামাকের কলকেয় গোটাকতক টান দিয়ে গড়গড়ার ওপর বসিয়ে দিল হেলা। মজুমদার গড়গড়ায় টান দিতে লাগল।

সেই জন্যেই বুঝি দুদিন নাচিয়ে নিলি ওটাকে? বেটা শয়তানের ধাড়ী একেবারে। নিজের প্রশংসা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল হেলা। নাচাব না হুজুর? ডাক্তারডা কি কম না কি ভাবেন? সাবিরে দেখতে গিয়ে কি কম কীর্ত্তি করেছে ওইতি? নলটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে হেলার মুখের দিকে চাইল মজুমদার।

দেখতে গিয়ে আবার কি কীর্ত্তি করল?

হেলা বলল, বলে 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।' পড়বি ত পড় তারা বাগদির চোখে।

সত্যি করে বল্ হারামজাদা। মিথ্যে বলবি ত জ্যান্ত তোর ছাল ছাড়িয়ে নোব। এ রমাপতি ডাক্তার পাস্ নি। ইজিচেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসল মজুমদার।

মনিবের এ জাতীয় ঝাঁঝের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও, হেলার মুখখানা শুকিয়ে উঠল। কিন্তু নির্ব্বিচারে কুৎসা আর মিথ্যা রটনার নিয়মিত অভ্যাসে তার জিভ এতটা ধারাল হয়ে উঠেছিল যে, মজুমদারের কথার সফাই দিতে একটুও বাধল না। হুজুরের কাছে যদি মিথ্যে বলে থাকি, আমার জোড়াবেটার মাথা খাব। তারা নিজের চোখে দেখেছে—ডাক্তার আর সাবি একসঙ্গে শুয়ে আছে।

তোর গুষ্টির মাথা। তখন ত তার বেহুঁস জ্বর।

আজ্ঞে ঐ জ্বর অবস্থাতেই বাবু।

হুঁ। এবার মজুমদারের মুখ দেখে অন্তরাত্মা শিউরে উঠল হেলার। এ কথাটা না বললেই সে ভাল করত। অনেক করে সাহস সঞ্চয় করে আবার বলল হেলা। এতে আর কি বাহাদুরী আছে বাবু। ও ত সব্বাই পারে।

দূর্, দূর্। বেটা একেবারে জানোয়ার রে। ছিঃ ছিঃ। তা পঞ্চা বেশ দাওয়াই দিয়েছে। কি বলিস্? নলটা আবার মুখে তুলে নিল মজুমদার।

সে কথা আর বলতে, মুখ পুইড়ে দিয়েছে একেবারে।

চুলোয় যাক ও কথা। মজুমদার আপন মনে তামাক টানতে লাগল। কিন্তু নিস্পৃহতার ভাবটা বেশীক্ষণ বজায় রাখতে পারল না। হেলাকে জিজ্ঞাসা করল, পঞ্চা তা হলে এবার সাবিকে নিয়ে মাতবে?

মাতবে কি হুজুর, ও ত মেতেই আছে। বলে সেধো ভাত খাবি, না আঁচাব কম্‌নে?

ও। বেটা আমার কথার ধুকড়ি। তোর যত কথা তার সিকির সিকিও যদি কাজ থাকত, তা হলে বুঝতাম। জায়গায় জায়গায় কাদা মাখা ডান পাটা হেলার কাঁধের ওপর তুলে দিল মজুমদার।

ছেলেবেলায় পঞ্চার সঙ্গে অনেক মিশিছি হেলা। তোর চেয়ে তাকে আমি ঢের বেশী চিনি। হেলার কাঁধ থেকে পা সরিয়ে নিয়ে চেয়ারের ওপর দেহটা এলিয়ে দিল মজুমদার।

সাবির সঙ্গে তার যত ভাব থাক, নিজের বউকেও সে কম ভাল বাসে না। সেদিক দিয়ে সে অনেক ভদ্দরলোকের চেয়েও ভাল।

তুমি বেটা গাবের ঢেঁকী, তুমি মনে করছ সাবিকে পেয়ে সে বউকে ভাসিয়ে দেবে। হেলাকে উদ্দেশ্য করে বললেও এটা মজুমদারের নিজস্ব চিন্তা।

সে ভাসাবে কেন বাবু, বউডোই নিজে ভাসবে।

ওঃ। বেটা একেবারে গণকঠাকুর এয়েছেন রে। বউডোই নিজে ভাসবে। উনি খড়ি পেতে বসে আছেন।

জাতি হিসাবে হীন হলেও,বুদ্ধিতে মোটেই হীন ছিল না হেলা। সময় বুঝে সে মজুমদারের প্রচ্ছন্ন পাপচিন্তার পর্দ্দাগুনোর ওপর আঙ্গুল বুলিয়ে গেল। যদি বিশ্বেস করেন হুজুর. তা হলে বলি, না জেনে ও কথা আমি বলিনি। তুই কি জানিস বেটা? মজুমদারের চোখদুটো চক চক করে উঠল। হেলা বলল পঞ্চার সঙ্গে একদণ্ডও বনে না বউডোর। নিজের কানে শুনেছি চোপর রাত তুই থুলি মুই থুলি করে ঝগড়া করছে দুজনা।

তুই কি রাত্তিরে ওর ঘরের কানাচে বসে থাকতিস্ নাকি?

হেলা কোন উত্তর দিল না। শুধু সমস্ত দাঁতগুনো বের করে জানিয়ে দিল--মজুমদারের এই অনুমান সত্য। সজোরে হেলার পিঠ চাপড়ে দিল মজুমদার। ভেলা মোর বেটা রে! বেটা বোকা হলে কি হয়, বুদ্ধি আছে। হেলা বলতে লাগল, সাবির রংটাই শুধু ফর্সা। নইলে আর কি আছে? মাস বেচে খেয়েছে। বেরসকাঠ। পঞ্চা শালার যেমন নজর। অমন বউ ফেলে ঐ হাড়ের বোঝা নিয়ে পড়ল।

পঞ্চার বউ বুঝি দেখতে শুনতে ভাল, না র‍্যা?

হেলা আবার হাসল, আজ্ঞে হুজুর ত দেখেছেন।

দেখিছি বলে কি মনে করে বসে আছি না কি রে শালা।

আজ্ঞে রংটা বাদ দিলে সাবি তার কড়ে আঙ্গুলেরও যুগ্যি নয়। যেমন মুখচ্ছিরি, তেমনি গড়ন, আর গায়ে কি জল! মজুমদার চুপ করে রইল। তারপর জামার পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে হেলার হাতে দিল।

মজুমদারের বৈঠকখানা বাড়ীটা ভেতর মহল থেকে একটু দূরে ছিল। তা ছাড়া রাত্রিবাসটা সে বেশীর ভাগ এইখানেই করত। এ নিয়ে বাড়ীর ভেতর থেকে আপত্তি উঠলেও সাধারণতঃ এ সব আপত্তির যা পরিণাম হয়, এক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম হয় নি। এ সমস্তই গড়াপেটা ব্যাপার। প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক বললেও চলে।

পর পর দুপাত্র নিঃশেষ করে মজুমদার হেলাকে বলল। নে। সব তুলে ফেলে আমার কাছে এসে বস্। বোতল, গ্লাস্ আলমারিতে তুলে রেখে মজুমদারের পায়ের গোড়ায় এসে উবু হয়ে বসল হেলা।

বেটা একেবারে গরুড় পক্ষীটি বসলেন। ভারি ভক্তি! কি চাই বলে ফেল। আর দু বিঘে আমন ধানের জমি, না শতখানেক টাকা? বেটা পাজীর ধাড়ী কোথাকারের।

আজ্ঞে হুজুরের দয়াতেই ত বেঁচে আছি। টেনে টেনে হাসতে লাগল হেলা।

তুই ত শালা বেঁচে আছিস, আমি যে এদিকে মরছি। টাকার ঘাড় ভাঙ্গছ আর দাঁত বের করে এসে দাঁড়াচ্ছ। শালা অকম্মার ঢিবি।

আর কডা দিন সবুর করুন হুজুর। তারপর দ্যাখবেন হেলা কি করে।

ঠিক বলছিস্? মজুমদারের কথাগুণো জড়িয়ে আসতে লাগল। এখন যা। রাত হয়েছে। যাবার সময় তেওয়ারী বেটাকে ডেকে দিয়ে যা। হেলা চলে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

নদীর পলিমাটি কুড়িয়ে যে দেশ গড়ে ওঠে, সে দেশের অধিবাসীদের দেহে ঠিক অনুরূপ উপাদানই থাকে। ঢিলে ঢিলে, ভঙ্গুর মনোবৃত্তি, সঙ্কল্প গড়তেও যেমন. ভাঙ্গতেও তেমনি। তাই আষ্টেপৃষ্টে দৃঢ় পেশীর ঠাসবুনুনি থাকলেও, পঞ্চুর বিরহজর্জ্জর মন সাবি আসার দিনকতক পরেই বেশ সহজ হয়ে গেল। শুধু্ তাই নয়, এতদিনের বিবাহিত জীবনে অন্নচিন্তা, বিত্ত উপার্জ্জনে বাপমাকে সাহায্য করার কথা তার মনে ওঠেনি। খেয়াল মত কাজ করেছে, পয়সা এনেছে। সস্ত্রীক আলাদা থাকলেও মাসের অর্দ্ধেক দিন বাপ মায়ের উপার্জ্জনে ভাগ বসিয়েছে। কিন্তু সাবি আসার পর এই পরভূজবৃত্তির লজ্জাটা যেন সে প্রথম অনুভব করল।

গ্রামের জেলেদের সঙ্গে গঙ্গায় মাছ ধরতে গেল পঞ্চু; শ্রাবণের মাঝামাঝি। একুল ওকুল ছাপিয়ে উঠেছে নদী। লাল জল জায়গায় জায়গায় ঘুরপাক খেয়ে তীব্র স্রোতে মিশে যাচ্ছে। পঞ্চুর বেশ ভাল লাগল মাছ ধরতে। দিন রাতের ঠিক নেই, জোয়ার ভাঁটার গতি অনুযায়ী কাজ। কোন কোন দিন নৌকাতে নদীর ওপরেই রাত কাটাতে হয়।

চরণ জেলের নৌকা। পঞ্চাশের ওপর বয়স চরণের। জল, খোলা হাওয়া আর মাছের তেলচর্ব্বির প্রসাদে সুগঠিত অবয়ব। কুমীরেব মত মোটা খসখসে গায়ের চামড়া।

জেলেদের উপার্জ্জনের সময় এটা। পোনাঘাটের ইজারাদারদেরও

পূরো মরস্সুম। তা ছাড়া, এই সময়েই ঘোলাজলের ভেতর দিয়ে আনাগোনা করতে আরম্ভ করে রূপোচকচকে ইলিশের সারি। তিনকোণা জাল জলের গভীরতম প্রদেশে চালিয়ে দিয়ে একহাতে বাখারীর অগ্রভাগটা চেপে ধরে বসে থাকে পঞ্চু। একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থেলো হুঁকোয় তামাক টানে চরণ।

ঝাঁকি মারিস্ নে পঞ্চা। এ লাঠিচালা নয়। দম বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। জলের জীব হলে কি হয়, বুদ্ধি ওদের মান্সের চেয়ে কম নয়। এই দুটো মাসই হচ্ছে মোদের রোজগারের সময়। তারপর ত সোঁত বছর বসে বসে খাওয়া। এর থেকেই ঘরদোর সারা, নৈকো মেরামত, সুতো জাল, ডাক্তারের কড়ি, জমির খাজনা, পরণের ট্যানা সমস্ত। চরণ বকে, পঞ্চু শোনে। কেমন যেন নতুন মনে হয় কথাগুনো। কাজের সময় বেশ হিসাবগাঁথা আলোচনা করে চরণ। লাভ লোকসান চুলচিরে বিচার করে। পাইকারী দরে বেপারীদের মাছ বেচে দিয়ে টাকার গোছা ছোট্ট গেঁজেটায় ভরে নেয়। টাকাটা সিকিটা মাঝে মাঝে ফেলে দেয় পঞ্চুকে।

হাত পাকা ভাই, কাজ শেখ আগে। নিধিরামের কাছে তিন সন বেগার খেটে কাজ শিখতে হয়েল আমায়। এ সন দেখছি লোকসান যাবে। জালেব দাম উঠলে বাঁচি।

পঞ্চু ভাবে এর চেয়ে ঢের ভাল অভয় মোড়ল। কাজ করিয়ে নেয়, পয়সাও দেয় অকাতরে। তা হলেও স্বাধীন ব্যবসা। কাজ যদি শিখতে পারে। সেই সঙ্গে যদি কোন রকমে একখানা নৌকা কিনতে পারে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে পঞ্চু।

তবুও তার ভাল লাগে চরণকে। নিজের চিন্তা ছাড়া আর কোন ভাবনা নেই তার মাথায়। ঘরোয়া আলোচনার ধার দিয়েও

যায় না। না নিজের, না পরের। বিশেষ করে রাতে সে চরণের সঙ্গ কামনা করে। সব দিন সে শুভলগ্ন আসে না। রাত নটার পর থেকে যেদিন গঙ্গায় ভাঁটা পড়ে, কিনারার কাছে লম্বা জাল ফেলে পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জোয়ার লাগলেই জাল তুলে নেয়। বেলে আর চিংড়ি মাছে ঝুড়ি ভরতি হয়ে যায়। জাল পেতে রেখে নদীর চরে ভাত রেঁধে খাওয়া সেরে নেয়। স্বল্পপরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মের অলস অবসরে দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলে দেয় চরণ। সত্য, মিথ্যা, ভুল ভ্রান্তি মেশান, শোনা, দেখা অজস্র গল্প বলে চলে।

রাত্তির বেলা মাছ ধরা কাম বড় চাড্ডিখানি কথা নয় রে পঞ্চা। শুনতে ভাল জেলের ব্যাওসা, রথে কি ঠাকুর তাত জানিস্ নে। জাল যখন খুলবি, তিনবার রামনাম করে তারপর জালে হাত দিবি। ওনাদের ঐ মাছের ওপর বড্ড নজর। সেবার ঐ ভড়েদের টুব্‌লো, যার ঐ ফর্সা মতন বউডো এখন মাছ বেচে বেড়ায়, জাল টাল গুটিয়ে থুয়ে বাড়ী গেল। যাবার সময় বলল, চরণদা, বুকে কেমন ব্যাথা ধরল যেই জালে হাত দেলাম। তিনডে দিন থাকল, তারপর সাবাড়। তুই ত মন্তর তন্তর অনেক জানিস। বেশ করে আপ্তসারাটা সেরে নিয়ে তবে জলে নাববি। আর দু দিন থাক,তখন বুঝবি। একে রাত্তির কাল, তায় মাছ জিনিস।

অশ্রান্তবর্ষণ আকাশের তলায় নৌকার ছইএর মধ্যে বসে সমস্ত চেতনার ওপর দুর্ভেদ্য যবনিকা টেনে দেয় পঞ্চু। সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট্ট একটা মানুষ, পাঁচ বছরের শিশুর চেয়েও অসহায়। চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় অসংখ্য অশরীরির মৎসলোলুপ লুব্ধ মূর্ত্তি। চরণের প্রত্যেকটি কথা গিলে খায় পঞ্চু।

ছেঁড়াখালের মুখে কোমর ঘেরা হয়েছে। আমি, রাজু আর চাঁড়ালদের ভণা। নৈকো নিয়ে গিয়ে জাল ঘেরব, মনে হল জালে যেন কুমুর পড়েছে। ন্যাজের আপালি দেচ্ছে যেন পাড় ভেঙ্গে পড়ছে। মনে হল নৈকো বুড়ে গেল। একটু পরে দেখি, কমনে কি! ফিট ফিট করছে জোচ্ছনা। থির জল। কোন ঠাঁয় কিচ্ছু নেই।

তা হলে কি ওটা? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করে।

কি যে তা কেউ বলতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে দেখেছে অনেকেই।

প্রশস্ত চরের ওপর মহাকাশের অনন্ত শূন্যতা। অর্দ্ধ আবরিত চাঁদের চারপাশ দিয়ে উধাও হয়ে চলেছে ধোঁয়ার মত মেঘের শ্রেণী। পঞ্চুর দৃষ্টি চলে যায় অনেক দূরে। আজ চরণের বর্ণনাভঙ্গি তার কানে শিশুর কাকলির মত শোনায়। দিগন্তলীন মনের প্রান্তদেশে বহুচিন্তার ছোঁয়া এসে লাগে। বউয়ের কথা, সাবির মুখ, নিজের জীবনের বহু সূক্ষ্ম, জটিল সমস্যা।

ঠক্ করে ঘরের দাওয়ায় কাঠের সেঁউতি নামিয়ে রেখে হাঁক দিল পঞ্চু, সাবি, কমনে গেলিরে? ধোপকাচান সাড়ির খস্‌খস্ শব্দ তুলে ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল সাবি নয়, পঞ্চুর বউ। বিরহান্তরিতা মানসী। তবুও পঞ্চুর বুকের মধ্যে ঝড় না উঠে, হাতুড়ীর ঘা পড়ল।

এ কি? কখন আসা হল?

কাল। সাঁঝ নাগার পর। তা তুমি দেখছি এইবার ভদ্দর-নোক হয়ে উঠেছ। তা হবা বৈকি, ভাল নোকের সঙ্গে ঘর করছ।

সমস্ত শরীরে লাবণ্য সঞ্চয় করে ফিরে এসেছে বউ। কানে এক-জোড়া সেনার দুলে মুখখানা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। তবুও সেই মুখের হাসিতে অন্তরাত্মা শিউরে উঠল পঞ্চুর।

পঞ্চু বলল, তুইও ত দেখছি বেশ কথাবাত্রা শিখে এইছিস। তা বলা নেই কওয়া নেই কার সঙ্গে আসা হল ?

না এলেই ভাল হত, না ?

সে কথা পরে হবে। কার সঙ্গে এলি তাই বল। পঞ্চু ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

তুমি ত আর গেলে না যে তোমার সঙ্গে আসব। তাই জামাই দাদার সঙ্গেই এ্যালাম।

তা বেশ করেছিস। জোড়ে গেলি আবার জোড়ে ফিরে এলি। হাসতে হাসতে বলল পঞ্চু।

আর তুমি বড় বেজোড়ে আছ, না ? বউয়ের মুখখানা এইবার কাল দেখাল।

দেখতেই পাবি কি রকম আছি। তুহাত বাড়িয়ে এইবার বউকে কাছে টেনে আনতে গেল পঞ্চু।

ছাড়, ছাড়। কাপড় নোংরা হয়ে যাবে। মা গো! গায়ে কি আঁসটে গন্ধ! বমি ঠেলে আসে। হঠাৎ চাবুক খেলে যেমন হয়, পঞ্চুর মুখখানা সেই রকম দেখাল। তা হলে দেখছি তোর আসা ঠিক হয় নি। আমায় ত করে খেতে হবে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে শুকন গামছাখানা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল পঞ্চু। পঞ্চুর মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে দাওয়া থেকে নেমে গেল বউ।

তামাক সেজে টানতে যাবে হঠাৎ বাইরে জুতোর শব্দ পেয়ে চমকে উঠল পঞ্চু। অভয় মোড়লের জুতা মাটির বুক কাঁপিয়ে চলে। এ ত সে রকম শব্দ নয়। এ যেন অপটু পা তুটো জুতার ভারে মাটির সঙ্গে কোন রকমে টেনে টেনে চলছে। পঞ্চুর কৌতুহল হল।

কোয়ার্টার ইঞ্চি চওড়া লালপাড় ধুতি ফেরতা দিয়ে পরা,

হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সামারকুল গেঞ্জী গায়ে, পায়ের চেয়েও অন্তত দেড়গুণ বড় ফিতেবাঁধা চওড়া পাঞ্জা সু পরা, চেরা বাঁশের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ীর ভেতর ঢুকেই পঞ্চুকে দেখে চমকে উঠল দেশো।

আরে কুটুম কখন এলে হ্যা ? কমনে থাকা হয় আজকাল ? কাল সন্‌ঝে বেলা এইছি, আর এখন দেখা হল। ভায়া না কি মাছ ধরা ব্যাওসা ধরেছ শোনলাম। জুতা পায় দিয়েই দাওয়ায় উঠে এসে উপু হয়ে বসল দেশো। এই সাজলে না কি হ্যা ? কথার টানগুলো বেশ ভাল লাগছিল না পঞ্চুর। পঞ্চুর স্বজাতি ও বিবাহসূত্রে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হলেও সে যে তাদের মধ্যে দলছাড়া ও বেশ একটু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে জোর করে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছিল দেশো।

সেঁউতির গায়ে ছোট্ট হুঁকোটা ঠেস দিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দেশোর জুতার ধুলো নিল পঞ্চু। তারপর একখানা কাঠের পিঁড়ি এনে পেতে দিয়ে বলল, হ্যাঁ, এই সাজলাম। জুতো জোড়াটা খুলে থুয়ে ভাল করে বসুন না দাদা।

তোমার আর কুটুম্বিতে করতে হবে না ভায়া। এ ত আমার নিজের বাড়ী।

হুঁকোয় একটা প্রচণ্ড টান দিয়ে, হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে ছিদ্রমুখটা মুছে দেশোর হাতে হুঁকো তুলে দিল পঞ্চু। তামাক টানতে টানতেই নাকটা বারকতক সিঁটকে উঠল দেশোর। একটু বাইরে গিয়ে বসি ভায়া। বাড়ীর ভেতরডায় আর তিষ্টুবার যো রাখ নি। বাপু রে, ইদিকে জালের গন্ধ, উদিকে গাবপচা গন্ধ ! কি করে থাক হ্যা এখানে ?

আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। সলজ্জ হেসে উত্তর দিল পঞ্চু। একপা দাওয়া থেকে উঠানে নাবিয়েছে দেশো, সাবি বড়ীতে ঢুকল ও পঞ্চু বা দেশো কারুর দিকে না চেয়ে সটান উঠান দিয়ে রান্নাচালাটায় চলে গেল। শিকারী প্রাণী যেমন শিকারের দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবে সাবির দিকে চেয়ে রইল দেশো, যতক্ষণ না সে দৃষ্টিপথ থেকে আড়ালে গেল। তারপর পা থেকে টেনে জুতাজুপাটি খুলে রেখে পঞ্চুর আমন্ত্রিত আসনটায় চেপে বসে পড়ল। কোনরকম ভূমিকা না পেড়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল দেশো, মেয়েনোকটা কে ভায়া ?

পাশের গাঁয়ের ছ আনি তুলেদের মেয়ে। তারপর, শরীল গতিক সব ভাল ত? ওখানকার সবাই ভাল আছে? দেশোর নির্লজ্জ জিজ্ঞাসাটা চেপে দেবার চেষ্টা করল পঞ্চু।

তুলের আবার ছ আনা ন আনা আছে না কি? তা ছ আনি বিবি এখানে কি মনে করে? টেঁক থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে ফেলল দেশো। পঞ্চু বলতে লাগল, এ চত্বরে যত তুলের বাস, সবই পেরায় ভাঙ্গুনে। সব ছেল ঐ শুকসাগরের ওপারে, এখন যেখানে ঐ তারাপুর গাঁ হয়েছে চর পড়ে। তুগ্‌গাপুর গাঁখানা ছেল ঘরকতক তুলেদের। সব মরে হেজে গিয়ে ছআনা অংশ ছেল নবা তুলের। নবার পাঁচ ছেলে। পেল্লাদ ছিল বড়। সেই পেল্লাদের মেয়ে ঐ সাবি।

ও! ঐ নাকি সাবি? তাই বল ভায়া। তা ছআনি দশ আনি বললে কি বোঝব বল? তা বয়েস ত খুব কাঁচা। ও নিকে করে না কেন?

তাত ত জিজ্ঞেস করে দেখি নি দাদা। পঞ্চুর মুখখানা কাল হয়ে উঠল। আধখাওয়া বিড়িটা পঞ্চুর হাতে গুঁজে দিয়ে হেসে

একেবারে গড়িয়ে পড়ল দেশো। তারপর কেসে, থুতু ফেলে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠে বলল, কারে ধোঁকা দেচ্ছ ভায়া? বলে জরমো গেল ছেলে খেয়ে, এখন বলে ডান? এক পাড়া ছেড়ে আরেক পাড়ায় এয়েছেন বিনোদিনী, রাইকিশোরী। তার মনের খবর তুমি জান না? বলে,

তোর লাগি বঁধু হে,

হলাম পরবাসী।

সুর করে গলা ছেড়ে গান ধরল দেশো। পঞ্চু বারণ করবে কি, তার গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল।

পঞ্চা। পঞ্চুর মা যে কখন বাড়ী এসেছে কেউ লক্ষই করে নি। বেলা হয়েছে, চান টান করবি, না বসে বসে আড্ডা দিলেই চলবে? এই যাচ্ছি মা। তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে পড়ল পঞ্চু।

বড় ঘরখানার সংলগ্ন রান্নাচালা। হাত কতকের ব্যবধান। দেশোর কথাগুলো শুনতে পেল সাবি। রান্না চাপিয়ে দিয়ে বাটনা বাটছিল পঞ্চুর বউ। হাতের কাজ থামিয়ে সেও শুনল কথাগুলো। লজ্জায় আর মুখ তুলে চাইতে পারল না সাবি। অথচ চুপ করে বসে থাকতে তার আরও লজ্জা করছিল। একবার মনে করল বাইরে চলে যাবে, কিন্তু দেশোর চোখদুটো মনে পড়তেই তার গায় কাঁঠা দিয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে এসে দাঁড়লো পঞ্চু। একটু তেল দে দিনি। রান্নার আর দেরী কত? হুকুম ও জিজ্ঞাসা অবশ্য বউকেই করল পঞ্চু।

দেখে শুনে ন্যাও। আমি ত আর দশভুজো নই। সাবি আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কিন্তু চুপ করে থাকতেও পারল না।

কি করতে হবে বল না বউদি। একা তুমি আর কত পারবে? বলেই তরকারিকোটা বঁটিখানা পেতে একটা আস্ত চালকুমড়া সামনে টেনে নিল।

থাক তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমি এখনও গতরের মাথা খাইনি।

বোতল থেকে খানিকটা সরষের তেল ঢালতে ঢালতে বলল পঞ্চু: কেন করুক না, তবুও খানিকটা কাজ এগিয়ে যাবেখুনি।

তোমায় ত ফোড়ন কাটতে ডাকিনি। তেল নিয়ে যে চুলোয় যাচ্ছ, যাও।

পঞ্চুর মা ঘরে এসে কচুপাতায় মোড়া কতকগুনো মাছ সাবির হাতে দিয়ে বলল, মাছকড়া বেছে ডোবা থেকে ধুয়ে আন ত মা।

বঁটিখানা কাত করে রেখে দাঁড়িয়ে সাবি একহাতে কাপড়খানা যথাসম্ভব সংযত করে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, পঞ্চুর মা বলল, একটু দাঁড়া। পঞ্চা তেলটা ঘাটে গিয়ে মাখিস। তোরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড় বাবা। আড়চোখে চেয়ে দেখল সাবি বউয়ের মুখখানা আগুনের মত গন গন করছে। পঞ্চুর মা একবার হেঁসোলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ভাতটা আগে চড়ালে কেন বউ? কখন খাবে, জুইড়ে জল হয়ে যাবে যে। মাছ তরকারিগুনো রেঁধে নিয়ে শেষে ভাতকড়া ফুটিয়ে নিলেই হত। বউয়ের মনে প্রসন্নতা ছিলনা, তবুও যতটা সম্ভব সংযত ভাবেই জবাব দিল: কি করব? কোন কিছুর যোগাড় নেই। কাঠকুটো কিছুই নেই। তাই ভাত চেপিয়ে শাক তোললাম, কচু কেটে আনলাম, কুমড়ো পাড়লাম। যুক্তিপূর্ণ জবাবে একটু নরম হয়ে গেল শাশুড়ী।

কি করব বল মা। সাতবাড়ীর কাজ সারতেই দিন ফুইরে

যায়। কুটুমের ছেলেড়া এয়েছে, একটু দেখেশুনে দোব, তারও উপায় নেই। ঐ জন্যেই ত নোকজনের আসা ভালবাসিনে বাপু। নিজেরা বলে খাই না খাই শুকনো ডাঙ্গায় পড়ে থাকি। অপাঙ্গে শাশুড়ীর মুখের দিকে চেয়ে এইবার বলল পঞ্চুর বউ, নোকজন আসার কি কামাই আছে বল? তবে আমার বাপের বাড়ীর নোক আসা হয়ত তোমার ভাল নাগে না।

পঞ্চুর মার মুখখানায় আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠল। তুমি রাগ করছ কেন মা? আমি ত রাগের কথা বলিনি।

কিন্তু অল্পবয়সী হলেও বেশ পাকা উত্তর দিল বউ। তোমারও ত রাগ করার কথা নয় মা। যার গায়ে নাগে, তার রাগ হতে পারে।

পঞ্চুর মা চুপ করে গেল, কিন্তু সাবি আর দাঁড়াতে পারল না। এমন কি বড় ঘরের সুমুখ দিয়ে বাইরে যাবার সময় তার মনেও পড়ল না, কেউ তার জন্য বাঘের মত ওৎ পেতে কোথাও বসে আছে।

বাড়ীর বাইরে ছোট্ট একটা ডোবা। বনকচুর ঝোপ ছাপিয়ে জল তার সমতলভূমির ওপর উঠে এসেছে—বিবর্ণ, পাতাপচা, সিদ্দি-গোলা রং। বড় একখানা থান ইটের ওপর ঘসে ঘসে মাছগুনো পরিষ্কার করে চুপড়িতে তুলে অনেকক্ষণ ধরে জলে ধুতে লাগল সাবি। প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনের দিকেই তার লক্ষ্যটা তখন বেশী। কাল সন্ধার-পর থেকেই সে বুঝেছে, এ বাড়ীর আশ্রয় তার চলে গেছে। তাছাড়া, তার শরীর এখন বেশ সুস্থ হয়েছে। আর এখানে থাকা ভালও দেখায় না। কিন্তু তা হলে ত ঘরখানা আবার দেখে আসা দরকার। দিনকতক আগে একবার দেখে এসেছে, বহু জায়গা দিয়ে জল পড়লেও, তালপাতা চাপা দিলে এবছরটা কাটতে পারে।

'মাছগুলো যে জল পেয়ে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল।' অত্যন্ত

চমকে উঠে চেয়ে দেখল সাবি, দেশো কখন নিঃশব্দে একেবারে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মা গো! এমন অসভ্য নোক কখন দেখিনি। আপনাহতেই দাঁড়িয়ে উঠে বলে ফেলল সাবি। তখনও সাবির যাওয়ার পথটা প্রায় আটকে আছে দেশো। দেশো বলল, কি যে বল তুমি মাইরি। কুটুমবাড়ী এইছি, ঠাট্টা তামাসার সম্বন্ধ। দুদিন আমোদ আহ্লাদ করব, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।

পথ ছাড়ুন। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ ইচ্ছা না থাকলেও একটুখানি সরে যেতে হল দেশোকে। তবুও আর একটু চেষ্টা করতে ছাড়ল না।

আমারে আর নজ্জা করতে হবে না। পঞ্চুর ভায়রাভাই আমি। তার সঙ্গে আমার হাসিতামাসার সম্বন্ধ। চিবিয়ে চিবিয়ে আলাপটা জমাতে গিয়ে চেয়ে দেখল দেশো, সাবি বাড়ীর ভেতর চলে গেছে।

সাবি রান্নাঘরে এসে মাছের চুপড়ি নাবিয়ে রাখতেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল পঞ্চুর বউ। আসতে পেরেছ? তবু ভাল। আমি মনে করলাম জলে ডুবে গেলে বুঝি। এই প্রথম সাবির সঙ্গে কথা বলল পঞ্চুর বউ। কিন্তু মনে অনেকখানি জ্বালা ছিল বলে আর চুপ করে থাকতে পারল না সাবি। তা আর হল কই বউদি? তা হলে ত বাঁচতাম। বলতে বলতেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ও বাবা! এযে কোন কথা বলবার যো নেই দেখছি। তা ঝরা চোখের পানি ফ্যালছ কেন বাপু ঠিক দুকুর বেলা? গেরস্তর একটা নক্ষণ অনক্ষণ ত আছে! কোনরকমে কান্না থামাল সাবি। সত্যিই এ কি করছে সে? কিন্তু কান্না বন্ধ করলেও চোখের জল

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল না। একবার ভাবল পুকুরঘাটে দেরী হবার কারণটা খুলে বলে। কিন্তু কোথা থেকে রাজ্যের লজ্জা এসে মুখখানা যেন চেপে ধরল।

ঠিক সেই সময় একখানা শুকনো কাঠ নিয়ে ঘরে এল পঞ্চুর মা। কি হয়েছে লা সাবি? কান্ছিস্ কেন মা? সাবি উত্তর দেবে কি, প্রশ্নকারিণীর কথার মিষ্ট সুরে তার কান্না আরও বেড়ে গেল।

কি হয়েছে গা বউ? তুমি কিছু বলেছ বুঝি? এবার পঞ্চুর বউও কেঁদে ফেলল। ঘাট হয়েছে মা, আমার চোদ্দ পুরুষের ঘাট হয়েছে। এমন জানলে কোন্ নচ্ছারের বিটি কথা বলত। মাছ ধুতে গেল দেখে কড়ায় তেল ঢেলে দেলাম। এলেই তৈরী তেলে মাছ কডা ছেড়ে দোব। ও মা, গ্যাছে ত গ্যাছে। সেই কথা বলিছি, তাই এত। মান অভিমানের পালাটা আর বেশী এগুতে পারল না। ডোবা থেকে স্নান সেরে এসে উঠান থেকে চিৎকার করে ডাকল দেশো। কই রে ছুটকী—একখানা শুকন কাপড় টাপড় দিবি? পঞ্চুর মা চোখ টিপে চুপ করতে ইশারা করল বউকে।

দ্যাঁড়াও বাবা। আমি কাপড় দিচ্ছি। এ কি? এর মধ্যেই চান হয়ে গেল? পঞ্চু কমনে? পঞ্চুর মা দেশোকে কাপড় এনে দিল।

আর কেন বল মাউই। তোমার ছেলের কথা আর বল না বাপু। ও তেল মাখতে নাগল দেখে একটুখানি মাঠে গ্যালাম। এসে দেখি পগার পার। পঞ্চুর মা বলল। গঙ্গার ঘাটে তারে দেখতে পেলে না?

ইচ্ছা করেই আর উত্তর দিল না দেশো। ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলে ঘরের ভেতর দেওয়ালের গায়ে হুকে টাঙ্গান ভাঁজ করা কাঠের আরসির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে লাগল। মোটা চিরুণী আর হাতের সাহায্যে অনেক কসরৎ করে মেয়েদের

অনুকরণে সিঁথির দুধারে দু থাক চুলের পাতা নামিয়ে দিল। তারপর ফেরতা দিয়ে পরা শুকন কাপড়ের অগ্রভাগটা দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে পিছন ফিরতেই দেখতে পেল পঞ্চুর বউ ঘরের মেঝেয় একবাটি তেলমাখা মুড়ি আর একঘটি জল নামিয়ে রেখে বাইরে চলে যাচ্ছে। খপ্ করে তার কাপড়ের আঁচলটা চেপে ধরে বলল দেশো, চোরের মতন চুপিচুপি পালাচ্ছিস্ যে বড়। এখেনে এসে যে বড্ড নজ্জা হয়েছে। এমন জানলে কোন শালা আসত মাইরি।

কেন বল দিনি? কেডা কি করল তোমার? তখনও সাড়ির আঁচলটা দেশোর হাতে ধরা।

করবে আবার কি? তবে আমার না কি চারদিকে চোখ কান থাকে। শালীর বাড়ী এসে একটা নতুন কথা শুনে গ্যালাম। অপাঙ্গে শাসনের ভ্রূভঙ্গি করে বলল পঞ্চুর বউ, কাপড় ছাড়, কেডা দেখতে পাবে। ন্যাও, মুড়িকডা খেয়ে ন্যাও। নতুন কথা আবার কি শোনলে, ঝক্ করে বল। বেলা হয়ে গিয়েছে। রান্না করব তবে খেতে পাবা। দেশোর চোখদুটো কৌতুহলে নেচে উঠল।

আরে থো তোর রান্না। ঐ হাঁড়ি আর হেঁসেল নিয়েই থাক, আর মজা মারুক অপর জনা। বলে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।' একমুঠো মুড়ি গালে ফেলে দিয়ে ছোট একটা জলচৌকির ওপর জমকে বসল দেশো। পঞ্চুর বউয়ের মুখখানায় ছায়া পড়ল।

বলি তাড়ি ভাঙ্গ খাই বলে ত বড় পটপটানি করে তোর বাপ মা। আর ইদিকে কি হচ্ছে খবর রাখিস? ভগ্নিপতির ওপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না পঞ্চুর বউয়ের। তবুও তার কথাগুনোর মধ্যে নিজস্ব সন্দেহের অনুরূপ গন্ধ থাকায় তার সমস্ত চৈতন্য যেন সশস্ত্র প্রহরীর মত উদগ্র

হয়ে উঠল। কি শুনেছ বল। সত্যি আমার এখন সময় নেই। শাউড়ী কি মনে করবে।

দেশো তখন মৎসশিকারীর মত সুতো ছাড়ছে। আর একটু খেলিয়ে তুললে মন্দ হয় না। সুতরাং আর একগাল মুড়ি গালে ফেলে চিবোতে লাগল। তারপর জলের ঘটিটা তুলে নিয়ে আলগোছে ছুঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিল। সকালবেলা বেরোলাম পাড়াটা ঘোরতে। ঐ যে ঐ আম বাগানে বাড়ী, তোদের গাঁয়ের চৈকিদার, কি নামডা যেন, ধলা না কি···।

পঞ্চুর বউ হেসে ফেলল। বুজিছি। ধলাই বটে! তা কি বলল তোমায় ধলা? হাসি চাপতে মুখে কাপড় চাপা দিল পঞ্চুর সে।

বলল অনেক কথা। দেশো আবার চুপ করে গেল।

তুমি বলবা না, আমি চললাম। দোরের দিকে পা বাড়াল পঞ্চুর বউ। আরে শোন্, শোন্। একেবারে ঘোড়ায় চড়ে আছিস যে। অগত্যা ফিরে দাঁড়াল পঞ্চুর বউ। লোকটা নেহাৎ অমন্দ কথা বলে না ছ্যাখলাম। বলল, তুমিও তোমার শ্বউরের এক জামাই আর পঞ্চাও আরেক জামাই। হলে কি হয়, তোমাতে আর পঞ্চাতে বামুন শূদ্দুর ফারাক।

সেটা আমিও জানি। তারপর কি বলল, বল।

নিঃশেষিত মুড়ির বাটিটা নামিয়ে রেখে প্রশ্নকারিণীর একেবারে গা ঘেঁষে সরে এলে দেশো। তারপর চারিদিক দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল। ঐ সাবি ছুঁড়িডারে নিয়ে খুব চলাচ্ছে পঞ্চু। আচ্ছা তুই ত খুব চাপা মেয়ে ছুটকী, এ কথা-ত কাউরে বলিস নি কোনদিন।

ও মুখ পোড়ার কথা বাদ ছাও। ও অমন অনেক কথা বলে। দেশোর রসাল আলোচনাটা হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করল পঞ্চুর বউ, কিন্তু মুখের হাসিটা প্রায় মিলিয়ে এল। এবার বেশ বিজ্ঞের মত কথা বলল দেশা। না রে ছুটকী, যা ভাবছিস তা নয়। সোয়ামীরে বেশী আস্কারা দেয়া ভাল নয়। ও ছুঁড়ীনডারে ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর। ওর চাল চলন ভাল নয়। আমরা মানুষ দেখলে চিনতে পারি। পঞ্চুর বউ চুপ করে রইল। দেশো পুনশ্চ বলল, ধলা আরও বলল···।

ধলা নয়, হেলা। এইবার গম্ভীরভাবে দেশোর ভুলটা সংশোধন করে দিল পঞ্চুর বউ।

হাঁ, হাঁ, হেলা। হেলা বলল, চৈকি হাঁকতে বেরিয়ে গাঁয়ের নাড়ীনক্ষত্তরের খবর রাখে সে। তা নইলে এত কাজ থাকতে জেলের ব্যাওসা কেন ধরল পঞ্চু, ত্বলের ছেলে হয়ে? চোর, জেলে স্যাকরা আর কুমোর, রাতে ওদের বড় বিক্কি হয়। সাবিরে ঘরে এনেই রাতচরা কারবার আরম্ভ করেছে।

পঞ্চুর বউয়ের অন্তস্থলটা ঘুলিয়ে উঠল। সংশয়, লজ্জা, অপমান যেন একসঙ্গে খাঁচায় আবদ্ধ পায়রার ঝাঁকের মত পাখা ঝটপট করছে। তবুও অপমানাহত নারীচিত্তের তলদেশ থেকে যে জিনিসটা আপনাহতেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, সেটা তার পিতৃকুলের বিশিষ্ট আত্মীয়ের সামনে তার নিজস্ব মর্য্যাদাহানির হুঃখ। বাপমায়ের সামনে হলে হয়ত সে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। কিন্তু এমন একটি লোক তার অগৌরবের কাহিনী গেয়ে চলেছে, যার শুভাকাঙ্খার মুখোস পরে তারই বাপমায়ের আর একটি সন্তানের সুখসৌভাগ্য যেন তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছে। এই গাঁয়েই আমার বাস

জামাইদাদা। তোমার সাবিরেও চিনি, তোমার ভায়রাভাইরেও চিনি আর ঐ হেলারেও চিনি। ও সব বানানো কথা, তা নইলে কুটুমমানুষকে ডেকে ও কথা কেউ বলে? দেশোর জেদ বেড়ে গেল।

ওরে যা রটে তার কতক বটে। নইলে......।

আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। অতকথা শোনাবার সময় নেই এখন। আমি যাচ্ছি।

মনের মধ্যে আলোড়ন থাকলেও শান্তভাবে ঘর থেকে বাইরে চলে এল পঞ্চুর বউ। ভগ্নিপতিকে অপমানও করল না, অথচ তার মন্তব্যের বিন্দুবিসর্গ স্বীকারও করল না। বাড়ীর উঠান দিয়ে রান্না-চালায় যাবে, এমন সময় পঞ্চু বাড়ী ফিরে এল। স্নান করে এলেও মাথার চুলগুনো রুক্ষ। গায়ে জড়ান ভিজে গামছা খানা শুকিয়ে মড় মড়ে হয়ে উঠছে। পরনের ভিজে কাপড়খানাও প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

সাবি কমনে? বউকে দেখে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু। অত্যন্ত কঠোর একটা উত্তর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলেও দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে সংযত করল বউ। গলা ছেড়ে ঝগড়া করবার পথটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েইত সে বাইরে এসেছে। বউকে নিরুত্তর দেখে জ্বলে উঠল পঞ্চু। কথা কানে যায়না না কি? জিজ্ঞাসার ঝাঁঝে চমকে উঠল সবাই। হঠাৎ যেন বাড়ীর উঠানে বাজ পড়েছে। দোরের বাইরে এসে উঁকি দিয়েই আবার ঘরে চলে গেল দেশো। রান্নাঘর থেকে বাইরে এল পঞ্চুর মা। কি, হয়েছে কি? পঞ্চুর মা জিজ্ঞাসা করল।

হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে বলল পঞ্চু।

নাইতে গিয়ে গাঁজা খেয়ে এয়েছে বোধ হয়। এইবার পঞ্চুর

বউ ফোঁস করে বলে উঠল। পঞ্চু আর রাগ সামলতে পারল না। কোনদিকে না চেয়েই বলল, গাঁজাই খাই আর গুলিই খাই দস্তুরমত নিজের পয়সায় খাই। কারুর বাবার পয়সায় ত খাই নে। সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে না বললেও পরোক্ষে আক্রমণাত্মক মনোভাব বশতঃই বেরিয়ে এল কথাটা। কিন্তু ঘরের ভেতর চাইতে গিয়ে দেশোর মুখখানা চোখে পড়তেই সে থতমত খেয়ে গেল। আর কোন কথা না বলে হনহন করে বাড়ীর বাইরে চলে গেল সে।

বাড়ীর সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। মাঝে মাঝে বন ঝোপ, মাঝে মাঝে পরিষ্কার। একরশি জমির পরেই গ্রাম্য রাস্তা। গরুর গাড়ীর চাকার দাগে তুধারের মাটি বসে সমান্তরালে গভীর রেখা চলে গেছে। রাস্তার তুধারে অধিকাংশ পড়ো জমি। মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড়। নবোদ্গত বাঁশের কোঁড় সবুজ তরুণ রসে ঢলঢলে হয়ে নতুন বিস্তৃতির লোভে পত্রপল্লব ছড়িয়ে দিয়েছে। ভিজে ভিজে গন্ধ।

ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছিল পঞ্চু। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সাবি কতকগুনো বাঁশপাতা ভেঙ্গে পঞ্চুদের ছাগলকে খাওয়াচ্ছে। পঞ্চু দাঁড়াল। কিন্তু সাবি সেদিকে লক্ষ্য করল না। রাস্তা তখন নির্জ্জন। বেলা গড়িয়ে আসছে। ঘুঘুর শ্রান্ত ডাকে বনভূমির স্তব্ধতা উদাস হয়ে উঠেছে।

সাবি! অকস্মাৎ নিজের নাম শুনে চমকে মুখ ফেরাল সাবি চোখের জলে মুখখানা প্রায় ভেসে গেছে। এ অবস্থায় গোপন করার চেষ্টা বৃথা। পঞ্চু বুঝল সাবি লজ্জা পেয়েছে। আরও বুঝল তার এই অবস্থাসঙ্কটের জন্য সেই দায়ী। তবুও যে তার দোষ কোথায় এবং সত্যই দোষ কিছু হয়েছে কি না আজও সে বুঝে পায় না।

তোরে আমি খুঁজছিলাম সাবি। সাবি পঞ্চুর মুখের দিকে চাইল।

একটা কথা বলব শুনবি ?

বল।

ভালমানুষ হয়ে মানুষের কি লাভ হয় বলতে পারিস ? সাবি কোন উত্তর খুঁজে পেল না। শুধু অনুমানে বুঝল মনে মনে কোন সংকল্প আঁটছে পঞ্চু। পঞ্চু বলল, গনেশ মারা গেছে আজ কদ্দিন হল। ভদ্দরনোকের ঘরে হলেও আজ কতকাণ্ড হয়ে যেত। আমার ত আর কিছু জানতে বাকী নেই। পেটে খেতে পাস নে, পন্নে ট্যানা জোটে না, তুই যে কি, যে শালান যা বলে বলুক, আমি ত জানি। কিন্তু এতে তোর ভালডা কি হচ্ছে শুনি ?

থাক পঞ্চুদা, ও সব কথা শুনতে আমার ভাল নাগে না।

পঞ্চু বুঝল সাবি ভয় পাচ্ছে। তাই বলল, ভাল কি আর আমারই নাগে ছাই! পাঁচজনা মিলে আমাদের ভাল থাকতে দেচ্ছে কই ? সাবির ব্যাথাতুর মুখখানা মুহূর্তের জন্য একটু রং বদলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম লজ্জায় একেবারে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। পঞ্চুর কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না।

পঞ্চু বলতে লাগল, তা নয় ত কি বল ? রাত্তির তুকুরে দয়া তোরে তাড়িয়ে দিল দেখে নিজের বাড়ীতে তোর জায়গা দিইছি-- আর রক্ষে আছে ? আজ নাইতে গিয়ে পড়ে গেলাম রমাপতি ডাক্তারের সুমুখে। শালা বলল কি জানিস ? বলল, কি রে পঞ্চা, সাবিরে ত ঘরে নিয়ে গিয়ে পোরলি। তা ওরে যে মরা বাঁচালাম সে ট্যাকাগুনো দেবে কেডা ? বললাম, কত ট্যাকা আপনার পাওনা আছে ডাক্তারবাবু ? বলল, তা হবে পঞ্চাশ যাট ট্যাকা। বিকেলে

আসিস্, খাতা দেখে বলব। আমি বললাম একমাস সময় দ্যান ডাক্তারবাবু। সব দেনা আপনার মিটিয়ে দোব।

সাবি আর চুপ করে থাকতে পারল না। সত্যিই কি তুমি অত ট্যাকা দেবে না কি আমার জন্যে?

দোব না মানে? নিজের মুখে কড়ার করিছি, দোব না? চরণের কাছে পেরায় চল্লিশ ট্যাকা পাওনা আছে, আরও গোটাকতক ট্যাকা ধার নোব।

অমন কাজ কর না পঞ্চুদা। কেন তুমি সাত তাড়াতাড়ি কথা দিতে গেলে? আমারে জিজ্ঞেস করলেও ত পারতে।

তোরে জিজ্ঞেস করে কি হবে?

তা ত বটেই। আমি গরীব ক্যাঙাল। তুটো পেটের ভাতের জন্যে তোমাদের বাড়ী পড়ে আছি; আমারে জিজ্ঞেস করে কি হবে বল? অত্যুগ্র অভিমানে সাবির কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

পঞ্চু বুঝল না ঠিক জিনিসটা। হঠাৎ এত রেগে গেল কেন সাবি? তবে কি রমাপতির পাওনার কথাটা মিথ্যা? হাসির চেষ্টা করে বলল পঞ্চু, আমায় কি অত বোকা পেলি না কি তুই? দস্তুরমত হিসেব দেখব, তবে ট্যাকা দোব।

হিসেব তার ঠিকই আছে। মিছে কথা বলে সে ট্যাকা নেবে কেন? আর পাওনা ট্যাকা ছাড়বেই বা কিসের জন্যে?

তবে? মাথা চুলকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু।

তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমার দেনা তুমি কেন শোধ করবে?

তবে কেডা শোধ করবে? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

যম। শব্দটা উচ্চারণ করেই ফিক করে হেসে ফেলল সাবি।

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চু এতদিনের অবরুদ্ধ আবেগের তাড়নায় গভীর অনুরাগের ছাপ বসিয়ে দিল তার ঠোঁটে।

যম শোধ করবে! কোন যম রে সাবি? উন্মত্তের মত এই দুটি জিজ্ঞাস্য বার বার উচ্চারণ করে সে সাবির মুখখানা অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিল।

ছাড়, ছাড়, কে কমেন থেকে দেখতে পাবে। ছিঃ, ছিঃ, তুমি কি পঞ্চুদা? কোনরকমে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ীর দিকে চলে গেল সাবি। সমস্ত শরীর তখনও তার ঠক ঠক করে কাঁপছে। তখনও হয়ত ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার অনেকখানি বাকী ছিল সাবির। তাই বড়রাস্তা থেকে চন্দরের বাড়ী যাবার পথে, যেখানে বড় একটা বেলগাছ আর কতকগুনো আগাছা খানিকটা জায়গা আড়াল করে রেখেছিল, ঠিক সেইখানে তার পথ আগলে দাঁড়াল দেশো। মোটা মোটা লোভাতুর ঠোঁটদুটোর ফাঁক দিয়ে কদর্য্য হাসি হেসে চোখ টিপে বলল, এইবার কি হয় প্রাণ। সব দেখতে পেইছি। বেশী চালাকী কর, এখুনি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব। বাবা, এ ভূতের চোখ! এরে ফাঁকি দিয়ে ডুবে ডুবে জল খাবা তোমরা—ওরে আমার বনের পাখী!

অন্য সময় হলে দেশোর গালে চড় কসিয়ে দিত সাবি। কিন্তু আজ সে নিজেকে এত দুর্ব্বল মনে করল, যে চড় মারা ত দূরের কথা, জিভটা পর্য্যন্ত যেন তার অসাড় বলে মনে হল।

সাবির কাছে কোন জবাব না পেয়ে সাহস বেড়ে গেল দেশোর। আরে ভড়কাচ্ছ কেন হে? আমি কি আর ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির? যার যা প্রাণ চায়, চালাও। আমি কুটুম মানুষ, দুদিনের জন্যে এইছি, একটু ভাগ পেলেই হল।

অত্যন্ত অশ্লীল ইঙ্গিতে সম্বিৎ ফিরে পেল সাবি। দুঃখের চরম-সীমায় এসে দাঁড়ালেও, এত বড় নির্লজ্জ আঘাত কোনদিন তাকে কেউ করেনি। কার মুখ দেখে সে আজ সকালে উঠেছিল, যে আজ সারাটা দিন ক্রমাগত লাঞ্ছনা ভোগ করছে! পরের আশ্রয়ে এসে বাস করলেও, পরাশ্রয়ের গ্লানি তখনও তার মনকে ঠিক কলুষিত করতে পারে নি। পঞ্চুকে সে ভালবাসত, সেই সূত্রে পঞ্চুর মাকেও ঠিক নিজের মায়ের মতই দেখত। সেই জন্য অসুস্থতা কেটে গেলেও পঞ্চুর মায়ের অনুরোধে যাই যাই করেও সে নিজের বাড়ী ফিরতে পারে নি।

তাই হয়ত দেশোর কথায় চিৎকার করে হৈ চৈ করতে পারল না সাবি। দেশোর কাছ থেকে একটু পিছিয়ে গিয়ে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলল, পথ ছেড়ে দাও যদি ভাল চাও। তা নইলে চেঁচিয়ে নোক ডাকব। কুটুম মানুষ কুটুমের মত থাক। বেশী বাড়াবাড়ি কর না। সাবির ভাবগতিক দেখে রসিকচূড়ামণি দেশো ভয় পেয়ে গেল ও বিনা বাক্যব্যয়ে পথ ছেড়ে দিল।

ঠিক সেই সময় বাড়ী থেকে বাইরে এল চন্দর। বলি তোমাদের ব্যাপার কি গো বাপু? সাবি কমনে গিইলি র‍্যা? কুটুমের পো, তুমি এইখেনে, পঞ্চা কম্‌নে? রান্নাবান্না হয়ে গ্যাল, আর তোমরা বাইরে বাইরে ঘোরছ? স্নান সেরে তখনও খেতে বসতে পারছিল না চন্দর।

পঞ্চুরে খোঁজতেই ত এয়েলাম। ছ্যাখলাম উই বাঁশবাগানডার ওখানে কথা কইছিল। তারপর কমনে যে গ্যাল, আর দেখতে প্যালাম না। সাবি বাড়ীর ভেতর চলে গেল। দেশোর হাত থেকে বাঁচলেও তার কুৎসার হাত থেকে রক্ষা পাবার আশা সে ছেড়ে

দিল। চন্দর আর দেশোর দুপুরের খাওয়া হয়ে গেল। তখনও পঞ্চুর দেখা নেই।

তোরা খেয়ে নে বাপু। বউ আর সাবি দুজনকে ডেকে বলল পঞ্চুর মা।

তুমি খেয়ে ন্যাও।

সাবি বলল, আমার খাওয়াটাই কি বড় হল বউদি?

বড় ছোট জানি নে। তবে শুকিয়ে থাকবার নোকের ত অভাব নেই, তাই বলছেলাম। তা তোমার যদি গলা দিয়ে না নাবে, তা হলে থাক।

থাক, কাউর খেয়ে কাজ নেই। আমি হাঁড়ি তুলে থুচ্ছি। রান্নাঘরে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল পঞ্চুর মা।

ভাদ্রের মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য্য গড়িয়ে গেল, তখনও পঞ্চু ফিরল না। হুঁকো হাতে করে স্ত্রীর কাছে এসে বসল চন্দর। কি হল বল্ দিনি। কমনে গ্যাল ছোঁড়াডা?

আছে কমনে। তবে চৌপর দিন পেটে ভাত গ্যাল না।

তেখুনি বলেলাম ও আপদ ঘরে ঢোকাস্ নে। তুই একেবারে গলে পড়লি সোহাগে। চন্দরের হাঁটুতে একটা চিমটি কেটে ইঙ্গিত করল পঞ্চুর মা। রান্নাচালার ছেঁচা বেড়ার বাইরেই এক হাত ব্যবধানে শুয়ে ছিল সাবি। আরে থো। কানে কানে ফিসফিস করে কি বলল চন্দর। শুনে চাপাগলায় প্রতিবাদ করল পঞ্চুর মা। দূর্। ও সব মিছে কথা।

নিজের চোখে দেখেছে দেশো। তা নইলে গোডার ভূত পালাল কেন? তা আমার মুখের গোড়ায় ঘুজুর ঘুজুর না করে একবার খুঁজে দেখলে হত না? পঞ্চুর মা বিরক্তি জানাল। হুঁকোয় গোটা

কতক টান দিয়ে উঠে পড়ল চন্দর। বলল, দেখি একবার বাজার টাজারগুনো খুঁজে। যত জ্বালা সব ত আমার। এত পাপও করেলাম !

সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এমন সময় ফিরে এল পঞ্চু। চন্দর একবার চেয়ে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। শুধু পঞ্চুর মা চুপ করে থাকতে পারল না। এ সব কি কাণ্ড বল্‌ত পঞ্চা? সারাদিন খাওয়া নেই। নেয়ে এসে সেই যে চলে গেলি,…।

কি আছে দে, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই।

কমনে যাবি আবার? চৌপর দিন ঘুরেও আশ মেটছে না।

তবে তুই বকর বকর কর, আমি চললাম। জোয়ার এসে গ্যাল এত বেলা।

না, না বস। আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।

কোনদিকে না চেয়ে দলাপাকান ঠাণ্ডা ভাত রাক্ষসের মত নিঃশেষ করে ফেলতে লাগল পঞ্চু। সকলেই চুপ করে রইল। শুধু ঘরের মধ্যে দেশোর সর্ব্বশরীর ঘেমে উঠল। পঞ্চুর উদাসীনতা যেন তার গায় ছুঁচের মত ফুটছে। অথচ মনে মনে চেষ্টা করেও কথা বলবার সাহস সে খুঁজে পেল না। সত্বর খাওয়া সেরে সেঁউতির মধ্যে হুঁকো কলকে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, এমন সময় সাবি তাকে ডাকল। কাল সকালে তোমার ফিরতে দেরী হবে পঞ্চুদা? আমতা আমতা করে উত্তর দিল পঞ্চু, না, হ্যাঁ। তা একটু হতে পারে।

কাল সকালেই আমি চলে যাব, তাই বলছি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পঞ্চু। তারপর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। কাল তুই বাড়ী যাবি সাবি? পঞ্চুর মা জিজ্ঞাসা করল।

তা ছাড়া আর কমনে যাব খুড়ী?

তা বলিনি মা। বলছি কালকেই যাওয়া ঠিক করলি ?

হাঁ খুড়ী। আর কদ্দিন তোমাদের কষ্ট দোব ?

ভাদ্দর মাসে নোক বাড়ী থেকে শেয়াল কুকুরও তাড়ায় না। তা যা ভাল বুঝিস কর। আমি আর কি বলব।

পঞ্চুর মায়ের স্নেহ, তার মনের ব্যথা সবই জানত সাবি। তবুও সে চুপ করে রইল।

২

সাবি নিজের ঘরে ফিরে এল। আড়ম্বরহীন পুনর্যাত্রা। রিক্ত-সর্ব্বস্ব বিধবার জীবনে এ দোর থেকে ও দোর, শালগ্রামের শোয়া-বসা। তা হলেও সে ভুলতে পারবে না পঞ্চুর মাকে, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠানর মত তার যত্নটুকুকে। নতুন একখানা কাপড়, সের পাঁচেক চাল, পাঁচটা টাকা, সেই সঙ্গে সংক্ষিপ্ত গুটিকতক কথা। না করিস নে মা, কিছু মনে করিস নে। কাল থেকে ভাল করে খাস নি। শুকন মুখে তোরে পেঠিয়ে দেলাম এ্যাদ্দিন কাছে থুয়ে।

সাবির পুনর্যাত্রা। নগন্য পল্লীগ্রামের ইতিহাসের পাতায় ছোট্ট একটু কালির দাগ। তবুও সেই তুচ্ছ ব্যাপারের সূত্র ধরে গুণগুণ করে উঠল মধুচক্র। গুণ গুণ করে উঠল তুলে পাড়া, বাগদি পাড়া, হাড়ি পাড়া, জেলে পাড়া, মোড়ল পাড়া এমন কি বামুন পাড়া পর্য্যন্ত। টুথ্‌ব্র্যাশ দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে শুনল ভূপতি মজুমদার। ডাক্তারখানায় ধূনো, গঙ্গাজল দিতে দিতে শুনল রমাপতি ডাক্তার।

অপগতবর্ষা, খোলা আকাশের তলায়, তীব্র রোদ আর পাটপচা বিষাক্ত বাতাসের দূষিত বাষ্পে, খানায় ডোবায়, ঝোপে জঙ্গলে

কিলবিল করে উঠছে মৃত্যুবীজ, ম্যালেরিয়াবাহী মশকবাহিনী। পল্লীজীবনের বর্ষচক্রে চন্দ্রসূর্য্যের মত অনিবার্য্য এদের আবির্ভাব।

দার্জিলিংএর সিন্‌কোনা আর জাভার কুইনিন্, ডাইল্যুটেড্ নাইট্রিক্ এ্যাসিড্ আর আলকাল্যাইন্ মিক্‌শ্চারের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকে রমাপতি ডাক্তার। ম্যালেরিয়া লক্ষ্মীর কৃপা ঃ ভাত, কাপড়, সোনাদানা, পাকাবাড়ী, বিশবিঘে আমনধানের জমি। বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া। একবার আশ্রয় করলে ন' মাসের ধাক্কা। দুশ গ্রেণ কুইনিনের সঙ্গে খাঁটি গঙ্গোদক মেশাতে পারলেই রুগীর ভিটে-মাটিতে টান ধরে। তাঁবাদি হলেও দুধে হাত পড়ে না।

খবর পেয়েই উতলা হয়ে উঠল রমাপতি। দয়াকে ডাকতে লোক পাঠিয়ে নিজেই অর্দ্ধেক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘণ্টাখানেক পরে দয়া এসে দাঁড়াল রমাপতির সামনে।

ডেকেছ ডাক্তার বাবু?

হাঁ। না ডাকলে ত তুমি আসবে না। অভিযোগের অর্থটা ঠিক বুঝল না দয়া।

বুঝতে পারলে না? এর মধ্যেই ভুলে গেলে?

রমাপতি বলল। ঘরের পয়সা খরচ করে যে সাবিকে বাঁচালাম, সে টাকাগুনো কে দেবে শুনি? তোমার মুখের কথায় তাকে ওষুধ দিলাম, তোমারও কি একবার আসা উচিত ছিল না এতদিন?

আ মোর কপালখানী! কপালে মৃদু করাঘাত করে খিলখিল করে হেসে উঠল দয়া। বেশ নোকেরই ধরেছ বাবু। তা এই জন্যিই কি আমারে ডেকে পেঠিয়েছ? রমাপতির উৎসাহ কমে গেল। মুখখানা গম্ভীর করে বলল এই জন্যেই তোমাদের কোন উপকার করতে নেই। কাজ মিটে গেলে আর তোমাদের কিছু মনে থাকে

না। বার বার দোষারোপে দয়ার আর ধৈর্য্য থাকল না। ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে হাত মুখ নেড়ে বলল, আমি তোমার ওষুধও খাই নি, আর ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা আঙ্গুর বেদানাও খাই নি। যারে খেইয়েলে তার কাছে গেলেই পার! এই জিনিসটাই ঠিক চাইছিল রমাপতি। যাবই ত। যাব না কি ছেড়ে দেব নাকি? এখুনি যাচ্ছি আমি পঞ্চার বাড়ী।

পঞ্চার বাড়ী চললে, সাবি কি সেখানে আছে না কি? নেই? তবে কোথায় গেল আবার? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল।

কমনে আবার যাবে? ঝঁ্যাটা নাথি খেয়ে আবার নিজের ঘরেই ফিরে এয়েছে। বলে পরভাতি হওয়া ভাল, তবু পরঘরী ভাল নয়।

চোখতুটো বড় বড় করে যেন আকাশ থেকে পড়ল রমাপতি। বল কি গো? পঞ্চার বাড়ী থেকে চলে এসেছে সাবি? তা লাথি ঝঁ্যাটা মারল কেন? বেচাল টেচাল কিছু করেছিল বুঝি?

যম জানে কি করেল? ও সব কথায় আমি থাকি নে বাবু।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ ধরনের আলোচনায় ডাক্তারের সম্ভ্রমে না বাধলেও দয়ার লজ্জা করছিল। দয়া বলল, আমার এখনও সব কাজ পড়ে রয়েছে ডাক্তারবাবু, আমি চললাম।

আর আমার ডাক্তারখানায় দেখে এস রুগী গিস্‌গিস্ করছে। তবুও আমি কাজ ফেলে ছুটে এসিছি। মাথার উপর ঘনবিন্যস্ত আগাছার ডাল থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে আবার বলল রমাপতিঃ পঞ্চার কাছ থেকে চলে গেছে সাবি, আমিও শুনিছি। কিন্তু তোমার মুখ থেকে না শুনলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না বলেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। এ গাঁয়ের লোক না হলেও আমি তোমাকে চিনি। সাবেকী মানুষ তুমি।

তোমার মনে দয়াধর্ম্ম বলে জিনিস আছে। বলতে বলতে চেয়ে দেখল রমাপতি দয়ার মুখ থেকে বিরক্তির সমস্ত চিহ্ন সরে গিয়ে আত্মপ্রসংশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চারিদিকে চেয়ে দেখে আবার বলতে লাগল রমাপতি, তুলের মেয়ে, নিজের বাড়ী থাকল কি কার ঘরে গিয়ে উঠল তাতে আমার ভারি বয়ে গেছে। জান ত আমার সংসারে লোকের বড় অভাব। ছোট ছোট কাচ্চাবাচ্ছা, বউয়ের শরীরও তেমনি। সেই আশা করেই সাবিকে অত কষ্ট করে রোগ থেকে টেনে তুললাম। তা নইলে আর কি বল? তাই বলছিলাম, তুমি যদি তাকে বলে কয়ে রাজী করাতে পার, আমারও উপকার হয়, আর সেও তুটো খেতে পায়। দয়া কোন উত্তর দিল না। কেমন? বলবে ত? আবার বলল, রমাপতি।

তা বলবানি, যদি দেখা হয়।

বেশ, তাই বল। যা বলবার বললাম, এখন তোমার বিবেচনা।

৩

বাড়ীতে ফিরে এসে আরও বিপদে পড়ল সাবি। চাল দিয়ে জল পড়ে ঘরের মেঝেয় সারি সারি গর্ত্ত হয়ে গেছে। দাওয়ার চালের খুঁটি ভেঙ্গে যাওয়ায় চালখানা হুমড়ী খেয়ে পড়েছে। তার ওপর চতুর্দ্দিক থেকে বুনো লতা এসে ঘরখানাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। উঠানে একহাঁটু কালকসিন্দে, বনকচু আর বিছুটির জঙ্গল। আমকাঠের দরজাটা ঠেলতেই কপাট থেকে উঁই আর মাটি ঝরে পড়ে জরাজীর্ণ চেহারা বেরিয়ে পড়ল। কোন রকমে ঘরদোর খানিকটা পরিষ্কার করে যখন স্নান করে এল সাবি, বেলা তখন প্রায় গড়িয়ে এসেছে। খাওয়া দাওয়া সারতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তু-মাস প্রায়

বাড়ী ছাড়া। কেমন যেন নতুন নতুন মনে হচ্ছিল সব। একলা থাকার অভ্যাস থাকলেও, আজ এই নিঃসঙ্গতা তার মনের ওপর বোঝার মত চেপে বসতে লাগল। মেয়ে বেঁচে থাকতে মেয়ের চিন্তা তার মনটাকে শতপাকে জড়িয়ে রেখেছিল। মেয়ে মারা যাবার পর দুঃসহ শোকের মধ্যে তার সব শূন্য বলে মনে হল। তখনও নিরালম্ব মন তার আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, অন্ধ মানুষ যে ভাবে পথ খোঁজে। তারপরই সে নিজে পড়ল রোগে। অক্লান্ত সেবা করল দয়া। ওযুধ এমন কি পথ্য জুগিয়ে বাঁচিয়ে তুলল রমাপতি ডাক্তার। এ বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় তার এইটুকু পর্য্যন্ত এসে থেমে গেছে। তারপর একটা প্রকাণ্ড ছেদ। দু মাস যেন দু যুগ। ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘর, মাথার বালিসটা তুলোর চ্যাংড়া। ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। হঠাৎ টর্চ্চের তীব্র আলোয় ঘরের ভেতরটা ঝলসে উঠল। কেডা গো? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

আমি তারা। ঘুমিয়ে পড়লি না কি সাবি? না দাদা, ঘুমুই নি, এস। সাবি উঠে ঘরের দোর খুলে দিল।

তারা বলল, তোর ঘরে আলো নেই?

না।

হ্যাদ্ ছ্যাখ। বাড়ীর পাশেই থাকিস সাবি, একবার ডেকে বললেও ত পারতিস? দ্যাঁড়া। আমি আলো নিয়ে আসছি। তারা চলে গেল, ও একটু পরে একটা লম্প এনে সাবির ঘরে রেখে আলো জেলে দিল। খাওয়া দাওয়া হয়েছে? দোর গোড়ায় আসন পিঁড়ি হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল তারা। হাঁ, সাবি বলল।

বেশ। আমরা মনে ভেবেলাম তুই আর এলি নে। তা বেশ ত ছিলি, চলে এলি কেন? তারা বলল।

তারার ওপর বিশেষ ভক্তি না থাকলেও, আজ তাকে খুব খারাপ লাগল না সাবির।

নিজের ঘর দুয়োর ফেলে থুয়ে আর কদ্দিন পরের বাড়ী পড়ে থাকব তারা দা ? কেরোসিনের আলোর কম্পমান শিখায় সাবির মুখখানার সমস্তটা স্পষ্ট দেখতে পেল না তারা। তবুও কোনরকমে জবাব দিল, সে ত ঠিক কথা।

ঠিক কথা নয় ? খাই না খাই বাপের ভিটেয় মালসা মাথায় দিয়ে বসে থাকি। কি বল তারাদা ? আলবাৎ। সে কথা পাঁচশবার। ভাল কর, মন্দ কর, যাই কেন কর না, নিজে স্বাধীন থেকে করা ভাল। যে শালা আসবে এইখেনে আসুক। তুই কেন তার ঘর বয়ে যাবি সাবি ? এতে পাড়ার বদনাম হয়। তারার কথায় মনে মনে লজ্জা পেলেও, সামান্য একটু হাসি গোপন করতে পারল না সাবি। হাসিস নে সাবি। আমি হক্ কথাই বললাম। না তারাদা। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু আমার একটা কথা রাখবা তুমি ?

বল্ কি কথা।

ভাল মন্দ আমারে যাই মনে কর না কেন. পেট চালাবার একটা কিছু না করলে ত আর চলে না। এ্যাদ্দিন যা ছিল বেচে কিনে খেইছি। এইবার তোমরা একটু না দেখলে কমনে যাব বল ?

একটা কথা বলব সাবি, সত্যি কথা বলবি ? তারা জিজ্ঞাসা করল।

কি কথা বল।

পঞ্চা তোরে খরচ পত্তর দ্যায় না ?

ছিঃ তারাদা। তোমারে না দাদা বলি। আমারে হতে দেখেছ তুমি। আর তুমি এই কথা বলছ ?

আমি ত বলিনি সাবি, আমি জিগ্যেস্ করছি।

বেশ। তা হলে আর জিগ্যেস্ করো না। এখন আমি যা বললাম তার ত কিছু বললে না। তারা একটু শুকিয়ে উঠল। আলোচনাটা যেদিকে ঘুরিয়ে আনতে চেয়েছিল, সেদিকে ঠিক গেল না।

তা বেশ ত। এত ভাল কথা। সাবি বুঝল তারা এবার ওঠবার চেষ্টা করছে। তোমার ত অনেক ধান তারাদা। চাল করে তুমি কৌতুকপুরের মহেশগঞ্জের বাজারে বিক্রী কর। আমারে যদি চাট্টি চাট্টি ধান দাও, আমি চাল করে দিতে পারি।

তারা বলল, তোর ত ঢেঁকী নেই সাবি।

একটা ঢেঁকী আর ছোট্ট একখানা চালা তোমায় করে দিতে হবে তারাদা। ত্থ মাসের মধ্যেই আমি তোমার দেনা শোধ করে দোব।

হাই তুলে, আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়ল তারা। তারপর বলল, আজকাল একটা ঢেঁকীর দাম কত জানিস? আর কি সেকাল আছে? আমি বলি কি, তুই বরং দয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত কর। তার ত ঢেঁকী রয়েছে। আর ধানের কথা বলছিস? আমার কডাই বা ধান? তবে নতুন ধান উঠুক, তখন দেখা যাবে। নে, তুই তুয়োর দিয়ে শুয়ে পড়, আমি চললাম।

দয়া দিদিমা ভিন পাড়ার মানুষ। তা ছাড়া আমার ঘরে আর সে আসবে না।

তার তুয়েরে গিয়ে ওঠলে পাড়ার বদনাম হবে না? ঘর থেকে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বলল তারা, তুই বড্ড কথা ধরিস্ সাবি, এইজন্যে তোর কারুর সঙ্গে বনে না। দয়া না থাকলে তোর কি ত বল দিনি? আর তার নামে তুই ঐ কথা বললি?

কি আবার হত ? মরে যেতাম, এইত ? এর চাইতে সে ঢের ভাল ছিল তারাদা।

ও তোর রাগের কথা সাবি। আর যারে যা বলিস, দয়া আর রাম ডাক্তারকে কিছু বললে তোর অধর্ম্ম হবে মনে জানিস।

আমি কাউকে কিছু বলব না তারাদা। তবে তুমি বুঝি ঐ কথাডা মনে করিয়ে দিতে রাত দুকুরে এখানে এয়েলে ? কথাটা বলে তারার মুখের দিকে চাইতে গিয়ে আর তাকে দেখতে পেল না সাবি।

সাবি উঠে দোর বন্ধ করে দিল। তারাকে সে ভাল রকমই চিনত। জানত, তার হাত দিয়ে কখন জল গলে না। তবুও নিজের দুর্গতির লজ্জার চেয়ে তার জ্বালাটা যেন বেশী পোড়াতে লাগল তাকে। দুটি পেটের ভাত। বৎসরান্তে দু' এক খানা কাপড়। মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয়। এটুকুও তাকে দেবেন না ভগবান। লম্প জ্বলছে দপ দপ করে। মাঝে মাঝে হাওয়া লেগে কেঁপে উঠছে তার শিখা। ভাঙ্গা ঘরের দেওয়ালে কাঁপছে অন্ধকার। কেঁপে কেঁপে ভেঙ্গে পড়ছে সাবির পৃথিবী। হঠাৎ তার মনে পড়ল গনেশকে। অনেকদিন আগেকার একটা কথা। এই ঘরেই ; গনেশ বলেছিল সাবিকে, আমি যদি মরে যাই তুই-কি করবি ?

তুমি মরবা কেন, তার আগে আমিই মরব।

ধর যদি আমিই মরি। গণেশ বলেছিল।

কি আর করব! খুকির বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই রাখব। উত্তর শুনে হেসেছিল গনেশ।

হাসলে যে ?

তার আগে তোর নিজের ঘরে ছেলে মেয়ে গিজ গিজ করবে।

বারে! হবে কি করে?

নিকের বরের সঙ্গে ঘর করলেই হবে।

ছ' আনি দুলেদের মেয়ে বউরা কোন দিন নিকে করে নি। এক-ঝটকায় গনেশকে সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিল সাবি।

নিকে করবি নে? আবার জিজ্ঞাসা করছিল গনেশ।

না, না, না, কেন ভ্যান্ ভ্যান্ করছ?

সেদিনকার সেই দর্পিত উক্তি হয়ত আজও মিশিয়ে আছে ঘরের কোণের অন্ধকারে। তারই বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল গনেশ। হয়ত চরম তৃপ্তিতেই ঘুমিয়েছিল।

সাবি।

কেডা? পঞ্চুদা?

হ্যাঁ। দোর খোল্।

সাবি দোর খুলে দিল। পঞ্চু ঘরে এসে নিজেই দোরের খিলটা আটকে দিল। তারপর সাবির দিকে এগিয়ে এসে বলল, তোর বুঝি ভয় করছিল সাবি? করবে বৈ কি! নোকে বদ নাম দেবে, বলবে সাবিত্রীর চরিত্তির নষ্ট হয়েছে।

তুমি কি মদ খেয়েছ পঞ্চুদা?

না ত। বিশ্বাস না হয় মুখ শুঁকে দেখ। বলে সাবির মুখের অত্যন্ত কাছে মুখটা নিয়ে গেল পঞ্চু। হাত দিয়ে পঞ্চুর মুখখানা সরিয়ে দিয়ে বলল সাবি, মুখ শুঁকতে হবে না। তোমার ভাব গতিক দেখেই বুঝছি। সাবির মুখের দিকে চেয়ে উন্মত্তের মত হেসে উঠল পঞ্চু।

চুপ চুপ। কি করছ পঞ্চুদা? ছিঃ।

চুপ করে মুখ বুজে ত ছেলাম এতদিন। তাতে হল কি কচু?

ঘরে ট্যাঁকবার উপায় নেই। সাতখানা করে নাগিয়ে সরে পড়েছে দেশো। পাড়ায় ত আগে থেকেই টি টি উঠে গেছে। উঠুক। বড় বয়েই গ্যাল। কোন্ শালা কি করে দেখি। আমি আর যাচ্ছিনে তোর ঘর থেকে।

পাড়ার নোক ত তোমারে একলা বলছে না পঞ্চু দা। আমারেও বলছে। তবু আমি পালিয়ে এলাম কেন?

তুই পালিয়ে এলি বৌয়ের ভয়ে।

তোমার বউকে তুমি ভয় কর পঞ্চুদা। আমি পালিয়ে এসেছি তোমার ভয়ে?

আমার ভয়ে?

হাঁ, তোমার ভয়ে। তোমার তুটি পায়ে পড়ি তুমি বাড়ি যাও। আর আমার সব্বনাশ কর না। পঞ্চুর পা তু'টো ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সাবি। সাবির কান্না দেখে পঞ্চুর আন্তরাত্মা বিদ্রোহী ঘোড়ার মত তুর্ব্বার হয়ে উঠল। তু হাত দিয়ে সাবিকে শক্ত করে জড়িয়ে একেবারে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল।

সব্বনাশ আমি করব না সাবি। সব্বনাশ যদি হয় তোর নিজের দোষেই হবে। তোর মনে নেই গনেশের সঙ্গে বিয়ের পরও তুই কতদিন আমাকে নিকে করতে চেয়েছিলি। তখন করিনি, এখন করব। বল্ তুই রাজী আছিস কি না?

পঞ্চুর বুকে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সাবি। তারপর মুখ তুলে বলল, না।

পঞ্চুর হাত তু খানা শিথিল হয়ে সাবিকে মুক্ত করে দিঁল।

বেশ। তা হলে চললাম।

হঁা যাও। পঞ্চু চলে যেতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সাবি।

ঘরের কোণের অন্ধকার হয়ত এবারও সাক্ষী রইল সাবির বিশ্বস্ততার। কিন্তু সাবির আর গনেশের মুখখানা মনে না পড়ে পঞ্চুর মুখখানাই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

৪

সাবি যে দিন চলে গেল, সেইদিন বিকেলের দিকে দেশোও চলে গেল। যাবার আগে শ্যালিকাটির ভাল করে চোখ কান দোটাতে গোটাকতক উপদেশ দিয়ে যেতে ভুলল না। খুব শক্ত হবি ছুটকী। ভাতার আর কুকুর নাই দিলে মাথায় ওঠে। ও সাবি ছুঁড়ীডারে বড় সোজা মনে করিস নে। ঠিক সময় বুঝে সরে পড়ল। আর ত এখানে জুৎ হবে না। পঞ্চুর বউ কোন উত্তর দিল না। প্রতিবাদও করল না। শুধু চোখের কোন বয়ে টপ টপ করে ফোঁটাকতক জল গড়িয়ে পড়ল। ভগ্নিপতির আদ্যান্ত পরিচয় জানা থাকলেও অবস্থা বৈগুণ্যে তাকেই যেন পরমাত্মীয় বলেই মনে হল। সন্ধ্যার পর পঞ্চু এল, কিন্তু না জিজ্ঞাসা করল দেশোর কথা, না কথা বলল বউয়ের সঙ্গে। রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে যথারীতি বেরিয়ে পড়ল। শ্বশুরশাশুড়ীকে খাইয়ে নিজের ভাতটা ঘরের পেছনে আঁস্তাকুড়ে ঢেলে দিয়ে গেল পঞ্চুর বউ। সমস্ত রাত ধরে অনেক কিছু তোলাপাড়া করে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। পঞ্চুর মা উঠে বাসি পাট সারল, চন্দরকে খেতে দিল, তারপর অবশিষ্ট ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে কাজে চলে গেল।

বেশ একটু বেলা করে ঘুম ভাঙ্গল পঞ্চুর বউয়ের। চেয়ে দেখল রোদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ। মনে হল, সারা রাত যেন জ্বর ভোগ করে উঠে আসছে। অবশ হাত-পাগুনো টেনে টেনে বাকী কাজ

সেরে ফেলল, তখনও পঞ্চুর দেখা নেই। দাওয়ার ওপর পা ছড়িয়ে বসে সে উঠানের দিকে, উঠানের ওপারে বেলগাছ, তার ওপর খানিকটা খোলা আকাশ, আশে পাশে বাঁশের সারি অবসন্ন মন আর ক্লান্তিজড়ান চোখে সব কিছুই দেখতে লাগল।

সকাল বেলা গালে হাত কেন লো? কি অত ভাবছিস? সারা গায়ে মাথায় তেল মাখা, মাথার চুল গোঁজ খোঁপা করে জড়ান, মাটির কলসী কোমরে নিয়ে বাড়ীর পেছন দিকের পথ ধরে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল হেলার বউ এবং শূন্য কলসীটা মাটিতে নামিয়ে রেখে, হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত কাপড় তুলে, পঞ্চুর বউয়ের পাশে বসে পড়ল। নাইতে যাচ্ছ? পঞ্চুর বউ জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ যাচ্ছি। পোড়া গতরে আর কি কামাই আছে? তুই বুঝি এই ঘুম থেকে উঠলি? তারপর চোখ টিপে একটু রসাল হাসি হেসে বলল, তা উঠিব বৈ কি লো! কদ্দিন কাছ ছাড়া ছিলি উপুসী ছারপোকা হয়ে। অতি দুঃখেও একটু হাসি এলো পঞ্চুর বউয়ের। কিন্তু কোন কথা বলল না। হেলার বউ বলল, মনডা ভার ভার কেন লা? শরীল ভাল নেই না কি? পঞ্চুর বউয়ের মনে এতটা বুভূক্ষা জমেছিল, যে হেলার বউয়ের এই গায়ে পড়া আত্মীয়তায় সে চোখের জল আর চেপে রাখতে পারল না। হেলার বউ ঠিক এইটাই চাইছিল। কি হয়েছে বউ? কাঁদছিস্ কেন বল ত? হেলার বউ জিজ্ঞাসা করল।

মনডা ভাল নেই দিদি।

হেলার বউ একেবারে গলা জড়িয়ে ধরল পঞ্চুর বৌয়ের। লক্ষ্মী দিদি আমার, যদি লুকুবি আমার মাথা খাবি। এমন সোনার শরীল তোর, এই কাঁচা বয়েস, দস্যির মত সোয়ামী আর তোর

চোখে জল! না দিদি, আমার আবার শরীল আমার আবার বয়েস। পঞ্চুর বউয়ের চোখ দিয়ে আরও জল পড়তে লাগল।

ছিঃ দিদি। কাঁদতে নেই সকালে। বলেই নিজের কাপড় দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিল হেলার বউ। নে, ওঠ দিনি। চ। আমার সঙ্গে বিলে একটা ডুব দিয়ে আসবি চল। তেল নিয়ে আয়, মেখিয়ে দেই চুল গাছাটায়। অগত্যা নারকোল তেলের বাটি আর চিরুনী নিয়ে এল পঞ্চুর বউ।

পঞ্চুর বউয়ের মনে হল, এত যত্ন জীবনে কেউ করে নি তাকে। কথায় বলে 'আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে বন ভাল।' পরিপাটি করে তেল মাখিয়ে, চুল আঁচড়ে, তাকে সঙ্গে করে স্নান করতে নিয়ে গেল হেলার বউ। রাস্তায় এসে হেলার বউ জিজ্ঞাসা করল, পঞ্চা ঠাকুরপো কমনে? যম জানে। ওর কথা আর আমায় জিগ্যেস্ কর না দিদি। এবার আর কাঁদল না পঞ্চুর বউ।

একটা কথা তোরে জিগ্যেস্ করব বউ। বল্ সত্যি বলবি? সরাসরি হেলার বউয়ের স্নেহের এলাকায় এসে পড়ায় আন্তরিক সম্মতি জানাতে একটুও দ্বিধা করলনা পঞ্চুর বউ। বল কি বলবা।

পঞ্চাঠাকুরপো আর তোরে ভালবাসে না, না? সহচরীর এতটা সমবেদনার আভাস পেয়েও মুখের স্বাভাবিক রংটা আর বাজায় রাখতে পারল না পঞ্চুর বউ। কি লো? কথা বলছিস নে যে!

কি আর বলব দিদি, আমার কপাল! পঞ্চুর বউ বলল।

ভাল মান্‌সের কাল নেই লো, ভাল মান্‌সের কাল নেই। কেঁদে আর পায়ে মাথা কুটে কি আর বারমুখো মিন্‌সেদের বশ করা যায়? পঞ্চুর বউ যেন অকুলে কুল পেল। সোৎসুক দৃষ্টিতে হেলার বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, সত্যি দিদি? কোন তুক তাক

ওষুধ টষুধ দ্যাও না ভাই, তেমোর ছুটো পায় পড়ছি। ছোটবেলায় শুনেলাম, শনি মঙ্গলবারে পয়লা ঘানীর তেল মেখিয়ে কেডা যেন বশ করেল সোয়ামীরে।

পাড়াগাঁয়ের নিম্ন শ্রেণীর মেয়ে হলেও খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মন ছিল হেলার বউয়ের। পঞ্চুর বউয়ের গায়ে একটা আদরের ঠেলা দিয়ে বলল, দূর ছুঁড়ী, ও তুকতাকের কম্ম নয়, ওসব উটকো নোককে বশ করা। তুই যদি শক্ত হস্ ত দেখবি ও তোর চাটবে।

আর কি করে শক্ত হব দিদি? ঝগড়া কোঁদল করে ত দ্যাখ্‌লাম, কিছুই হল না।

আ-মর নেকী। কোঁদল করে পারবি তুই মরদের সঙ্গে? দেখবি একদিন ঠেঙ্গিয়ে গতর থেঁতো করে দেবে। তবে? অত্যন্ত হতাশ-ভাবে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চুর বউ। পঞ্চুর বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে চোখ টিপে শুধু একটু হাসল হেলার বউ। তারপর বলল, না, তুই পারবি নি ভাই। ও তোর কম্ম নয়।

কি দিদি? পষ্ট করে বল না তোমার পায়ে পড়ি। পঞ্চুর বউয়ের মনটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

ওষুধ দিতে হবে লো, ওষুধ দিতে হবে। যেমন বুনো ওল তেম্‌নি বাঘা তেঁতুল, বুঝলি? কই আর বোঝলাম, ভাল করে বলনা। পঞ্চুর বউ বলল

বুঝতে পারলি নে? দূর ঢেঁকি কম্‌নেকারের। পরম আদরে সহ-চরীর গলাটা জড়িয়ে ধরে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস-ফিস করে কি বলল হেলার বউ। সঙ্গে সঙ্গে দুহাত পিছিয়ে গেল পঞ্চুর বউ। দূর্। তা কখন হয়? দিদির যেমন কথা। দুঃসহ লজ্জায়

এত বড় দরদী সখীর মুখের দিকে আর চাইতে পারল না সে। হেলার বউ বলল ঃ না হয়, ঝ্যাঁটা নাথি খেয়ে মর আর সতীগিরি কর।

দুজনে তখন বিলের ধারে এসে পড়েছে। বর্ষার জলের যোগান পেয়ে কুলে কুলে ভরে উঠেছে বিল। জলের ভেতর মাঝে মাঝে কাশের ঝোপগুলো দেখা যাচ্ছে। সাদা চামরের মত সাদা সাদা ফুল জলের স্রোতে থর থর করে কাঁপছে। রোদচড়া আকাশের কোন অপরিজ্ঞাত দিক থেকে গাঙ্গচিলের ডাক আসছে থেকে থেকে। জলে নেমে পর পর অনেকগুলো ডুব কাটল পঞ্চুর বউ। তর তর করে স্রোত বইছে। জলের নীচে পা রেখে একজায়গায় দাঁড়াবার উপায় নেই। স্রোতের একরোখা গতির সঙ্গে তার মনটা ভেসে যেতে চাইল চাষাপাড়ার ঘাট পার হয়ে খালমুখ দিয়ে একেবারে বড় গাঙ্গের ভেতর। গঙ্গার কথা মনে হতেই তার মনটায় কেমন যেন ঘা লাগল। কাল রাত্তিরে তার সঙ্গে কোন কথা না বলে মাছ ধরতে গেছে পঞ্চু ঐখানেই। এতটা বেলা হল এখনও ফিরল না।

কি লো? জলে যে একেবারে গা ভেসিয়ে দিলি। বাড়ী যেতে হবে না? হুস্ করে আরও গোটাদুই ডুব দিয়ে দুহাতে মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ঘাটের দিকে মুখ ফিরাতে গিয়েই আঁৎকে উঠল পঞ্চুর বউ। সমগ্র দন্তপংক্তি বিকশিত করে একেবারে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তার পার্শ্বচারিণীর স্বামীরত্ন হেলা।

ওমা! তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়খানা দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে ফেলল পঞ্চুর বউ। হেলার বউ খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, ঠিক তক্কে তক্কে এয়েছ? গন্ধ পাও না কি?

দে, গামছা দে। ঝক্ করে ডুবডা দিয়ে যাই। কোন যুগে

বেইরিছিস। এখুনি মোরে যেতে হবে তালডাঙ্গায়। বড় দারোগাবাবু আসছে। কলুবাড়ী ডাকাতি হয়ে গিয়েছে কাল রাত্তিরে। মুখে ত্বরা জানালেও তাড়াতাড়ি জলে নামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না হেলার। অধিকন্তু ডাকাতির বর্ণনার সঙ্গে তার নিজস্ব রাজপুরুষ বৃত্তির কৃতিত্ব জুড়ে দেবার জন্য ভূমিকা পেড়ে বসল। পঞ্চুর বউয়ের দিকে চেয়ে বলল, খবরডা পেয়েই এ্যালাম পঞ্চার বাড়ী। দ্যাখ্‌লাম দুয়োরে তালা ঝোলছে। ভিজে আবরণের ভেতর থেকে পঞ্চুর বউয়ের চোখদুটো এইবার হেলার মুখের ওপর ঘোরাফেরা করতে লাগল। পঞ্চারে কদ্দিন বলেলাম রাত্তিরে কখন বাড়ীছাড়া থাকিস নে। কথা ত শোনবে না। এখন বুঝুক ঠ্যালা। হেলার বউ বলল, কেন? সে কি চোর, না ডাকাত যে রাত্তিরে ঘরে না থাকলে দোষ হবে? তুই ত সব জানিস। দারোগার খাতায় তার নাম রয়েছে না। তারপর পঞ্চুর বউকে শুনিয়ে বলল হেলা, তোমারেই বলছি গো বউ। কেউ যদি জিগ্যেস্ করে, বলবা পঞ্চা বাড়ীতেই ছেল। কেমন, মনে থাকবে ত? হেলার বউ বলল, রাতে মাছ ধরতে যায়, আর বলবে বাড়ী ছেল?

মাছ ধরতে যায় না, হাতী। কাল রাত্তিরে সে সাবির বাড়ী ছেল। সে খবর আর কি মুই নেইনি ভাবছিস?

পঞ্চুর বউ অস্ফুটস্বরে কি একটা বলতেই হেলার বউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি বলছিস? পরে কানে কানে কথাটা শুনে নিয়ে হেলাকে বলল, ও বলছে কাল রাত্তিরে পঞ্চা ঠাকুরপো মাছ ধরতে গ্যাছে।

একগাল হেসে বলল হেলা, সে কি তোমায় বলে যাবে, 'মুই সাবির ঘরে চললাম।' তুমি যেমন বোকা। তারা বাগদি নিজের

চোখে দেখেছে। তারও হাতে পায়ে ধরে বলে এ্যালাম, কথাডা যেন পাঁচ কান না করে।

ঠিক সেই সময় ঘাটে এল পঞ্চুর মা। তুমি এখেনে বউ? দ্যাও চাবিডে দ্যাও। পঞ্চা এসে বসে আছে, ঘরে যেতে পারছে না। তারপর হেলার দিকে চেয়ে বলল, বউ ঝি ঘাটে রয়েছে, তুই এখেনে কি করছিস হেলা?

না খুড়ী। ইয়ে, এয়েলাম ইদিকে। মনে করলাম ডুবডা দিয়ে যাই।

আরও ত ঘাট রয়েছে। ডুব ত সেখেনেও দিতে পারতিস?

এইবার হেলার বউ বলল, তোমার ভাসুরপো এখুনি বেরুবে কি না, তাই আমারে খোঁজতে এয়েল। কমনে নাকি ডাকতি হয়ে গ্যাছে। দারোগা এয়েছে।

এতক্ষণে একটা পথ দেখতে পেল হেলা। পঞ্চুর মাকে বলল, তোমাদের বাড়ীও গিয়েলাম খুড়ী। থানা পুলিশের হ্যাঙ্গনাম। যদি বলে বসে পঞ্চা কমনে ছেল রাত্তিরে, বলতে হবে বাড়ী ছেল।

সে ভাবনা তোরে ভাবতে হবে না হেলা। চরণজেলে সাক্ষী দেবে, কম্‌নে ছিল পঞ্চা।

সাক্ষী দেবার আরও নোক আছে খুড়ি। তারা বাগদি যদি বলে, মাছ ধরতে যায় নি? হেলার বউ বলল।

তা হলেও মিথ্যে কথা কখন সত্যি হবে না মা।

পঞ্চুর মায়ের কথাটার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের জোর ছিল। তাই হেলার বউয়ের ক্ষুরধার জিভটা আর কথা খুঁজে পেল না। এবং পঞ্চুর বউ বিনা আপত্তিতে শাশুড়ীর সঙ্গে বাড়ী ফিরে এল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

ভাদ্র আশ্বিন কেটে গেছে। কার্ত্তিকও যায় যায়। সকাল সন্ধ্যায় আসন্ন শীতের হিমেল স্পর্শ পৌঁছে গেছে। নির্ম্মেঘ আকাশ; প্রখর সূর্যের তাপে মাঠ, ঘাট, নদী নালার জল কমতে আরম্ভ করেছে। রাতের শিশিরে পরিপুষ্ট হচ্ছে শষ্যসম্ভবা পৃথিবী; পূর্ণতোয়া ভাগীরথীর হাড় পাঁজরা বেরিয়েছে। দু হাতে টাকা লুটে মরসুমী কারবার গুটিয়ে এনেছে চরণ। অতএব প্রায় বেকারত্বে এসে ঠেকেছে পঞ্চুর অবস্থা। দু দিন জালে যায় ত পাঁচদিন বন্ধ। বারকতক জ্বরে ভুগে একেবারে অশক্ত হয়ে পড়েছে চন্দর। বুড়ো হাড়ের ভেল্কি কতদিন চলে? ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি কশিও বেড়েছে; সেই সঙ্গে বেড়েছে পঞ্চুর মায়ের মনের তিক্ততা। সংসাসের আয় কমেছে, ছেলে বৌউয়ে বনিবনাও নেই। সংসার থেকে মন উঠে গেছে বউএর। তার ওপর চন্দরের অসুখ। অসুখ নয় ত বুড়ো বয়সে তার দুর্গতি। থুতু ফেলে চারদিক ভরিয়ে রেখে দেয় চন্দর। গাল পাড়ে আর দশবার করে পরিষ্কার করে পঞ্চুর মা। খেতে বসে গা ঘিন ঘিন করে! পেটের ভাত ঠেলে বেরিয়ে আসে। গাল শুনে গজ গজ করে চন্দর। এশোকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করে মাঝে মাঝে। শুনে আরও রেগে উঠে পঞ্চুর মা। ঘাটের মড়া। মুখে ত পোকা পড়ছে। এখনও আকথা কুকথা।

মোর মুখে পোকা পড়ছে, আর তোর মুখে হীরে মাণিক ঝরছে। নচ্ছার মাগী কম্‌নেকারের।

থাক্ আর তেজ ফলাতে হবে না। এখুনি ধোঁককাশি চাগাড় মারবে। সব দিকেই মোর সুখ। মরণডা হয় ত হাড় জুড়োয়। পোড়া ভগমান চোখ কানের মাথা খেয়ে বসে আছে।

ভোর ভোর থাকতেই ঘুম ভেঙ্গে উঠল সাবি। কৌতুকপুরের তিনবাড়িতে গঙ্গাজল দেয় সে সকাল বেলায়। দোর খুলে বাইরে আসতেই দেখল, ঘরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রয়েছে পঞ্চু।

প্রায় তিন মাস পরে আজ এই তার পঞ্চুর সঙ্গে প্রথম দেখা। এখানে বসে কেন পঞ্চুদা? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

রাঙা জবাফুলের মত চোখদুটো দিয়ে সাবিকে দেখল পঞ্চু। সাবির বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। কি হয়েছে পঞ্চুদা? বলেই পঞ্চুর সামনে বসে পড়ল সে।

একবার আমাদের বাড়ী চ সাবি। কাল রাত থেকে মার ভেদবমি হচ্ছে। আমি এইছি অনেকক্ষণ। শুধু তুই কি মনে করবি বলে ডাকিনি।

ভেদবমি হচ্ছে খুড়ির? কেন, খাওয়া দাওয়ার কোন গোলমাল হয়েল? কথা বলবার সময় নেই সাবি। যা মনে ভাবছিস, তা নয়। মা বোধ হয় এবার আর বাঁচবে না রে। ছোট ছেলের মত ডুকরে কেঁদে উঠল পঞ্চু। ঝনাৎ করে দোরের শিকলটা আটকে দিয়ে বলল সাবি, চল, শিগগির চল।

দূর থেকে চন্দরের বাড়ীখানা দেখতে পেয়েই ভয় পেল সাবি। দাওয়ার নীচে কাঁথা, মাদুর, ছেঁড়া ন্যাকড়া ইতস্ততঃ ছড়ান। শূন্য মাটির কলসী একটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে একদিকে। দাওয়ার

কোণে শীর্ণ তুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ধুঁকছে চন্দর। ঘরের দোরে মাথা রেখে ক্লান্তিভরে ঘুমিয়ে পড়েছে পঞ্চুর বউ। নিস্তব্ধ মৃত্যুপুরীর ভেতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠের অবিশ্রান্ত কাৎরানি আসছে পঞ্চুর মায়ের।

মায়ের অবস্থার অবনতি দেখে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু। ও মা, মাগো! ও রকম করছিস কেন মা? বড় কষ্ট হচ্ছে?

কি ছেলেমানুষি করছ পঞ্চুদা, চুপ কর। হাত ধরে পঞ্চুকে একটু সরিয়ে দিয়ে পঞ্চুর মায়ের সামনে বসল সাবি। পঞ্চুর বউ উঠে ঘরের ভেতর চলে গেল। ডাক্তারকে খবর দিয়েছ পঞ্চুদা? সাবি জিজ্ঞাসা করল। কালিঢালা অক্ষিকোটরের ভেতর থেকে অতি ক্ষীণ নিষ্প্রভ চোখতুটো দিয়ে সাবিকে চেনবার চেষ্টা করল পঞ্চুর মা। এইছিস মা। হাত পা গুনো একটু টেনে দে দিনি। যেন সিঙ্গি মাছে কাঁটা হানছে।

এই যে খুড়ী, দিচ্ছি। সাবি কাছে বসতে যাবে পঞ্চু তাকে জিজ্ঞাসা করল। কারে ডাকি বলত? রমাপতি ডাক্তারকে ডাকব?

না, রাজু ডাক্তারকে ডেকে আন। যাবার পথে একবার দয়া দিদিমারে একটু বলে যাও।

পঞ্চু বলল, দয়া? সে কি আসবে?

আসবে। ভাল করে বললেই আসবে। পঞ্চু চলে গেল।

পঞ্চুর মার গায়ে হাত দিয়ে শিউরে উঠল সাবি। যেন মরা মানুষের গা। হিম কনকনে, বরফ ঢালা। হাত টেনে দেয় ত পায়ে খিল লাগে। পা সোজা করে, ত হাত বেঁকে যায়।

'বড্ড তেষ্টা, একটু জল দে।' চারদিক চেয়ে দেখে কোনখানে জলের চিহ্ন দেখতে পেল না সাবি। কলসী খালি। শূন্য ঘটি গ্লাস তুতিনটে পড়ে আছে, কিন্তু জল নেই।

বউদি একটু জল দ্যাও না ভাই। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পেয়ে আবার বলল সাবি। বলি ও বউদি, শুনছ? শুনিছি, কানের মাথা খাইনি। বলেই কলসী নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে জল আনতে গেল পঞ্চুর বউ।

এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেনি চন্দর। দুর্দ্দমনীয় কাশির বেগে দম ফেলতে পারেনি এতক্ষণ। এইবার অতি কষ্টে বলল, কি দেখছিস্ সাবি, বাঁচবে? কেন বাঁচবে না চন্দরকাকা? ভাল হয়ে যাবে। যন্ত্রণাকাতর মুখে একটু হাসি ফুটল চন্দরের, সে হাসির চেহারা দেখে বুকটা শুকিয়ে উঠল সাবির। ও এবার চলল রে সাবি। আমার ওপর ডঙ্কা মেরে চলল। সাবি দেখল চন্দরের ঘোলাটে চোখদুটোর কোল বয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ সমস্ত প্রাণশক্তি এককরে চিৎকার করে উঠল পঞ্চুর মা, জল দিলি নে সাবি। তেষ্টার জল একটু দিলি নে মা। উঃ মা গো।

এই যে খুড়ী, জল দিচ্ছি। বউদি জল আনতে গিয়েছে, এল বলে। জলও একটু নেই ঘরে? পোড়া সংসারে জলও একটু নেই। অতি পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠল পঞ্চুর মা। নাঃ। জল আনতে বড্ড দেরী হচ্ছে। সাবি আর বসে থাকতে পারল না।

ওরে, বার কলসীতে জল আছে রে, তাই দে। মরে গ্যালাম তেষ্টায়।

বড় একটা ঘটি হাতে করে বাইরে চলে গেল সাবি। কিন্তু তাকে আর বেশীদূর যেতে হল না। ছোট কলসীতে জল নিয়ে বকতে বকতে আসছে দয়াবুড়ী। কি? জলের আকাল নেগেছে? চ, জল এনিছি। তুমি এসেছ দিদিমা। বাঁচলাম। সত্যই সাবি যেন বেঁচে গেল।

না এসে কি করি বল। চলতে চলতে বকতে লাগল দয়াবুড়ী।

পঞ্চা গিয়ে খবর দেল, মার ওঠানাবা হচ্ছে রাত থেকে। ভাবলাম বাসি পাটটা সেরে থুয়ে যাব। ওমা, একটু পরেই দেখি, পঞ্চার বউ যাচ্ছে জল আনতে নক্ষণ পালের টিউকলে। বললাম, কেমন আছে তোর শাউড়ী? বলল, চৌপর রাত কেবল জল গেলছে আর বমি করছে। দু কলসী জল উঠে গ্যাছে। তাই জল আনতে যাচ্ছি। ওঠান থেকে জল আনবে, তবে রুগী খাবে! তবেই হয়েছে! দুয়োর খোলবে। ছড়া ঝাঁট দেবে। নিজেরা জল তোলবে, তবে নোককে দেবে। বাড়ীর কাছে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল দয়া। কেমন আছে রে?

ভাল নয় দিদিমা। দেখলেই বুঝতে পারবা।

দয়া বাড়ীর ভেতরে এল। সাবি বলল, জলটা দাও দিদিমা। বড্ড আতারি-কাতারি করছে তেষ্টায়।

চুপ্! সাবিকে ইঙ্গিত করল দয়া। চুপ করেছে, বোধ হয় ঘুমুবে।

বেলা যত বাড়তে লাগল, রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। মাটির মালসায় আগুন করে হাত পা সেঁকতে লাগল দয়া আর সাবি। কিন্তু না ফিরল পঞ্চু, না এল ডাক্তার। খবর পেয়ে পাড়ার লোক অনেকে এল। দূর থেকে দেখে যে-যার কাজে চলে গেল। বেলা দশটা নাগাদ গলদঘর্ম্ম হয়ে ফিরে এল পঞ্চু। মায়ের কাছে এসে একবার মাকে দেখল, তারপর উঠানে নেমে ধুলোর ওপর বসে পড়ল। সাবি জিজ্ঞাসা করল কি হল? ডাক্তার কই?

রাজু ডাক্তার এল না।

এল না? কেন? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

বলল, আগে দশটা ট্যাকা এনে দে, তবে যাব। বললাম, চলুন ডাক্তরবাবু যেখান থেকে হক ট্যাকা দিচ্ছি। না হয় ঘটি বাটি

গরু ছাগল ব্যাচব। বলে কি, বেচে আগে ট্যাকা আন, তারপর যাব। ঐ রকম করে আমার অনেক ট্যাকা মারা পড়েছে।

দয়া বলল, কমনে গিইলি রে পঞ্চা? আজু ডাক্তারের কাছে! ওডা আবার ডাক্তার না কি? বিষের জাহাজ। বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর। সাবি বউরে ডেকে স্যাঁক কর, জল চাইলে ঢোকে ঢোকে জল দিবি। মুই আসছি। দয়া উঠে গেল।

চন্দরের লক্ষ্য ছিল সব দিকে। বুঝতেও পারছিল সব। পঞ্চুকে কেউ বিশ্বাস করে না। তাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে রাজু ডাক্তার। তবুও এ তারই অক্ষমতার লজ্জা। আজ সে হাঁটতে পারে না, কারুর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। নইলে তার কথা শোনে না, এমন লোক এ গাঁয়ে কেউ নেই। পঞ্চুকে কাছে ডাকল চন্দর।

কোন ব্যাটার একটা আধলা পয়সা ফাঁকি দেই নি কখনও। তবুও আমার ছেলেরে কেউ বিশ্বেস করে না। পঞ্চুকে শুনিয়ে বললেও, আসলে এটা চন্দরের আত্মজিজ্ঞাসা। দীর্ঘদিনের আত্ম অভিমান আজ তার পরাজয়ের কাহিনী। নিজের মনের সামনে আর তার দাঁড়াবার শক্তি নেই। পঞ্চুর ওপর রাগ করবে কি, তাকে দেখলে আজ তার মায়া হয়।

শোন্। রোগ হলে বত্তি নাগে। বত্তির কড়ি না যোগালে রোগ সারে না। ছ্যাখ্, তিনকড়ে বাগের কাছে এখনও আমার চারট্যাকা পাওনা। হরি বিশ্বাসের কাছে দু ট্যাকা। সুরো বাগদির কাছে পাঁচসিকে। খেটিয়ে পয়সা বাকী রাখে। ছমাস পরে কাজের খুঁৎ বেরুলে বিনি পয়সায় বেগার খেটিয়ে তবে ঝেড়ে মিটুবে। যা, গলায় গামছা দিয়ে আদায় করে নিয়ে আয় একখুনি। ঘরে আমার বিপদ। আমি ট্যাকা ফেলে থুতে পারব না। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল পঞ্চু।

চন্দর আবার বলল, শোন্। গাইডে বেচে দে। অভয় মোড়ল, পরামানিকদের ন্যাড়া কিনতে চেয়েল। একটানে দু সের দুধ দ্যায়। নগদ একশ টাকা গুণে নিয়ে গরু বেচে দে। বুঝলি? পঞ্চু উঠে যাবার উপক্রম করতেই সাবিকে ইশারায় কাছে ডাগল পঞ্চুর মা। কোনরকমে যেটুকু বলল তার মোটামুটি অর্থ, গরু যেন না বেচা হয়। সে মরুক ক্ষতি নেই। গরু গেলে সবাই না খেয়ে মরবে।

সাবি বলল খুড়ী গরু বেচতে বারণ করছে চন্দরকাকা। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। বলে পঞ্চুকে ইশারায় চলে যেতে বলল চন্দর।

পঞ্চুর বউ আর সাবি সামনাসামনি বসে কলেরা রোগীর যাবতীয় উপসর্গের সঙ্গে যুঝতে লাগল। কতক্ষণ যে এভাবে কেটেছে কারুর খেয়াল ছিলনা। হঠাৎ বাইরে থেকে ভারী গলার আওয়াজ এল, কি ব্যাপার? একহাত ঘোমটা টেনে ঘরে চলে গেল পঞ্চুর বউ। মুমূর্ষু রুগীর পাশে বসে একেবারে পাথর হয়ে গেল সাবি। কম্পাউণ্ডারকে উঠানে দাঁড়াতে বলে পঞ্চুর মায়ের সামনে এসে বসল রমাপতি।

পঞ্চা কোথায়? সাবি সামনে থাকতেও চন্দরকে জিজ্ঞাসা করল রমাপতি। অত্যন্ত অপ্রতিভের মত উত্তর দিল চন্দর, আজ্ঞে একটু বাইরে গ্যাছে।

একবার রুগীর হাতের মনিবন্ধ আবার বাহুদেশ টিপে দেখে মুখ গম্ভীর করল রমাপতি। তারপর কম্পাউণ্ডারকে কাছে ডাকল।

কেমন? সাহস হয়? একেবারে খাঁটি জিনিস। লুক্ হিয়ার। বলেই পঞ্চুর মায়ের একটা চোখের কোণের চামড়া টেনে দেখাল রমাপতি, মরা মাছের চোখের মত শাদা অংশটা আর ঢাকা পড়ল না চামড়ায়। নিরুত্তর সহকর্ম্মীকে আবার বলল রমাপতি ঃ ব্যাগের

মধ্যে ইউক্যালিপ্‌টাসের শিশি আছে, খানিকটা ঢেলে নাও রুমালে। ইতিমধ্যে ঘর থেকে একটা জলচৌকি এনে রমাপতির সামনে পেতে দিল সাবি। রমাপতির মুখখানায় তৃপ্তির আভাস ফুটে উঠল। তবুও সাবিকে একটু আঘাত করতে সে বলল, রুগীর কাছে বসে না থেকে সময় থাকতে আমাকে যদি খবরটা দিতে, তাতে তোমার হয়ত একটু মান খাট হত, কিন্তু মানুষটা বোধ হয় বাঁচত।

লজ্জায় একেবারে মরে গেল সাবি। তবে কি আর আশা নেই?

সন্দেহটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে দিল রমাপতি। শোন গো চন্দর। দয়া গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করল, তাই এলাম। তা হলেও তোমাকে বলে রাখছি রোগটা কঠিন, তার ওপর বড্ড দেরী হয়ে গেছে। নাড়ী গেছে, কিড্‌নি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও ডাক্তারের কাছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। এসিছি যখন, কাজ আমাকে করতেই হবে। বলত, আরাম্ভ করি।

যাতে ভাল হয় করুন ডাক্তারবাবু। আমরা মুরুখ্যু মানুষ। কি বুঝি বলুন। আধঘণ্টা ধরে অক্লান্ত চেষ্টা করে খানিকটা স্যালাইন পঞ্চুর মায়ের শরীরে চালিয়ে দিয়ে কম্‌পাউণ্ডারকে সরঞ্জাম গুছিয়ে ফেলতে বলল রমাপতি। ততক্ষণ পঞ্চুও ফিরেছে। দয়াও এসে গেছে। সেই সঙ্গে এসেছে স্ত্রীলোক আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একটা দল। দাওয়া থেকে নেমে এসে দাঁড়াল রমাপতি আর তার কম্‌পাউণ্ডার।

বেশী করে একটু জল দিয়ে যাও। সাবি জল নিয়ে এল। পঞ্চুও এসে দাঁড়াল। হাত ধুয়ে ফেলে বলল রমাপতি, লোকে আমাকে দোষ দেবে। বলবে ডাক্তার ভাল করতে পারল না। কিন্তু তা নয়। মানুষ মরে গেলে কি আর ওষুধ গিলতে পারে? এও ঠিক তাই।

আমার সঙ্গে একবার চল পঞ্চু। একটা ওষুধ দোব। আর যেটুকু গেছে ওতেই যদি গা একটু গরম হয়, আমাকে একটা খবর দিও। শেষ কথাটা সাবিকে উদ্দেশ্য করে বলল রমাপতি।

রমাপতি, পঞ্চু আর কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু পঞ্চুর মায়ের কাছে ফিরে যেতে আর যেন পা উঠতে চাইল না সাবির। ছেলেবেলা থেকে মৃত্যু জিনিসটাকে ঘনিষ্ঠ পরিচয়সূত্রে সে ভাল করেই দেখেছে; জেনেছে কত কষ্টে মানুষ মরে। হাড়ে হাড়ে বুঝেছে মনের ভেতর কোথায় না কোথায় এর শেষ দাগটুকু যেন অক্ষয় হয়েই থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে যেটা জানতে বাকী ছিল আজ সেই জিনিসটাই তাকে ভাল করে জানিয়ে দিয়ে গেল রমাপতি ডাক্তার—সময়মত খবরটা দিলে হয়ত বাঁচত পঞ্চুর মা। অথচ সে-ই পঞ্চুকে বলেছিল, রমাপতিকে না ডেকে রাজু ডাক্তারকে ডাকতে।

অনেকবার রুগীর গায়ে হাত দিয়ে দেখল সাবি, কোন রকমে যদি গাটা একটু গরম হয়। তা হলে খবর দিলেই ডাক্তার এসে তাকে বাঁচিয়ে তুলবে। যাবার সময় এই রকম কথাই যেন বলে গেল ডাক্তার। মনে মনে অনেকরকম করে ডাকল ভগবানকে। রোদের ঝাঁঝে বাতাসের উত্তাপ বাড়ল। দাওয়ার চাল আগুন হয়ে উঠল, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় সে আঁচ এসে পৌঁছুল না।

বিকেলের দিকে আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কাটল পঞ্চুর মার। বুক, পেটের আক্ষেপও কমে গেল। কোটরপ্রবিষ্ট চোখদুটো দিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল চারদিকে। পঞ্চুর মনটা উৎসাহে নেচে উঠল। মায়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, কি মা? এখন একটু ভাল মনে হচ্ছে?

রুদ্ধকণ্ঠ বিহঙ্গীর মত অত্যন্ত ক্ষীণ অথচ সুপরিস্ফুট জিজ্ঞাসা

বেরুল মায়ের মুখ থেকে, খেইছিস কিছু? হ্যাঁ মা, খেইছি। মিথ্যা কথায় মাকে প্রবোধ দিল পঞ্চু। একটুখানি থেমে আবার বলল পঞ্চুর মা, বুড়ো খেয়েছে? হ্যাঁ খেয়েছে। দয়ার অনুরোধে কিছু খেয়েছিল চন্দর। তবুও যেন ঠিক আশ্বস্ত হল না পঞ্চুর মা। চোখদুটো যেন আরও কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হল। দেখে সাবিরও সাহস হল। পঞ্চুকে বলল, এবার একটা খবর দ্যাও ডাক্তারবাবুকে। এখন যেন একটু ভাল মনে হচ্ছে।

দয়া আর চুপ করে থাকতে পারল না। তুই থাম ত। বুঝতে পারছিস নে। ওগো ছোটভাই, একটু ইদিকে এস ত।

বিহ্বল চন্দর পা জড়িয়ে জড়িয়ে এগিয়ে এল।

একটু পায়ের ধূলো দ্যাও সতীনক্ষীর মাথায়। ওলো সাবি ঝক করে একটু গঙ্গাজল দে পঞ্চার হাতে।

পঞ্চুর মা মারা গেল।

২

পঞ্চুর মায়ের সৎকার সেরে সকলে ফিরে আসবার আগেই সাবি চন্দরের বাড়ী থেকে চলে গেল। শোকার্ত্ত চন্দরকে এত শীঘ্র ফেলে যেতে কষ্ট হলেও, পঞ্চুর মায়ের অবর্ত্তমানে এ বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকতে তার মন চাইল না। বিলে স্নান সেরে নিয়ে ভিজে কাপড়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলল। কার্ত্তিকের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে একপ্রহর রাত হয়ে গেছে। সারাদিনের অনশন আর কনকনে ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর তার ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। বাড়ী এসে কাপড় বদলে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বে, তারার বউ তাকে ডাকল।

বাইরে এসে দেখল সাবি, তারার বউয়ের সঙ্গে আরও অনেকে

এসেছে। এত বড় মেয়ে মজলিসে যোগ দেবার মত মনের উৎসাহ বা শরীরের অবস্থা না থাকলেও, সকলকে বসতে বলে তাকেও বসতে হল।

প্রথমেই কথা পাড়ল তারার বউ, কখন মারা গেল? সাবি বলল, বিকেল বেলা। গলার আওয়াজে শোকের উচ্ছ্বাস মিশিয়ে একজন বলল, আ হা হা। জলজ্যান্ত নাম্নুষডা গো। কাল সন্ঝে বেলা কাপড় কেচে বাড়ী ফেরল, আর আজ তারে ঘাটে নিয়ে গ্যাল। সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন বলল, কি রোগ গো, কি রোগ! দোহাই মা ওলাবিবি! যেন ধাত্তয়া যম, ধরল আর নিয়ে গ্যাল।

সাবির তখনও ভাল করে কঁপুনি থামে নি। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে, কাপড় দিয়ে কান পর্য্যন্ত ঢেকে চুপ করে বসে রইল। রোগের কথাটা শুনেই তারার বউ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। রোগে মরেছে, না হাতী। মেরে ফ্যাল্‌লে আর মরবে না। মেরে ফেলার কথাটায় চমকে উঠল সাবি।

কেডা কারে মেরে ফেলল বউদি? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

আহা! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতে কার মাসী? ঐ অনামুখো ডাক্তার লো, আবার কেডা? জ্যান্ত মানুষটারে হাত কেটে, পা কেটে সাবাড় করে দিল। সাবি বলল, না বৌদি। ও রোগেত ও রকমই হয়। গেল বছর নগেনের যখন ঐ ব্যামো হল, রাজু ডাক্তার ত ঐরকম করে হাত পা কেটে জল পুরে দিয়ে তারে বাঁচিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ঘুরিয়ে নিল তারার বউ, রাজু ডাক্তার আর রাম ডাক্তার! বলে, 'কিসে আর কিসে, ধানে আর তুঁষে।' রাজু ডাক্তার কি ঐ মুখপোড়ার মত নোকের সোমত্ত বউ ঝি দেঁখে দেখে বেড়ায়?

রমাপতির চিকিৎসার ওপর বিশ্বাস ছিল সাবির। তার ওপর রাজুডাক্তারের হৃদয়হীনতার তুলনায় রমাপতিকে তার একেবারে দেবতা বলে মনে হল।

সাবি বলল, কেন মিছিমিছি নোকের নামে দোষ দিচ্ছ বউদি। রাজু ডাক্তার যদি এতই ভাল, তা হলে আমার খুকী গেল কেন? তুই বললে ত হবে না সাবি ঠাকুরঝি। গাঁ শুদ্ধু নোক ছিঃ ছিঃ করছে। বলছে, মুখপোড়া ডাক্তার না মানুষমারা যম। তারা জানে না, তাই বলছে। ইচ্ছে করে কি কেউ মানুষ মারে? বলল সাবি। এইবার আসল কথাটা খুলে বলল তারার বউ। না, তা মারে না। তবে ছুঁড়িছুটকি রুগী পেলে যত্ন করে, ওষুধের সঙ্গে পত্তি দিয়েও বাঁচায়। আর বুড়ো হাবড়া হলে দেগে ফুঁড়ে শেষ করে ছায়।

সাবিকে আঘাত করবার ঠিক ইচ্ছা না থাকলেও পরনিন্দায় অভ্যস্ত জিভটা থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে এল কথাটা। এর পর বিশেষ জমল না আলোচনা।

ঘরে এসে শুয়ে পড়ল সাবি। অতিপরিশ্রমের অবসন্নতা থাকলেও নিশ্চন্তমনে সে ঘুমুতে পারল না। পঞ্চুর মায়ের আকস্মিক মৃত্যু তার মনটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। আত্মীয়স্বজনবিহীন সাবির যে কতবড় আশ্রয় ছিল পঞ্চুর মা, আজ তা ভাল করেই মনে পড়ল। মনে পড়ল চন্দরকে, মনে পড়ল পঞ্চুকে, মনে পড়তে লাগল রমাপতি ডাক্তারকে।

এইরকম অবিচ্ছিন্ন চিন্তার মধ্যেই কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছে, মনে হল তার ঘরের পাশ দিয়ে আলো নিয়ে কারা যেন যাতায়াত করছে। ঘরের পাশ দিয়েই তারা বাগদির বাড়ী যাবার পথ। সাধারণতঃ রাত বেশী হলে এ পথে কেউ যাওয়া

আসা করে না। একাধিকবার পায়ের শব্দ পেয়ে সজাগ হয়ে উঠল সাবি। তারার বাড়ীর দিক থেকে মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তার শব্দ আসছে। সাবির মনে কৌতূহল হল, ভয়ও হল একটু। উঠে গিয়ে দেখে আসবে, কিন্তু এত রাত্রে দোর খুলতে সাহস হল না।

হঠাৎ আলোর একটা রেখা পড়ল সাবির ঘরের দেওয়ালে ; তার-পর আরও খানিকটা। কারা যেন তারার বাড়ীর দিক থেকে এদিকে আসছে। ক্রমশঃ কথাবার্ত্তার শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠল। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতেই যে কথা শুনতে পেল সাবি, তাতে তার অন্তরাত্মা ভয়ে শিউরে উঠল।

রমাপতি বলছে তারাকে, ও রকম হয়রে তারা, ও রকম হয়। যার উপকার করবি, সেই তোর পেছনে লাগবে ; এই হচ্ছে নিয়ম। সাবি যে আমার নিন্দে করে বেড়াবে, এ আমি তখুনি জানতাম, যখন বিনি পয়সায় চিকিচ্ছে করে ওকে বাঁচিয়েছিলাম।

অস্ফুটস্বরে তারা কি বলল, সাবি ঠিক শুনতে পেল না। সাবির ঘরের ঠিক পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা বলল, রাত ত পুইয়ে এল ডাক্তারবাবু, একেবারে ভোর হলেই না হয় যেতেন। রমাপতি বলল, তোর বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না তারা ? বলছি তোর ছেলের আর কোন ভয় নেই। নাড়ী ঠিক হয়েছে। পেচ্ছাব হয়ে গেছে। তবে কিছু খেতে দেয় না যেন, দেখিস্ ? কাল দশটা নাগাদ একবার দেখে যাব। যাবার সময় বোধ হয় সাবিকে শুনিয়ে বলবার উদ্দেশ্যেই জোর করে বলল রমাপতি। উঃ, মেয়েটা কি বেইমান রে তারা ! অম্লান বদনে বলল, পঞ্চার মাকে আমিই মেরে ফেলেছি !

হড়াম করে দোরের খিল খুলে দাওয়ায় এল সাবি। নিঃসম্বল একক জীবনে অনেক অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করেছে। সেদিন ঠিক

কথাই বলেছিল পঞ্চু, ভালমানুষী করে কি ভাল হচ্ছে তার? চুপ করে সহ্য করে বলে কি কিছুই বোঝে না সে? মনে মনে জিভটা শানিয়ে নিয়ে বাঘিনীর মত ওৎ-পেতে বসে রইল সাবি। তারাকে এই পথ দিয়ে ফিরতেই হবে।

একটু পরেই তারা ফিরল। সাবিও তাকে ডাকল, কিন্তু নিজের অপমানের মূলচ্ছেদ করবার ভূমিকা না বেরিয়ে, তারার ছেলের কথাটাই তার মুখ দিয়ে আগে বেরিয়ে এল।

কি হয়েছে তারাদা?

কেডা? সাবি! মন্নুর বড্ড অসুখ রে। বাঁচে কি না বাঁচে। বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল তারা তারাকে আঘাত করবে কি, সাবির চোখ দুটোও জলে ভরে চোদ্দ পনের বছরের উঠতি বয়সী ছেলে মন্নু।

কেন? কি হয়েছে মন্নুর? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

তারা বলল, বিকেল থেকেই পেটটা নরম করেল। মনে করলাম মাঠে গিয়েল, উদয়কেলে হাই টাই দিয়েছে হয়ত। তার ওপর খাওয়া দাওয়া করে শুল। খানিক রাত্তিরে উঠে বাইরে গেল। ঘরে এসেই একবার বমি করল। তার পর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে কথা বলছে। বলতে বলতে চঞ্চল হয়ে উঠল তারা। চললাম সাবি। ঘরেও টেঁকতে পারছি নে, আর বাইরেও থাকতে পারছি নে।

একটু দাঁড়াও তারাদা। দুয়োরটায় তালা দিয়ে নেই।

তুই যাবি সাবি?

হাঁ।

তারা কৃতার্থ হয়ে গেল। রমাপতি চলে যাবার পর তার

মনটা যেন আকুলি বিকুলি করছিল। সাবিকে সঙ্গে পেয়ে তারার সাহস হল। বলল, দয়ারে একবার ডাকলে হয় না সাবি?

কেন, ডাক্তার কি বলল? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তার? বলেই তারা যেন একটু চমকে উঠল। ডাক্তার ত কেটে কুটে ফুঁড়ে দিয়ে গ্যাল। এখন যা করেন ভগমান। তুই একবার দেখবি চল দিনি। তুই ত অনেক দেখিছিস।

সাবিকে দেখে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল তারার বউ, ওগো ঠাকুরঝি, কি কাল রোগ ঢোকালে তুমি পাড়ায়। আমার মন্টু যে যায়। মায়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে উঠে কাৎরাতে লাগল মন্টু। সাবি বলল, আমি রোগ ঢোকালাম! আমার রোগ্ও হয়নি, আর আমি তোমাদের বাড়ীও আসিনি।

তারা বলল, ও কথা তুই শুনিস নে সাবি। ছোঁড়াডার রোগ হওয়া এস্তক্ যত আবল তাবল বকছে ঐ মাগী। একবার বলছে রাম ডাক্তারকে আন, একবার বলছে রাজু ডাক্তারকে আন। আবার বলছে রোজা নিয়ে এস।

আনবা না? ছেলের অসুখ, আর তুমি যক্ষীর মতন ট্যাকার বোগ্নো বুকে করে বসে থাকবা। সাবি বলল, তোমরা যা করছ বৌদি, ছেলে কি করে ভাল হবে? তুমি অন্য ঘরে যাও, আমি বসছি। ওর ঘুম পেয়েছে আর তোমরা বকর বকর করছ? সাবি দেখল মন্টুর গা বেশ গরম, মনে হয় যেন জ্বর এসেছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কিন্তু জল চায় নি একবারও।

সাবি জিজ্ঞাসা করল, কি কষ্ট হচ্ছে বাবা মন্টু?

বড্ড খিদে নেগেছে সাবি পিসি। সাবির মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল মন্টু।

আচ্ছা বাবা। এখন ঘুমোও। ঘুম ভাঙ্গলেই, খেতে দেব আমি তোমায়। মন্নুর মাথায় হাত বলুতে লাগল সাবি। কেমন বুঝছিস্ সাবি? জিজ্ঞাসা করল তারা।

ভাল, তোমরা বাইরে যাও। এখুনি ও ঘুমুবে।

মন্নুকে ঘুম পাড়িয়ে যখন বাইরে এল সাবি, তখনও ভোরের শুকতারা ওঠেনি। তারাকে ডেকে বলল, মন্নু ঘুমিয়েছে। একজন জেগে থাকলেই হবে। আমি চললাম।

তারা বলল, চললি। তা যা।

কোন ভয় নেই তারাদা। আর আমি ত কাছেই রইলাম।

অনেকটা বেলায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে বাইরে এল সাবি। তারার বাড়ী থেকে কান্নাকাটির শব্দ আসছে। তাড়তাড়ি দাওয়া থেকে নেমে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখল রাজু ডাক্তার শ্যামার সঙ্গে কথা কইতে কইতে তার বাড়ীর কাছ দিয়ে চলেছে। সাবিকে দেখে বলল, কি রে সাবি! তোর রমাপতি ডাক্তারের কিত্তিটা দেখলি ত? দু দুটো লোক মারল দু দিনে।

মন্নু কি মারা গেল ডাক্তারবাবু? ভয়ে নীল হয়ে জিজ্ঞাসা করল সাবি। অম্লানবদনে উত্তর দিল রাজু ডাক্তার, যাবে না? গোবদ্যির হাতে পড়লে যাবে না? যেন রমাপতির মূর্খতা প্রতিপন্ন করতে মন্নুর মরটা ঠিকই হয়েছে। আর এই হারামজাদাদেরও বলি, বাঘে খাইয়ে শেষ করে এনে তবে আমার কাছে আসবে। এসে দেখি পেটটা ফুলে ঢোল, দম ফেলতে পারছে না। হার্টফেল করবে না ত কি? রাজু ডাক্তার চলে গেল।

কিন্তু সাবির সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল। কাল মন্নুকে অনেকটা সুস্থ দেখে এসে যখন সে শুয়ে পড়ল, সম্পূর্ণ

নিশ্চিন্ত হলেও একটা অশ্বস্তি তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিয়েছিল। মন্নুর রোগমুক্তির সম্ভাবনার সঙ্গে তার নিজের মেয়ের ক্রমঅবনতির ছবিখানা নতুন করে তার মনে ভেসে উঠেছিল। সেই সঙ্গে ঈশ্বরের বিচারে যে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে, এমন কি ধনী দরিদ্র হিসাবে তার তারতম্যও ঘটে, এই মনোভাবটা তাকে পেয়ে বসেছিল। আজ মন্নুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার দুঃখ ত হলই, অধিকন্তু তার ভেরতটা একেবারে ছিঃ ছিঃ করে উঠল। তবুও অপরাধীর মত সে পায়ে পায়ে তারার বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

বাড়ীর উঠানে লোক গিজ গিজ করছে। সদ্যপুত্রহারা তারার বউকে জোর করে ধরে রাখতে হয়েছে। সাবিকে দেখতে পেয়ে কান্নার সুরে আবার আক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। সে আক্ষেপের মধ্যে শোকের চেয়ে অভিযোগই ছিল বেশী। ইচ্ছা করেই তার সন্তানকে হত্যা করেছে রমাপতি। মাঝে মাঝে থামে, আবার সুর করে কাঁদে তারার বউ। সে বিলাপের ভাষায় শেষ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সাবি। রমাপতি আর সাবিকে নিয়ে বেপরোয়া কুৎসায় সে একেবারে মাঠির সঙ্গে মিশে গেল। বাড়ী থেকে চলে যাবে, তারা তাকে ডাকল। সাবি দেখল তারার চোখদুটো ঘোর লাল। তারা বলল, একটা কাজ কর সাবি। দয়ারে একবার ডেকে দে। ওনারা যারা এয়েছেন ওসব সখের পায়রা। আমি নিজেই য্যাতাম, কিন্তু পাঁজরায় আর কাঠি নেই রে, হতভাগাটা সব গুঁড়িয়ে দিয়ে গ্যাছে। গামছাখানা চোখে চাপা দিয়ে দুর্দ্দমনীয় কান্নার বেগ থামাবার চেষ্টা করল তারা। কূটচক্রী, স্বার্থসর্ব্বস্ব তারা বাগদি। তবুও তার মধ্যে পুত্রশোকের জীবন্ত ছবি দেখতে পেল সাবি। তারাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, আমাকে আর ডাকলে না

কেন তারাদা ? তোমারে ত বলেই গেলাম, দরকার হলে খবর দিতে।

তারা বলল, ভালই ত ছিল। ভোর বেলায় বড্ড খাবর বায়না ধরল। কিছুতেই শোনে না। বাল্লিক খাবে না। তুডো ভাতের জন্যে দমফাটাফাটি করতে নাগল।

ভাত দিয়েলে না কি তারাদা ? আঁৎকে উঠে বলল সাবি।

একমুঠো পান্তভাত আর একটুখানি আমানি।

সাবিও তুলে বাগদির মেয়ে। তা হলেও ছ আনি তুলেরা বরাবর একটু গোত্রছাড়া গোছের ছিল। মোটামুটি স্বাস্থ্যের আইন গুলো জানত। দয়াকে ডেকে দেবে বলে সে বাড়ী চলে গেল।

বিকেলের দিকে খাওয়া দাওয়া সেরে ধাড়ী ছাগলটাকে খুঁজতে বেরুবে, দয়া এসে সাবির দাওয়ায় বসল। হরে ছুতরের বউডো এই মারা গেল সাবি। ভোরবেলা হয়েল, এই খানিক আগে হয়ে গ্যাল।

হরি ছুতরের বউ ? বল কি দিদিমা ?

দয়া বলল। অনেকগুনো কচিকাচা ছেলেমেয়ে। যমেরও মুখের তার আছে সাবি। ও কি তোরে নেবে, না মোরে নেবে ? সাবি চুপ করে রইল। দয়া আবার বলল, এবার ত আজু ডাক্তার দ্যাখল, কই বাঁচল না ত ? এ কথারই বা কি উত্তর দেবে সাবি ?

ভাল মানুষের আর কাল নেই সাবি। নইলে পয়সা দ্যাও না দ্যাও, ডাকলেই আসবে, বুক দিয়ে করবে, তারে কি না নোকে কুচ্ছ করে। বলে মানুষখেগো ডাক্তার। আজ মোরে ডেকে কত দুঃখ্যু আক্ষেপ করল ডাক্তারবাবু। এইবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, সাবি। দুঃখ্যু করে কি বলল ? সব দোষে দুষী ত-এই সাবি।

সাবির তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় একটু বিব্রত বোধ করল দয়া, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সামলে নিল। বলল, তা দোষ করলে দোষ নাগবে বৈ কি সাবি।

সাবির চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তুমি আমার সঙ্গে একটু যাবে দিদিমা? কম্‌নে লা? দয়া জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তারবাবুর কাছে।

এখুনি! কেন্ বল—দিনি?

গেলেই শুনতে পাবা। সাবি বলল।

মোর আর শরীল বইছে না। তারার বাড়ী ভূতের খাটুনি খেটে এই একটু বসিছি। এখুনি আবার কৌতুকপুরের বাজার।

তুমি বস দিদিমা। আমি একাই যাচ্ছি। উৎক্ষিপ্ত উল্কার মত ছিটকে চলে গেল সাবি।

রমাপতির ডিস্‌পেনসারিতে ভিড় ছিল না। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে কি ভাবছিল রমাপতি। পড়ন্ত রৌদ্রের সুবর্ণরশ্মিতে রমাপতির সুশ্রী মুখখানায় সৌন্দর্য্যের চেয়ে বিষণ্ণতার ব্যঞ্জনাই ফুটে-ছিল বেশী। থানধুতির আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে ডিস্‌পেনসারির সামনে এসে দাঁড়াল সাবি। তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল রমাপতি। কৌতুকপুরের প্রকাশ্য বাজারে কেউ কোনদিন ছায়াও দেখে নি সাবির।

বিহ্বল রমাপতিকে জিজ্ঞাসা করল সাবি। দয়া দিদিমারে আপনি কিছু বলেছেন ডাক্তারবাবু? রমাপতি বলল, ওখানে দাঁড়িয়ো না। মেয়েদের বসবার জায়গা আছে, গিয়ে বস। আমি যাচ্ছি। বলেই আঙ্গুল দিয়ে মাটির আধখানা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা স্বতন্ত্র ছোট প্রকোষ্ঠ দেখিয়ে দিল রমাপতি। ছোট ঘরে গিয়ে বসল

সাবি। নামমাত্র ঘর, কোন রকমে তিন চার জন বসতে পারে। একটু পরে রমাপতি এসে ঘরের সুমুখে দাঁড়াল। শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে গায়ের মাথার কাপড় সংযত করল সাবি।

কি বলছিলে সাবিত্রী ? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল। আবেগের তাড়নায় ছুটে এলেও রমাপতিকে একলা সামনাসামনি দেখে সঙ্কোচে লজ্জায় একেবারে কাঠ হয়ে গেল সাবি। সাবিকে নিরুত্তর দেখে বলতে লাগল রমাপতি, দয়ার কথা বলছিলে না, তার মুখে তা হলে সবই শুনেছ।

সাবি বলল, হ্যাঁ, শুনিছি বলেই এলাম। নইলে বাজারে আমি কখন আসিনে ! তবে কেন এলে ? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল। নিজেকে তৈরী করে নিয়ে বলল সাবি, আপনি আমার উবগার করেছিলেন ডাক্তার বাবু। বড্ড কষ্ট যাচ্ছে বলে আপনার দেনা শোধ করতে পারিনি। তা বলে আমি আপনার ক্ষেতি করব, পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে করে বেড়াব, সত্যিই কি এত ছোট আমাকে আপনি মনে করেন ? বলতে বলতে মাটিতে বসে পড়ে রমাপতির দুটো পায়ে হাত দিয়ে আবার বলল সাবি, এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, এসব কথা আমি বলিনি ডাক্তারবাবু।

ছিঃ ছিঃ, ও কি করছ ? সাবির হাত দুখানা ধরে বলল রমাপতি আমি বুঝতে পেরেছি, এ সব তোমার নামে কেউ রটিয়েছে। কিন্তু এখন আর আমি ও সব ভাবছি নে সাবিত্রী। আমি ভাবছি এ গাঁ থেকে এইবার আমার অন্ন উঠল। তা নইলে খাসা ভালর দিকে গিয়ে, কি করে মারা গেল তারার ছেলেটা ? সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল রমাপতি। রমাপতির মনের অবস্থাটা অনুমান করে আর চুপ করে থাকতে পারল না সাবি।

তারাদার ছেলে মারা গেল, এতে অপেনার কোন দোষ নেই ডাক্তার বাবু। সহজভাবে কথাটা ধরে নিয়ে একটু হাসল রমাপতি। বলল, আমার দোষ না থাকলেও, আমার ভাগ্যের ত দোষ আছে। নইলে ও রুগী মরে ?

কলেরা রুগীকে আমানি আর পান্ত ভাত খাওয়ালে কি করে বাঁচবে ডাক্তারবাবু ? সাবির মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ আর কথা বলতে পারল না রমাপতি।

তুমি ঠিক জান সাবিত্রী ? কে বলল তোমাকে এ কথা ? তখনও ঠিক ঘোর কাটেনি রমাপতির।

সাবি বলল, তারাদা নিজে আমারে বলেছে।

তুমি আমাকে বাঁচালে সাবিত্রী। কি উপকার যে করলে আমার, তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না। নিজের ওপর আমার বিশ্বাস চলে যাচ্ছিল। কেউ ডাকলে আর আমি যেতে পরতাম না চিকিৎসা করতে। বলতে বলতেই দু হাত দিয়ে সাবির একখানা হাত আবিষ্টের মত জড়িয়ে ধরল রমাপতি। ঠিক সেই সময় ব্যস্তসমস্তভাবে ঘরে এল পঞ্চু ; রমাপতিকে ডাকতে গিয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেল। পঞ্চুকে দেখে লজ্জায়, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল সাবি। তখনও তার হাতখানা রমাপতির হাতের মধ্যে ধরা। নিজে সামলে নিয়ে বলল রমাপতি, কি রে পঞ্চু ? আবার কি হল ? তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ারের হাতল চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল পঞ্চু। নতুন কাপড়ের অসচ্ছল কাচা পরা, এক মাথা রুক্ষ চুল, গায়ে পায়ে খড়ি উঠছে, সুপরিস্ফুট বুক পিঠের পাঁজরা, উদ্ধতস্বভাব পঞ্চুর এই হীন অবস্থা দেখে সাবির ভেতরটা ত হাহাকার করে উঠলই, রমাপতি পর্য্যন্ত অভিভূত হয়ে

পড়ল। দু হাত দিয়ে কপালের রগ টিপে ধরে যেন নিজের সঙ্গে লড়াই করছে পঞ্চু।

পঞ্চুর কাছে সরে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে ডাকল রমাপতি। কি হয়েছে রে পঞ্চু? অমন করছিস কেন ভাই?

বাবাও বোধ হয় চলল ডাক্তারবাবু। দুপুর থেকে বারকতক ভেদবমি করে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাপড় থেকে সিকি, আধুলি, টাকায় মিলিয়ে কতকগুনো টাকা বের করল পঞ্চু। রমাপতি বলল, টাকাএনেছিস? কত টাকা?

পঞ্চু বলল মায়ের দরুন ট্যাকাটা এনেছি। কুড়ি ট্যাকা আছে।

একবার সাবি, একবার পঞ্চুর মুখের দিকে চেয়ে বলল রমাপতি, তোর মাকে আমি বাঁচাতে পারিনি। শুধু পাঁচটা টাকা আমি নোব, হাবুলকে দিতে। হাবুল রমাপতির কম্পাউণ্ডার। বাকি পনের টাকা রাখছি, তোর বাবার অসুখের জন্যে। না গুনেই ড্রয়ারের মধ্যে মুঠো করে টাকাগুনো ঢেলে রাখল রমাপতি। তারপর সাবিকে বলল, তুমি যাও সাবিত্রী। তুমি আমার জন্যে যা করলে অতিবড় আপনার জনও তা করে না। এতদিনে বুঝলাম লোকের ভাল করলে সব সময় ফেলা যায় না। তারপর পঞ্চুর দিকে চেয়ে বক্তব্যটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করল রমাপতি। সাবিত্রী কি করেছে, জানিস পঞ্চু? কিন্তু কথাটা শেষ হতে দিল না পঞ্চু। স্প্রিংয়ের মত সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বলল, চট্ করে আস্থন ডাক্তারবাবু, আমি চললাম।

রমাপতি একেবারে নিভে গেল। সাবি চলে যায় দেখে, জিজ্ঞাসা করল, তুমিও কি যাচ্ছ না কি চন্দরকে দেখতে?

না, বলে ডাক্তারখানার পিছনদিকের পথ ধরে চলে গেল সাবি।

৩

গুলিখাওয়া বাঘের হিংস্র জ্বালা নিয়ে বাড়ী ফিরে এল পঞ্চু। দাওয়ার ওপর ছেঁড়া মাদুরে বীভৎস নরককুণ্ড সৃষ্টি করে তার মধ্যে পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে চন্দর। তীব্র হেমন্তের আসন্ন সন্ধ্যায় হিম আসছে গল গল করে। আগড়গুনো লাগিয়ে দেবার লোক নেই। একটু পরেই ডাক্তার এসে পড়বে। এ অবস্থায় রুগীকে হয়ত ছোঁবেই না।

নিস্তব্ধ বাড়ী। শুধু রান্না চালাখানা থেকে ধোঁয়া আসছে। পঞ্চু বুঝল সারাদিনের পরে বউ হবিষ্যি চাপিয়েছে। কোন সাড়াশব্দ না করে সে রান্নাঘরে চলে গেল। দেখল, ভিজে কাপড়ে এলো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে নিবিষ্টচিত্তে আতপ চালের মালসায় জাল দিচ্ছে বউ।

বাবারে একটু পরিষ্কার করে দে। নোকে দেখলে বলবে কি? নরমভাবেই অভিযোগটা জানাল পঞ্চু! পঞ্চুর বউ বলল, এই ত বিছেন পত্তর কেচে মেলে দিয়ে তুটো চাল সেদ্ধ করতে এ্যালাম। বেলাস্ত নোংরা করলে কেডা মুক্ত করে বলত?

এত বড় বিপদ, বিশেষ করে বাপের এই শোচনীয় অবস্থায় বিবাহিতা স্ত্রীর মুখে এতটা নির্লজ্জ এবং নির্ম্মম কৈফিয়ৎ শুনেও পঞ্চুর ঠিক রাগ হল না।

উপর্য্যুপরি ধাক্কা খেয়ে বিসূচিকার মত কঠিন ব্যাধিও সাধারণ পেটের অসুখের মত সহজ হয়ে উঠেছে মনে। পঞ্চুর বউ আবার বলল, তুমি ত এখনও চান কর নি। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বিছেনডা আর ন্যাকড়াকানিগুনো একপাশে সরিয়ে থুয়ে, চট করে ডুবডা দিয়ে এস। বউয়ের কথাটায় যুক্তি ছিল বলেই হক, বা উপায়ান্তর ছিল না বলেই হক, পঞ্চু রাজী হল।

চন্দরের কথা বলবার শক্তি ছিল না। দুবার, তিনবার বাপকে ডাকল পঞ্চু। কিন্তু কোন উত্তর এল না। শুধু তৃষাদীর্ণ শুকনো ঠোঁটদুটো বারকতক কেঁপে উঠল। শীর্ণকঙ্কালের মত জরাজীর্ণ হাত পাগুনো অনুভূতি হারিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। অথচ এই দুখানা বলিষ্ঠ বাহুর বজ্রবেষ্টনীর মধ্যে সে এতটা কাল অনুদ্বিগ্নচিত্তে কাটিয়ে এসেছে। ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত খেলা করে বেড়িয়েছে। মাদুর আর বালিসটা সরিয়ে নিতে মাটির ওপর মাথাটা গড়িয়ে পড়ল চন্দরের। পঞ্চুর মনে হল অপটু হাতে সেবা করতে বসে বাপকে সে গলাটিপে হত্যা করল।

আর ত বিছেন বালিস নেই। কি পেতে দেবা বলত? পঞ্চুর বউ বলল। চাপা গলায় ধমকে উঠল পঞ্চু। যা, যা, দূর হয়ে যা এখান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে নিজের মাদুর বালিস এনে পেতে দিল পঞ্চু। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে পঞ্চুর নাম ধরে ডাকল রমাপতি। বউকে খিঁচিয়ে উঠে বলল পঞ্চু, যাও। আর ধেয়ান করে দঁড়িয়ে থাকতে হবে না, রান্নাঘরে যাও। তারপর চেঁচিয়ে সাড়া দিল, আস্থন ডাক্তারবাবু। হাবুল কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে করে ভেতরে এল রমাপতি।

কার্ত্তিকের স্বল্পায়ু বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে। এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে শাঁখের শব্দ উঠেছে। আগত মহামারীর প্রশমন চেষ্টায় বহুদূর থেকে হরিনামসংকীর্ত্তনের সুর শুষ্ক বায়ুস্তরে ভয়ের অভিব্যঞ্জনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। রমাপতি আলো আনতে বলল পঞ্চুকে।

সন্ধ্যাদীপের কম্পমান শিখায় চন্দরের অবস্থা দেখে বুক কেঁপে উঠল রমাপতির। অক্ষিকোটরের ভেতর থেকে নিষ্প্রভ চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। দুঃসহ রোগযন্ত্রণা বয়ঃক্ষীণ মুখাবয়বে শেষ

বিদায়চিহ্ন এঁকে দিয়ে চলে গেছে। প্রচণ্ড আক্ষেপে স্নায়ুপেশীগুলো সঙ্কুচিত। হাতদুখানা তখনও মুঠো বেঁধে রয়েছে। রমাপতিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু। কি দেখছেন ডাক্তারবাবু। বাঁচবে ত?

বাঁচবে কি রে? এ-ত মারা গেছে।

মারা গেছে? এমন চিৎকার করে জিজ্ঞাসাটা করল পঞ্চু, যে রমাপতি দাওয়া থেকে নেমে একেবারে উঠানে এসে দাঁড়াল।

আপনার ভুল হচ্ছে ডাক্তারবাবু, আপনি নাড়ীটা দেখুন। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে ডাক্তারের ডানহাতখানা চেপে ধরল পঞ্চু। রমাপতি বলল, নাড়ী দেখতে হবে না। আমি বলছি. সব শেষ হয়ে গেছে। পঞ্চুর হাতের মুঠি এত কঠিন হয়ে উঠল, যে রমাপতি আর সহ্য করতে পারল না। হাত ছাড়, ছিঃ, ওকি করছিস্? ডাক্তারের হাত ছেড়ে দিয়ে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল পঞ্চু। সেই অবসরে কম্পাউণ্ডারকে ইশারা করে অতি দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেল রমাপতি।

ডাক্তার চলে যেতেই পঞ্চুর বউ চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। দেখতে দেখতে দু একজন করে বেশ একটু ভিড় জমে গেল পঞ্চুর বাড়ীর উঠানে।

ওঠ. ভাই যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন তোর ঘাড়ে অনেক বোঝা। কথায় বলে, বাপ মা মরা দায়।—গাঁয়ের মোড়ল এশো বলল। পঞ্চু উঠে বসল। সমস্যার গুরুত্ব সত্যই বোঝার মত মনে হল পঞ্চুর। মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দেনা রয়েছে, তার ওপর যা পেয়েছিল ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে একটু আগে। কনকনে ঠাণ্ডা রাত। বিশেষ করে এমন একটা রোগ, যার নাম শুনলে ভয়ে

শিউরে ওঠে লোক। তা ছাড়া যার জোরে কাজ নির্ব্বাহ হতে পারে, সে অসাধ্যসাধনের সম্বল তার কোথায়? ঠিক সেই কথাই তুলল এশো।

তাই ত রে পঞ্চা, রাত হয়ে গ্যাল। গাঁয়ের ত এই আবস্থা! বলে কাক ওড়ছে ত শকুন পড়ছে। কলেরার মড়া, কেডা ছোঁবে বল দিনি?

পঞ্চু বলল তার জন্যে ভাবনা কি এশোদা? ঐ ত পাখীর মতন শরীল। ও হাড় কখানা আমি নিজেই বয়ে নিয়ে যাব। তবে ঘাট খরচাটা ত আছে। দুটো ছাগল বেচে কুড়ি টাকা পেয়েলাম, ধরে দিয়ে এলাম রমাপতি ডাক্তারকে। দুলেদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন এশো। সেই ভেবেই হয়ত কথাটা তুলল পঞ্চু।

আরে দুর্ পাগ্‌লা। তা কি হয়? ও বুড়ো হাড় দমে ভারি আছে রে। চারজনা নোকে হিমসিম খেয়ে যাবে। নোক হয়ে যাবে খুনি। সে ভাবনা নেই। তবে আসল হচ্ছে এই, বলে ডান হাতের আঙুল দিয়ে টাকা পরীক্ষার ভঙ্গী দেখাল এশো। তারপর আবার বলল, দুটো পাঁট বোতল হলেই চলবে, বুঝলি? ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে এশোর মুখের দিকে চেয়ে রইল পঞ্চু। কোন উত্তর দিতে পারল না।

বুঝে ছ্যাখ পঞ্চা, যা বললাম। লায়েক ব্যাটা থুয়ে মরেছে চন্দরখুড়ো। শেষ কাজডায় যেন খুঁৎ না থাকে।

তোমারে ত সবই বললাম এশোদা, পঞ্চু বলল।

ট্যাকার কথা! কডা ট্যাকা রে, যে হাম্‌লাচ্ছিস? ধর্, মড়িপোড়া ঠাকুরের স' পাঁচ ট্যাকা। দু পাঁট কালীমার্কা পাঁচ ট্যাকা। আর ছনার দেকানে, মালের মুখে মিষ্টি ফিষ্টি কেউ খাবেনা। শুধু মুড়ি,

আর আলুর তরকারি। তাতে ধর আরও পাঁচটা ট্যাকা। এই ত পনের ট্যাকার মামলা। ও হয়ে যাবেখুনি, তুই ভাবিস নে।

যাতে যা ভাল হয় কর দাদা। আমি আর কি বলব। পঞ্চু বলল।

তা হলে উঠি। দেখি কারে পাওয়া যায়, বলে তুপা চলে গিয়েই আবার ফিরে এল এশো।

হ্যা, ভাল কথা। কাল দ্যাখ্‌লাম তোদের সাদা গাইডে মোড়লদের মুসুরের ভুঁয়ে মুখ দেচ্ছে। মনে হল ভরা গাবিন। কেডা মাররে টাররে, এখন খন্দ কুটোর সময়। ছেড়ে দিস নে।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনে একটু চমকে উঠল পঞ্চু। তারপর বলল, যে বিপদ যাচ্ছে, এতে কি আর কিছু ঠিক থাকে ?

সে কথা আর বলতে। নিঃস্বার্থ পরোপকারের প্রেরণা নিয়েই হয়ত চলে গেল এশো।

কিছুদিন ধরে কৌতুকপুর আর তুর্গাপুরের দূর্ব্বল রন্ধ্রপথের যাবতীয় অলিগলি ঘোরা ফেরা করে, ছোটয় বড়য় মিশিয়ে প্রায় কুড়ি পঁচিশজনের আয়ু নিঃশেষ করে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি মহামারীর মৃত্যুবীজগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে গ্রাম তুখানার জল মাটি, আলো বাতাস প্রচণ্ড শীত আর প্রখর সূর্য্যকিরণের পরিশোধনাগারে পড়ে মালিন্যমুক্ত হয়ে উঠল।

কৌতুকপুর থেকে সকালের কাজ সেরে বাড়ী আসছিল সাবি, পথে দয়ার সঙ্গে দেখা হল। পুরানো একখানা পাটের কম্বল মুড়ি দিয়ে ঝিমুচ্ছিল বুড়ী। সাবিকে দেখতে পেয়ে তার নিরুদ্ধ চিন্তা বাধভাঙ্গা জলস্রোতের মত তরতর করে উঠল। তোর কথাই ভাবছেলাম সাবি। কম্‌নে থাকিস্ বল্‌ত ? বলে, জাড়কাল না

আঁটকুড়ো কাল। একরত্তি বেলা দেখতে দেখতেই পুইয়ে যায়। কমনে যে যাব, তার উপায় নেই। কাপড়ের আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে দয়ার পাশে এসে বসল সাবি।

আমিও সময় পাইনে দিদিমা। পাঁচ বাড়ীর কাজ সারতে বেলা ফুরিয়ে যায়। তোমার সঙ্গে একটু যে দেখা করব, সময় পাইনে। একথা সে কথা আলোচনার পর আসল কথা পাড়ল দয়া।

ইদিকে খবর শুনিছিস ?

কি ? সাবির কৌতূহল হল।

চন্দর আর চন্দরের বোয়ের ছেরাদ্দ হচ্ছে ঘটা করে। এ গাঁ ও গাঁ মেয়ে পুরুষ খাওয়ান হবে। ব্যাপারটাকে ঠিক সমর্থন করতে পারলনা সাবি, আবার নিন্দা করতেও পারল না। সাবি বলল, এত ভাল কথা দিদিমা। যা রোগের হিড়িক গেল। দুদিন গাঁয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ হবে।

রমাপতির ডাক্তারখানায় পঞ্চুর সঙ্গে দেখা হবার লজ্জাটা সে এখনও ভুলতে পারেনি। এমন কি পঞ্চুর এতবড় বিপদটায় সে তার বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারেনি। ইতিমধ্যে রমাপতি তাকে দু দিন ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু পঞ্চুর সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত কোন-দিকেই পা বাড়াতে তার ইচ্ছা হয়নি।

সাবির সহজ উত্তরটায় দয়া ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারল না।

আমোদ আহ্লাদ হবে, না চুলো হবে। আমোদ করবে কেডা র‍্যা ? ঐ তোর এশো, হেলা আর নব্‌নে ? পরের ভাল দ্যাখলে যাদের বুকে ভাতের হাঁড়ি বসে। থাকত সে সব নোক, ছিরিধর, ঐ যেইতির ছেরাদ্দ হচ্ছে ঐ চন্দর, আমোদ কারে বলে তারা জানত।

প্রাচীনযুগের মহিমাকীর্ত্তন দয়ার মুখে অনেক শুনেছে সাবি।

তাই দয়ার এই আক্ষেপোক্তির অর্থটা ঠিক ধরতে পারল না। সাবি হেসে বলল, ভাল মন্দ মানুষ সব কালেই আছে দিদিমা। ভাল নোক কি একালেও নেই ?

বয়সে প্রাচীন হলেও বুদ্ধির কোন জড়তা ছিলনা দয়ার। সাবির মুখ দেখেই তার মনের খোঁচাটা ঠিক ধরে ফেলল। তোর ভাল নোক ত পঞ্চা ? কেমন এই কথাইত বলবি ?

দয়ার সন্ধানী মনের তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় চমকে উঠে বলল সাবি, কাউর কথা ভেবে আমি ও কথা বলিনি দিদিমা।

দয়া বলল, না বলে থাকিস্, ভালই। তবে জানবি, পঞ্চার মত কুচক্কুরে শয়তান এ গাঁয়ে আর দুটো নেই। কথাটা সাবিকে বিঁধল।

কেন দিদিমা ?

কেন ? উদ খেতে খুদ জোটে না, সে করছে বাপ মায়ের ছেরাদ্দ, দু গাঁয়ের মেয়ে পুরুষকে ভোজ খেইয়ে ? এতেও ঠিক বুঝতে পারল না সাবি, পঞ্চু শয়তান হল কি করে ? সুতরাং আবার তাকে জিজ্ঞাসা করতে হল, ক্ষ্যামতা নেই, তবে করা কেন ?

সাবির মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে বলল দয়া, গরীবের জাত মারবে, একঘরে করবে। ভদ্দরনোকের মুখ ডোবাবে। তাই না গরু, বাছুর, ছাগল বেচে এই সব করছে ? সাবির মুখখানা শুকিয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, কারে একঘরে করছে দিদিমা ?

তোরে, আবার কারে ?

অপরিসীম ব্যথায় সাবির সুন্দর মুখখানা পোড়া ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে উঠল। অভিশপ্ত জীবনের যত কিছু লাঞ্ছনা ধিক্কারের কালিতে মাখামাখি হয়ে উঠল দয়ার এই কটি কথায়। তবুও

দাঁড়াবার শেষ চেষ্টা করল সাবি। এ কথা তোমায় কেডা বলেছে দিদিমা ?

মুখখানা কুঁচকে বলল দয়া, পঞ্চার বউডো সেদিন কেঁদে মরছিল বাঁওড়ের কাঁদায়। বাপের বাড়ী থেকে একজোড়া দুল এনেল বেচারী। সেডা অবধি গেছে এশো মুখপোড়ার গভ্ভে। পঞ্চার এখন মুরুব্বী হয়েছে এশো আর হেলা। যা করাচ্ছে, তাই করছে।

একটুখানি থেমে আবার বলতে লাগল বুড়ী ঃ এর মধ্যেই কোমেট (কমিটি) বসছে এশোর বাড়ী। কাল আমারে ডেকে পেঠিয়েল। গ্যালাম। অনেক কথা মোরে শোনাল। সেই কত-কালের পুরোনো কাসুন্দি। কবে তোর রোগ হয়েল। ডাক্তার দেখতে এসে কি করেল, সেই সব বিত্তান্ত। তারপর কবে নাকি তোরে ডাক্তারখানায় দেখেছে মজুমদার বাবুর খোট্টা দরোয়ান। সাবি আর চুপ করে থাকতে পারল না।

পঞ্চুদা কিছু বলল ?

তুই কি ন্যাকা ন্যাকা কথা বলিস ছুঁড়ী ! পঞ্চার মত না থাকলে তাদের সাধ্যি কি ওসব মতলব করে ?

কিন্তু দুলের ঘরে ত অনেক জায়গায় অনাচার আছে দিদিমা। ও সব একঘরে করা টরা ত কখনো শুনিনি।

সে কথা কি আর আমি বলিনি ? তাতে কি বলে জানিস ? বলে নিজের জাতের ভেতর যে যা করে করল, কিন্তু ভদ্দরনোকের গায়পড়ে ঢলাঢলি করলে জাতের মান যায়। থাক্‌গে, মরুক্‌গে। আমি ওতে নেই। মুখের ওপরে বলে দিয়ে এইছি। ও রকম ছেরাদ্দয় যাবও না, খাবও না।

না দিদিমা। আমার সঙ্গে তুমি কেন একঘরে হয়ে থাকবে? সাবির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আমি তোদের জাত নই সাবি। আমারে বললেই আমি যাব কেন? তা ছাড়া তিনকাল গিয়ে এককালে ঠ্যাকল। বেটা নেই, বিটি নেই, আমার আবার একঘরে কি লা? মরি, টেনে কেউ হাড়কখানা গঙ্গায় দ্যায় দেবে, না দেয় শেয়াল কুকুরে খাবে।

অন্য সময় হলে, দয়ার এই সত্যনিষ্ঠায় হয়ত অভিভূত হয়ে পড়ত সাবি। আজ কিন্তু তার মনে ভাবালুতার নামগন্ধও ছিল না। মন এবং শরীর তখন তীব্র জ্বালায় বিষিয়ে উঠেছে। এমন কি দয়াকে পর্য্যন্ত তখন তার আর ভাল লাগছে না। চলে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, যাই দিদিমা, বেলা হল।

দয়া বলল, এর মধ্যেই চললি? এই ত সকাল হল, আর একটু বস্। না দিদিমা। তোমাদের গাঁয়ের ভোজের চিন্তা করলে ত আর আমার পেট ভরবে না। বলেই তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলতে আরম্ভ করল সাবি।

দয়া চেঁচিয়ে ডাকল, যাস্‌নে সাবি। নাউগাছ পুতেলাম। একমাচা নাউ হয়েছে। একটা নিয়ে যা।

মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল সাবি, রেখে দ্যাও দিদিমা, যজ্ঞি-বাড়ীতে দরকার হবে।

সাবি চলে গেল।

৪

পঞ্চুর দুর্দ্দৈব উপলক্ষ্য করে ভদ্র ও ইতরপল্লীর যোগসূত্রটা একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। অক্লান্তকর্ম্মী হেলা ভূপতিমজুমদারের বাড়ী ঘন

ঘন যাতায়াত করতে লাগল। হেলার বউও প্রায় নিত্যসহচরী হয়ে উঠল পঞ্চুর বউয়ের। মারীভয় কেটে গেছে। পিতৃমাতৃ দায়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে পঞ্চু। সারাদিন প্রায় বাইরে বাইরে থাকে। সাবি আর রমাপতিকে নিয়ে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কথাটা আলোচনা করে হেলার বউ।

শ্রাদ্ধের আর চারপাঁচ দিন দেরী আছে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে পান দোক্তা গালে দিয়ে সকাল বেলা পঞ্চুর বাড়ী এল হেলার বউ ও ডেকে পঞ্চুর বউয়ের সাড়া নিল। কি লো বউ? কাজকম্মের বাড়ী এত নিঝুম কেন? লোক জন নেই, কুটুম সাক্ষেত নেই?

হাতের কাজ ফেলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল পঞ্চুর বউ। আর দিদি। ভারি ত বিয়ে তার ছু পায় আলতা। পাঁচ বেটাবিটির অজগে পড়ে নিজেও ডোবাবে, আমারেও ডোবাবে। পঞ্চুর বউকে দেখেই গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে গেল হেলার বউ। তোর কানের ফুল কি হল লা? খুলে থুইছিস্? মাগো! মুখখানা কি হাড়কুচ্ছিৎ দেখাচ্ছে।

মাসাবধি কাল গায় মাথায় তেল নেই। একখানি মাত্র কাপড় প্রত্যহ কাচা আর গায় শুকানোর ফলে ময়লা আর দুর্গন্ধে অসহ হয়ে উঠেছে। তার ওপর দৈবাৎলব্ধ দুলজোড়াটার অভাবে তার রূপের যে এমন অপমৃত্যু ঘটতে পারে, বিশ্বস্ত প্রিয়সখীর মুখে সেই কথাটা শুনে লজ্জায় সে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী হেলার বউ আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। পঞ্চুর বউয়ের কাছে এগিয়ে এসে তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, গেছে ত? ও আমি আগেই জানতাম। তা মোর কাছে কাঁদলে কি হবে? দিলি কেন

শুনি ? চোখে ঠিক জল না থাকলেও কান্নার কথায় সেটা ঠিক এসে পড়ল। হেলার বউ বলল, তুই য্যামন ন্যাকা। সোজা বলতে হয় দোব না। বললে কি শোনে ? পঞ্চুর বউ বলল।

না শোনে তোর কি ? বলেই এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল হেলার বউ, কালকের মেয়ে তুই, কি জানবি বল ; নোকে কথায় বলে অনঙ্কার। ও জিনিস না থাকলে পুরুষমানুষ কি বশ হয় ? যতই সোয়ামীর স্যাবা কর, চটক না খোললে মন পাবি কিসে ? এক গা গহনা পরলে শাঁকচুন্নিও পটের বিবির মতন ছ্যাখায়। আর যতই সোন্দর হক, হেউলি হয়ে বেড়ালে কেউ ফিরেও ত্যাকায় না।

নারীমনের চিরলোভাতুর জায়গাটায় কৌশলে খাসা হাত বুলিয়ে গেল হেলার বউ। পঞ্চুর বউয়ের মনে হল যেন সে জলে ডুবে গেছে। বাঁচবার আর কোন উপায় নেই।

আর ত কোন হাতপথ নেই। যা হবার হয়েই গিয়েছে।

হাত নেড়ে বলে উঠল হেলার বউ, হয়ে গেলেও ত বাঁচতাম এখনও হবে। এশো মুখপোড়ার মৎলব কি মোরা বুঝি নে ? ও ত ঘাঁৎ খুঁজেই বেড়ায়। বলে 'ভাগাড়ে গরু মরে, শগুনের টনক নড়ে'। এই হাতীর খরচে নেবিয়ে দিয়ে যা আছে গরু, বাছুর, ঘটি-বাটি সব টেনে ঘরে তোলবে। তারপর কমনে দাঁড়াবি বল দিনি ? সমস্যা গুরুতর হলেও পঞ্চুর বউ তার কি করতে পারে ? কিন্তু এত বড় জটিলতারও যখন একটা পথ দেখিয়ে দিল্ হেলার বউ, তখন তার বিস্ময়ের আর সীমাপরিসীমা থাকল না।

হেলার বউ বলল, পঞ্চু ঠাকুরপো বড্ড বোকা। চোখ থাকতে নোক যদি কানা হয়, তার কেডা কি করবে বল দিনি ? ট্যাকা নেচ্ছে

এশোর কাছে। আর অত বড় নোকের সঙ্গে যে ছেলেবেলায় কত খেলা করে বেড়াল, রাজা মানুষ, একবার গিয়ে দ্যাঁড়াতে পারছে না তার কাছে? এই আমি পেরাতঃ বাক্যিতে বলছি, যদি না পায়, আমার নাম বদলে থুস্। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চুর বউ, কেডা দিদি? কার কথা বলছ?

ওরে মজুমদার বাবু রে? আর কেডা? বলে ভদ্দরনোকের আস্তাকুড়ও ভাল।

কিন্তু এতখানি ভরসা পেয়েও ঠিক আশ্বস্ত হতে পারল না পঞ্চুর বউ। তোমার এক কথা দিদি। কবে ঘী দিয়ে ভাত খেয়েল বলে কি আজও হাতে গন্ধ থাকে? ছেলে বেলায় খেলা করেছে বলে, ভদ্রনোক, আজও সেই কথা মনে করে বসে আছে? বলেই একটু হাসল পঞ্চুর বউ। হেলার বউয়ের সর্ব্বশরীরে উত্তেজনা খেলে গেল। বক্তৃতা করার ভঙ্গিতে হাত মুখ নেড়ে বলল, ওলো আমাদের মিন্‌সেকে কি সোজা নোক মনে ভাবিস না কি? ও যেখানে পা পায়, এ গাঁয়ের নোক সেখানে মাথা পাততে পায় না। সাবি আর ঐ ডাক্তার মিন্‌সেকে নিয়ে যে ঘোঁট পাকাবে, তারেই ট্যাকা দেবে বাবু। ডাক্তারের ওপর বলে হাড়ে চটে রয়েছে। তুই ঠাকুরপোরে একবার দেখা করতে বলিস্। যেন দেরী না করে।

খেতে বসে বউয়ের মুখ থেকে কথাটা শুনল পঞ্চু। আর্থিক সমস্যার দিক দিয়ে শুনতে খুব মন্দও লাগল না জিনিসটা। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে সে ভাবতে লাগল। ছোট জাতের ছেলে হলেও একদিন সে সত্য সত্যই ভাল বেসেছিল ভূপতিকে। অবস্থা বিপর্য্যয়ে সে সমস্ত স্বপ্ন হয়ে গেলেও আজও সে-অকৃত্রিম অন্তর্মিলনের একটা শেকড় হয়ত লুকিয়ে থাকতে পারে দুজনেরই মনে। তা

নয়ত সেবার বউয়ের অসুখের কথা জানাতেই সে ছুটে এসে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল কেন? অবশ্য অনেক কিছু বদলেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবও বদলেছে ভূপতির। কিন্তু সেও কি বদলায় নি?

পঞ্চুকে আর বেশী ভাবতে হল না। নিজের গায়ের রংয়ের মত তেলকুচ্‌কুচে হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে পঞ্চুর বাড়ী এল হেলা, ও বিনা ভূমিকাতেই জানিয়ে দিল মজুমদার বাবু তাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

হেলাকে বসতে বলল পঞ্চু। পঞ্চুর নরম ভাব গতিক লক্ষ্য করে উৎফুল্ল হয়ে উঠল হেলা। পঞ্চু বলল, মজুমদার বাবু আমায় ডেকেছে কেন রে?

গুরুতর দৌত্যকার্য্যের ওজন বজায় রাখতে গিয়ে বলল হেলা, তা ত জানিনে। বললেন, পঞ্চারে আজই একবার পেঠিয়ে দিবি।

তা হলেও একটু কি আর আঁচ পাস নি? তাই জিগ্যেস্ করছি।

অপাঙ্গে চোখ ঠেরে বলল হেলা, তা আর পাই নি? বড় নোকের ঝোঁক চেগেছে ঐ সুমুন্দির ডাক্তারডার মাথা খেতে। তারপর পঞ্চুর হাঁটুতে একটা চিমটি কেটে বলল, এই মরশুম রে পঞ্চা, এই তালে কিছু বেগিয়ে নে।

রমাপতির বদনামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাবি। নিজের চোখে তার হাত ধরতে দেখেছে রমাপতিকে। তবুও লজ্জায় কথাটা কারুর কাছে প্রকাশ করেনি পঞ্চু। অথচ যেন হাওয়ায় ডালপালা সমেত গজিয়ে ওঠল রমাপতি আর সাবিকে নিয়ে কলঙ্কের কথাটা।

পঞ্চু বলল, আচ্ছা সবাই যে তোরা ঢাক পিটছিস, সত্যিই কি কেউ কিছু দেখেছে? পঞ্চুর ভাবটা বেশ ভাল লাগলনা হেলার।

এত যত্নে এত লোকের চেষ্টায় যে গল্পটা গড়ে উঠেছে, খেয়ালী পঞ্চুর জিজ্ঞাসার খোঁচায় সেটা যে অঙ্কুরেই ফেঁসে যাবে, এত কাঁচা ছেলে হেলা নয়। হেলা বলল, ওরে কথায় বলে, পাপ আর পারা—কখন চাপা থাকেনা বুঝলি? না দেখলে কথাডা শূন্য থেকে এল? বেশত। তোর কাজকর্ম্ম মিটুক। একদিন সন্ধ্যের পর ছ আনি তুলেদের পাড়ায় যাস্, নিজের চোখেই দেখবি।

তুলের ছেলের মনের ওপর আদর্শবাদের যেটুকু ছেঁড়া খোঁড়া খোলস তখনও কোন রকমে লেগে ছিল, প্রত্যক্ষদর্শী হেলার কথায় সেটা কোথায় উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের তলদেশ থেকে নিষ্ফল অভিমানের একটা ঢেউ উঠে তরে কণ্ঠনালী একেবারে রুদ্ধ করে দিল।

চতুর হেলা প্রসঙ্গটা আর বেশীদূর নিয়ে যেতে চাইল না।

যাই বল্ পঞ্চা। বাবুর মোদের দয়ার শরীল। আর কি ভালই না বাসে তোরে। খুড়ো, খুড়ী মারা যাবায় খবর পেয়ে কি তুঃখ্যু! বলে, পঞ্চা একবার মোর কাছে এল না? ঐ গো-দাগারে দিয়ে বুড়ো বুড়ীরে সাবাড় করল!

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করেও পঞ্চুর মুখ থেকে হেলা যখন সম্মতিসূচক একটা কথাও বের করতে পারল'না, তখন সে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল।

তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল। কি বলিস্ পঞ্চা?

হেলার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু, কি কথা?

বা রে! তুই কি স্বপন্ দেখছিস্ না কি বলত? বাবুর কাছে যাবি নে?

না ভাই। ওসব কিছুই ভাল নাগছে না। গঙ্গার ঘাটে বাবা মার বালির পিণ্ডী দিয়ে এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব। কত দুঃখে যে কথাটা বলল পঞ্চু, হেলার মত নিষ্ঠুর লোকেরও বুঝতে বাকী রইল না। ঠিক সেই সময় পঞ্চুকে ডেকে এশো, নবীন আর সুদো বাড়ীর ভেতর এসে হাজীর হল।

কি বলিস্ র‍্যা নবনে। এইঠানডায় খাওয়া দাওয়া হবে। টান কাল, জল বিষ্টি নেই। ঘাসগুনো চেঁচে ফেললেই হবে। পুরো মাতব্বরীর সুর জমেছে এশোর গলায়।

কিন্তু নবীনকে আর উত্তর দেবার সময় দিলনা হেলা।

তোমরা ত ইদিকে লঙ্কাভাগ করছ, পঞ্চা যে গা তোলে না। বলে, বালির পিণ্ডি দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

সবাই চমকে উঠল, এমন কি পঞ্চুও। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের কথাটা দরবারে তুলতে লজ্জায় তার মাথা কাটা গেল।

এশো পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করল, একথা কেন রে পঞ্চা ?

এবারও উত্তর দিল হেলা। এতটা অপ্রত্যাশিত ভাবে, যে পঞ্চু একেবারে হাল্কা হয়ে পড়ল।

সাবিড়ে ভেস্তে গেল। ওর মনডায় বড্ড ঘা নেগেছে !

শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল এশো। ভেস্তে যাওয়াচ্ছি। মনে ভেবেছে গাঁয়ে বুঝি নোক নেই। তারপর পঞ্চুর বিবর্ণ মুখ-খানার দিকে চেয়ে বলল, আর তুইও দেখছি ছেলে মানষের বেহদ্দ হলি পঞ্চা। বিয়ে করা মাগ পেলিয়ে গ্যাল, তাই চুলের মুঠি ধরে ঘরে ফিরিয়ে এনে ঘর করছে নোকে, আর কমনেকার কেডা তার ঠিক নেই, সেই শোকে তুই গাঁ ছেড়ে পালাবি ? বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল সে।

এশোর পরিহাসের সঙ্গে সুর মিলিয়েই হয়ত অলক্ষ্যে একটু হেসে নিল পঞ্চুর নিয়তি। নতুবা নীচাঙ্গের এই সব আলোচনায় রাগ না করে বরং আতঙ্কে দু একবার শিউরে উঠল পঞ্চু। মনে পড়ল দুশ্চরিত্র এই এশোকে নিয়ে কত দিন তার মাকে কত কটু কথা শুনিয়েছে তার বাপ। বাপমায়ের শোকের অনুভূতির সঙ্গে লজ্জা আর অপমানের বিষাক্ত স্মৃতি—মায়ের চোখের জল, বাপের ক্ষোভ, আজও অহরহ মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকা আর মেয়ে-মানুষের ওপর অত্যধিক লোভ এশোর। আজ সেই এশো......পঞ্চু আবার চমকে উঠল। ঠিক সেইসময় ঝিমিয়েপড়া পঞ্চুকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করল এশো।

শোন্ পঞ্চা! দিন কেছিয়ে এসেছে। ওসব ধাষ্টামো করবার আর সময় নেই। ট্যাকার জন্যে এটকে থাকবেনা। তবে তোরে খুব জেগাড়ে থাকতে হবে, বুঝলি? মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে পেরায় পঞ্চাশ খানার ওপর পাতা পড়বে। তা শত্তুরমুখে ছাই দিয়ে চাল নাগবে দেড় মণ ত বটেই। তিতপ্পর বেলায় নোক খাবে, খিদের টানে খাবে। খুব জোগাড়ে থাকবি। আর ধর এই ভাজা কড়াইএর ডাল করবি। তাও ধর পাঁচ সের। আর এই ত হচ্ছে নদীতে কোমর ঘেরার সময়। চরণের কাছ থেকে আধ মনটাক মাছ যদি বাগাতে পারিস......।

প্রতিবাদ না করেই এশোর মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করল পঞ্চু। বেশ, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা রইল। ট্যাকা জোগাড় করতে পারি হবে, নইলে ঐ যে বালির পিণ্ডি বলছি, ঐ কথাই রইল।

গলার আওয়াজ চড়িয়ে উওর দিল এশো, ট্যাকার জন্যে ভাবনা

আমার, তোর নয়। শান্ত সুরেই উত্তর দিল পঞ্চু, ধার আমি করব না এশোদা।

এশো একেবারে নিভে গেল, কিন্তু পাল্টা চাপ দিতে ছাড়ল না। এ কথা এগুতে বলা উচিত ছিল পঞ্চা। নোক জানাজানি হয়ে গিয়েছে, এখন উলডো গাইলে ত চলবে না! কি বল গো তোমরা? বলা বাহুল্য সকলেরই সমর্থন পেল এশো।

তবুও দৃঢ়তা বজায় রেখেই জবাব দিল পঞ্চু, যাতে লোক না হাসে সে চেষ্টা করব। তোমরা বন্ধুনোক, তোমাদের মুখ ছোট হলে আমারই লাগবে। কিন্তু আমার মুখ পানেও একটু চেয়ো তোমরা।

এশো একটু হাসল। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলল, তা বেশ। কমনে গোপ্ত ধনদৌলত থাকে, খুঁড়ে বের কর। আমরা চললাম। চল হে তোমরা। হেলা ছাড়া সবাই চলে গেল।

শব্দহীন হাসিতে প্রায় শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হল হেলার। বেশ বলিছিস পঞ্চা। একেবারে মুখের মতন জুতো যারে বলে। তা হলে বাবুর ওখেনে যাওয়াই ঠিক করলি?

হুঁ, বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পঞ্চু। তারপর আনমনে বলল, বাবু না দেয়, অভয় মোড়ল আছে। কিন্তু কথাটার সমর্থন খুঁজতে গিয়ে দেখল, হেলা কখন উঠে গেছে।

৫

ভূপতি মজুমদারের সদর বৈঠকখানার সামনে এসে যখন দাঁড়াল পঞ্চু, অগ্রহায়ণের সন্ধ্যায় তখন আসন্ন শীতের লক্ষণ সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। বৈঠকখানা ঘরের দোর জানালা বন্ধ, ভেতরে আলো জ্বলছে। পায় পায় বারান্দা পর্য্যন্ত এসে আর অগ্রসর হওয়া উচিত

কিনা ভাবছিল পঞ্চু, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে বাইরে এল খোদ ভূপতি মজুমদার এবং অন্ধকারে আগন্তককে ঠিক চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, কে রে ? হেলা ?

না, আমি। গলার স্বর শুনেই পঞ্চুকে চিনতে পারল ভূপতি। কে ? পঞ্চা ? আয়, ভেতরে আয়।

বিগত কালের ভাব ভালবাসার স্মৃতির ওপর ঠিক অনন্যানির্ভর হতে পারল না পঞ্চু, অধিকন্তু মনে হল কে যেন তাকে জোর করে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে গেল। পঞ্চু ঘরের মধ্যে আসতেই ভেতরে এসে দোরটা চেপে বন্ধ করে দিল ভূপতি।

প্রশস্ত ফরাসের ওপরে ধবধবে চাদর পাতা। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গায়ের র‍্যাপারখানা বিস্তৃত করে পা পর্য্যন্ত ঢেকে ফেলল ভূপতি। মেঝের ওপর বসতে যাচ্ছিল পঞ্চু, ভূপতি বলল, ওখানে কোথায় বসছিস্, ঐ কম্বলখানা পেতে নে।

কথামত কম্বলের ওপর বসল পঞ্চু। দোর জানালা বন্ধ, শীতও বিশেষ বোঝা যায় না। এ অবস্থায় সাধারণতঃ মন যেটা চায় সেই কথাটাই তুলল ভূপতি, কি খাবি ? সিগ্রেট ? না তামাক সাজবি ?

বাল্যসুহৃদের মুখে মৌতাতের কথা শুনেও, মনটা ঠিক তাতল না পঞ্চুর। কিরে ? কথা কইছিস্ না যে। বলেই নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল ভূপতি। পঞ্চু গড়গড়া থেকে কল্কেটা তুলতেই আবার বলল ভূপতি ঃ ঐ যে। সাজাই আছে। ধরিয়ে নে।

কল্কে ধরিয়ে হাতে করে টানতে লাগল পঞ্চু। লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ঘোরাফেরা করতে লাগল ভূপতি ;— পঞ্চুরবিপদের কথা, তার বর্ত্তমান সমস্যার কথা, গ্রামের টুকিটাকি কথা। পঞ্চুও কোন রকমে ভাসা ভাসা জবাব দিতে লাগল।

গড়গড়ার নলে ঘন ঘন গোটাকতক টান দিয়েই সোজা হয়ে উঠে বসল ভূপতি। হাঁ রে। তুই নাকি খুব ঘটা করে বাপমার শ্রাদ্ধ করছিস্ শুনলাম। তা বেশ। তা ছাড়া, এই একবারই ত কাজ, বাপ মা ত আর আসবে না।

পঞ্চু বলল, ক্ষ্যামতা থাকলে করাই উচিত। কিন্তু আমার হাঁড়ির খবর ত সবই জানেন বাবু। এই কথাটাই চাইছিল ভূপতি।

জানি রে জানি শুধু তোর কেন অনেক বেটার খবরই জানি। যা ছিল সবই ত ডাক্তারের হাতে তুলে দিইছিস। এখন সামলাবি কি দিয়ে শুনি? সম্বলের মধ্যে ত গরু আর জরু। তা গরুটা ত এশো হারামজাদার গর্ভে গিয়েছে বুঝতেই পারছি। তারপর বাকিটা কি জরু দিয়ে সারবি? রাগ করিস নে পঞ্চা। ছেলেবেলায় অনেক আড্ডা দিইছি তোর সঙ্গে। বলতে পারি, তাই বললাম।

প্রাক্তন বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে রসিকতাটা চালু করলেও, বর্ত্তমান বন্ধুত্বের স্বীকৃতিটা যেন কৌশলে এড়িয়ে গেল ভূপতি। এ অবস্থায় কোন মুখে আর সাহায্য চাইবে পঞ্চু?

পঞ্চুকে নিরুত্তর দেখে আবার বলল ভূপতি। সেবার বউয়ের অসুখের সময় কেঁদে পড়লি এইখানে, অথচ বউ যদি মরত এ্যাদ্দিন আর একটা জুটে যেত। আর বাপ মা দুজনেই যখন গেল, তখন এ পথ আর মাড়ালি নে। ভাবিস্ নে, খোঁটা দিচ্ছি। কিন্তু দুঃখ্যু হয় কি না তুই নিজেই বল।

বস্তুতঃ অভিযোগের সুর থাকলেও কথাগুনোর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যেটা মনকে আঘাতও করে আবার আকর্ষণও করে। পঞ্চু বলল, ও কথা আর বলবেন না বাবু। একলা মানুষ, এত বড় ঝঞ্ঝাট। কি করে মাথার ঠিক থাকবে? যাদের বুদ্ধিতে

আমার বুদ্ধি, তারাই চলে গেল। পঞ্চুর গলার স্বরে আবেগ ঘনিয়ে এল।

কেন ? তোর ত মন্ত্রির অভাব নেই। একদিকে শ্রীমান এশো, আর একদিকে শ্রীমতী সাবি। একজন ডুবিয়েছেন, আর একজন ডোবাচ্ছেন। পঞ্চু আর মাথা তুলতে পারল না। ভূপতি আবার বলল ঃ রমাপতির পেয়ারের রত্ন সাবি, সেত তার পসার বড়াবেই, তুইও অমনি তার কথায় নেচে উঠলি ? কাউকে জিজ্ঞাসা নেই, কিছু নেই, তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে আনলি ? আরে, ও বেটা চিকিচ্ছের কি জানে রে ! এ্যাদ্দিন যে করে খাচ্ছিল, সে এই শম্মার দৌলতে। বুঝলি ? বলে নিজের বুকের উপর হাতদিয়ে দেখাল ভূপতি।

এইবার নরম সুরে প্রতিবাদ করল পঞ্চু, ডাক্তার ভাল কি মন্দ সে কথা বলছি নে। তবে সাবি ওনারে ডাকতে মানা করেছিল ; বলেছিল রাজু ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

তাই করলি নে কেন ? রাজু আজ তিরিশ বছরের ওপর শিশি বোতল নাড়ছে। হাতুড়ে হলেও অনেক কিছু শিখেছে। পঞ্চু বলল, তাই ত ডেকেছিলাম। তিনি এলনা দেখে দয়া গিয়ে রমাপতি বাবুকে আনল...... ।

দয়ার নাম শুনেই তেলে বেগুনে জলে উঠল ভূপতি, দয়া ? দয়া ত আনবেই। সাবি আর রমাপতির ব্যাপারটা ঘটাল কে ? ঐ দয়াই ত। ছোটলোকের মাগিগুনো বুড়ো হলে ঐ করেই ত খায়। দয়া, উনিই ত হচ্ছেন মালিনী মাসী। দাঁতে দাঁত ঘষে শেষ কথাটা বলল ভূপতি।

এত শুনেও সাবিকে অবিশ্বাস করতে মন চাইল না পঞ্চুর। পঞ্চু চুপ করে রইল।

ভূপতি আবার বলল ঃ জলজ্যান্ত তারা বাগদির ছেলেটাকে মারল ঐ বেটা। আর সাবি হারামজাদী বলে বেড়াচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়, পান্ত আর আমানি খাইয়ে ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে তার বাপমা। বোঝ একবার আস্পর্দ্ধাটা! বাপ মায়ের নামে বদনাম দিয়ে বেড়াচ্ছে নাগরের মান রাখতে, এত বেহেড মেরে গেছে ছুঁড়ীটা।

পঞ্চুর এ খবরটা জানা ছিল না।

এ কথা কোথায় শোনলেন? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

কেন, তুই শুনিস্ নি? আমার কথা বিশ্বাস না হয়,যাকে খুসি জিগ্যেস্ কর। মাঘ মাসে, বোশেখ মাসে যেমন বোষ্টমরা ঘরে ঘরে নাম দেয়, ঠিক সেই রকম করে বেড়াচ্ছে সাবি! তোর বাড়ীতেও যাবে। বড্ড ঝামেলা যাচ্ছে তোর, তাই হয়ত যেতে পারে নি।

ভূপতির ইঙ্গিতটা বজ্রের মত কাজ করল। একবেলার অসুখে যখন মারা গেল চন্দর, ঠিক তার আগের দিন মা মারা গেছে। বউয়ের সহানুভূতি এবং সান্ত্বনা পঞ্চুর ঠিক মনে লাগেনি, এমন কি ভালও লাগেনি। দিশাহারা মন ঘুর্ণিপাকের মধ্যগত নৌকার মত যে অবলম্বন খুঁজেছিল সেটুকু সে পেতে পারত সাবির কাছে। দৈবচক্রে রমাপতির করতলগত হলেও, এত বড় বিপদে যে সাবি তাকে ভুলে থাকতে পারে, দুঃখ দুর্দ্দশার চরম আবর্ত্তের মধ্যেও পঞ্চু ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি। ভূপতির কথাটা এতদিন পরে যেন তার রুদ্ধ কৌতূহলের খিল খুলে দিল।

আমার বাড়ী তাকে যেতে হবে না। সে পথ আমাকে বন্ধ করতেই হবে। কিন্তু আপনি একটু না দ্যাখলে ত হয় না।

নিশ্চয়ই দেখব। তোরা হচ্ছিস্ গাঁয়ের লোক। তোদের বিপদে আপদে দেখব না ত কি দেখতে যাব ঐ রমাপতি ডাক্তারকে?

তোদের দেওয়া মানে, গাছের গোড়ায় জল ঢালা। আর ও শালাদের দেওয়া মানে হচ্ছে—ভস্মে ঘি ঢালা।

পঞ্চুর সমস্ত সঙ্কোচ সরে গেল। বেদনাহত মন তার তখন প্রতিহিংসায় মারমুখী হয়ে উঠেছে। বুদ্ধির বিন্দুমাত্র সুস্থতা থাকলে সে দেখতে পেত, ছেলেবেলায় গলাগলি করে বেড়ালেও কোনদিন সে হাত পেতে কিছু চায় নি ভূপতির কাছে। পঞ্চু বলল, আর ত সময় নেই। ত্বদিন বাদেই কাজ।

বেশ ত। যা দরকার কাল আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস। তার জন্যে ভাবনা কি? পারিস, শোধ দিবি। না পারিস তাতেও ক্ষেতি নেই।

না, না। শোধ দেব বৈকি? চরণের কাছে আমার অনেকগুনো ট্যাকা পাওনা আছে। পেলেই দিয়ে যাব।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে যা হয় হবে। কিন্তু ঐ কথা থাকল। সাবি আর ঐ শালা ডাক্তারকে একটু সমঝে দিতে হবে।

দারুণ উত্তেজনায় আর বসে থাকতে পারল না পঞ্চু। দাঁড়িয়ে উঠে বলল, তা দোব বৈ কি। গাঁয়ে ঘরে বাস করে গাঁয়ের নোককে অমান্যি করার যে কি ফল, ভাল করেই বুঝিয়ে দোব।

৬

দয়াকে মনের ঝাল মিটিয়ে শুনিয়ে দিয়ে এসেও মনের ক্ষোভ ঠিক গেল না সাবির। বাড়ী এসে যথারীতি কাজকর্ম্ম করল, রোজ যেমন করে। কিন্তু অন্যদিনের মত কিছুতেই আর মনের যোগ খুঁজে পেল না। সারাদিনের পর খেতে বসে মনে হল যেন অনেকদিন অসুখে ভুগে পথ্য করতে বসেছে। কষ্ট করে রান্না না করলেই হত।

শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চুও তার শত্রু হল ! না জেনে শুনে ভুল বুঝল ! দয়ার মুখে যেটুকু শুনেছে তার যদি অর্দ্ধেকও সত্য হয়, তা হলেও পঞ্চুর দোষ ত কম দাঁড়ায় না ! মায়ের অসুখ মাথায় করে তাকে ঘর বয়ে ডাকতে আসতে পেরেছিল, অথচ বাপের অসুখে তাকে চোখের ওপর দেখেও কোন কথা বলল না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। এমন কি রমাপতি কেন তার হাত ধরেছিল সেটা বুঝিয়ে বলতে পর্য্যন্ত দিল না। রমাপতির মুখ থেকে শুনতে না চাক, এতদিনের মধ্যে তাকেও কি একটিবার জিজ্ঞাসা করতে পারত না কথাটা ? কি তার অপরাধ ? তার কেউ নেই বলে কি কারুর একটু বিশ্বাসও সে পেতে পারে না ? স্বামী গেছে, মেয়ে গেছে বলে কি তার সব ফুরিয়ে গেছে ? সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ফোঁটা কতক জল তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

এ ভাবে কতক্ষণ কেটেছে ঠিক ছিল না, চমক ভাঙ্গল সাবির ঘরের পিছনে পায়ের শব্দ শুনে। অনাবৃত অঙ্গন। গ্রাম্য রাস্তাটা লোক চলাচলতির মর্জিমত সরে এসে প্রায় তার অন্তপুর সীমানার ভেতর দিয়েই চলে গেছে। তাড়াতাড়ি স্খলিত আঁচলটা তুলে নিয়ে জড়িয়ে ফেলতে গিয়ে দেখল, পঞ্চু আর দেশো বোধ হয় তারার বাড়ীর দিকেই চলেছে। অভ্যাসবশতঃ প্রথমটা পঞ্চুর দিকে চাইল সাবি। পঞ্চুর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যও ছিল না। সাবির পাশ দিয়ে চলে গেলেও মুখটা তার বিপরীত দিকে ফেরান ছিল। চলতে চলতে তার দিকে অনেকবার ফিরে ফিরে চাইল দেশো। আজ কিন্তু সাবির মান অপমানে বাধল না জিনিসটা। সাবি বুঝল তারাকে শ্রাদ্ধের কথা জানাতে গেল পঞ্চু।

শীতের বেলায় তখন ভাঁটার টান ধরেছে। বাঁশঝাড়ের মাথায়

রৌদ্রের বিদায়ী আভা এসে পড়েছে। ছায়াচ্ছন্ন ভিজে মাটি থেকে ঠাণ্ডা উঠতে আরম্ভ করেছে। এখনও তার তুবাড়ীর জল দেওয়া বাকী। কিন্তু রাস্তায় বেরুলে যদি আবার দেখা হয় পঞ্চুর সঙ্গে? চোখাচোখি হলেও যদি চোখ ফিরিয়ে নেয়? তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দিল সে।

একটু পরেই কথাবার্ত্তার শব্দ পেল সাবি। তারার গলা আর দেশোর অনর্গল বকুনি। পঞ্চুর মুখে কিন্তু কোন কথা ছিল না। দেখতে দেখতে পায়ের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল। প্রেতপুরীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সাবির মাথার ভেতর তখন ঝড় উঠেছে। পূর্ব্বাপর সমস্ত জীবনটা হাততালি দিয়ে সহস্রমুখে তাকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করেছে;—মিথ্যা তার বাল্যজীবন, মিথ্যা তার ছ' আনি তুলেদের বনেদী ঘরে জন্মান। মিথ্যা তার বিবাহ, মিথ্যা তার স্বামী সঙ্গ, মিথ্যা তার মা হওয়া, মিথ্যা তার রূপ.........।

সাবি ঘরে আছিস না কি? তারা ডাকল। কোন উত্তর না দিয়ে দোর খুলে বাইরে এল সাবি। ঘুমুইলি? জিজ্ঞাসা করল তারা।

না, ঘুমুইনি। এমনি শুয়ে ছেলাম। ইচ্ছা করেই তারাকে বসতে বলল না সাবি।

তারা বলল, এই খানিক আগে পঞ্চা এয়েল। কাল ঘাট, পরশু ছেরাদ্দ। সেই কথা জেনিয়ে গ্যাল।

বেশ ত। যেয়ো। পেট ভরে খেয়ে এস।

তাই বটে রে সাবি, তাই বটে! কাল আমার মন্থুর ওস্থুচ যাবে। উপযুক্ত বেটার মাথা খেইছি। আমার ত পেট ভরাই আছে সাবি। আর কোন পেটে খাব? এতক্ষণে সাবির মনের জ্বলুনিটা একটু কমে গেল।

তা খেতে না পার, গিয়ে দাঁড়াতে ত পারবা। তাতেই হবে।

তারা একটু হাসল। ক্ষীণ ক্লান্ত হাসি।

তা নয় রে, তা নয়। পঞ্চার মরেছে বাপ মা। বুড়ো হলে বাপ মা সম্মায়েরই মরে। আর আমার মরেছে বেটা। এর মধ্যেই হাত-মুড়কুৎ হয়ে উঠেল। পঞ্চা নোকের জাত মারতে পারে। নোককে চাল কেটে তেড়িয়ে দিতে পারে। আমার আর অত বুকের পাটা নেই রে দিদি! কত পাপ করেলাম, তাই এই দগ্‌দানি।

সাবি একটু লজ্জা পেল।

তারা বলল, সেই কথাই বললাম পঞ্চারে। তা কি শোনবে? বড়নোকের উস্কানি পাচ্ছে। সাবি জিজ্ঞাসা করল, কি বললে তুমি তারাদা? বললাম দুলেদের মধ্যে ওসব একঘরেটরে ত ছেল না। ও সব আছে বামুন, কায়েৎ আর লবশাকের মধ্যে। নিকে স্যাঙ্গা যাদের চলে, তাদের আবার একঘরে কি? বোঝলাম, বড়নোকের যুক্তিতে কাজ হচ্ছে। পঞ্চু কি উত্তর দিল ইচ্ছা করেই সেটা জানতে চাইল না সাবি।

তারা বলল, আমি বলি কি, তোরা সম্মাই মিলে এটা মিটিয়ে ফ্যাল। পঞ্চাও ঠাণ্ডা হক্। তুইও আর ঐ ডাক্তারের কথায় থাকিস নে। গরীব বড়নোকে কখনও মিল খায় না সাবি। তেলে জলে কখন মেশে? বল্ ত, পঞ্চারে ভাল করে বুঝিয়ে বলি।

না তারাদা। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। এমনি থেকেই ত সব হল। এখন একঘরে হয়ে কি হয় দেখাই যাক না। একরোখা ঘোড়ার মত ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিল সাবি।

তারার বিষণ্ণ মুখখানার ওপর আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠল। দাওয়ার খুঁটিতে ভর দিয়ে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

ঠিক সেই সময় সম্ভবতঃ তারাকে খুঁজতে সাবির বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল তারার বউ।

এখানে বসে গুলতান করছ, উদিকে রাত পোয়ালে যে আমার মরণ হবে সে ভাবনা কোন ভালখাগী ভাববে শুনি? দরদ ত কাঁড়াচ্ছ মুখে মুখ দিয়ে। এটা যে একটা অছিলা এবং সাবিকে আক্রমণের ভূমিকা, কারুর বুঝতে বাকী রইল না। ঝগড়ায় নাম ছিল তারার বউয়ের। সাবির মুখখানা ভয়ে কালি হয়ে গেল। তারাও যে ভয় পায়নি তা নয়। তাড়াতাড়ি সে বউয়ের সামনে গিয়ে বলল, চ, বাড়ী চ, আর বকিস্ নে।

কেন বকব না? কার ধার করে খেইছি? তোমার মতন খোসা-মুদে নই আমি। নইলে তোমার ছেলে মরার কথা নিয়ে কুচ্ছ গেয়ে বেড়াচ্ছে যে, তার বাড়ীতে এসে ফ্যান চাটছ। গলায় দড়ি জোটে না! নিজে ঢলাচ্ছিস্, ঢলা। নোকের সব্বনাশের কথা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক পিটতে নজ্জা করে না?

বউকে জোর করে টানতে টানতে বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল তারা। সাবি আর চুপ করে থাকতে পারল না। ঢাক ত আমি পিটি নি। ধম্মের ঢাক বাতাসে নড়ছে। এখনও একটি ছেলে রয়েছে বউদি। নিজের দোষটা দেখতে শিখ।

এইবার বউয়ের সঙ্গে রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে হল তারাকে।

তারা বলল, তুই চুপ কর না সাবি। ওর আর এখন মাথার ঠিক নেই।

মাথার ঠিক না থাকলেও নানান কথায় প্রতিপক্ষকে জর্জ্জরিত করতে কসুর করল না তারার বউ।

চোখের মাথা খা, চোখের মাথা খা, চোখে পোকা পড়ুক।

সবাই তোর মতন আঁটকুড়ী হবে কেন লা ? তোর মতন জাতে বেজাতে ঘুরি কি যে ছেলে থাকবে না ?

সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে তখন গাছপালা ঘেরা জমাট মহলে ; মাথার ওপর হুম্‌ড়িখেয়ে পড়া ভাঙ্গা চালের নীচে। সাবির জীবনের আকাশেও আলো বলতে আর কিছু নেই। লাঞ্ছনা আর অপমানের মসিমলিন দিগন্তরেখায় চলার পথ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। টলতে টলতে ঘরে গেল সাবি। প্রদীপে তেল দিয়ে সন্ধ্যা জ্বালল। গঙ্গাজলের ছিটে দিল মাথায়। অঞ্জলি ভরে নিয়ে জল ছড়িয়ে দিল দ্বার-দেবতার উদ্দেশ্যে। প্রদীপের দীপ্ত ছটায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল মহাকালীর পটখানা। শুধু দেখা। প্রণাম নয়, প্রার্থনা নয়।

সাবি মাসি ঘরে আছ ?

আছি। কে রে ? পদ্ম ? হারু ঘোষের মেয়ে পদ্ম ডাকতে এসেছে। জল দেয় সাবি তাদের বাড়ী।

সন্ধ্যে হয়ে গেল, জল দেবা না ? মা বলল, এক ফোঁটাও গঙ্গাজল নেই ঘরে।

আজ আর পাচ্ছি নে মা। কাল সক্কালেই দিয়ে আসব। মাকে বলগে আজকের রাতটা চালিয়ে নিতে। যাও, নক্ষী মেয়ে। লক্ষ্মী মেয়ে কিন্তু সহজে ছাড়লা না সাবিকে।

দু ঘড়া জল দ্যাও, তার দুদিন অন্তর কামাই। নিজেরাই যদি তুলে নেব, তবে পয়সা দিয়ে নোক রাখা কেন ?

তোমার মাকে বলতে বলেছি পদ্ম, তুমি কেন কথা বলছ ? আমার শরীলডা আজ ভাল নেই, তাই বলছি। যেতে যেতে শুনিয়ে গেল পদ্ম, রোজ রোজ য্যাখন শরীল খারাপ, পরের কাজ নেওয়া কেন বাপু ?

দাঁড়াও পদ্ম, আমি যাচ্ছি। দোর বন্ধ করে বাইরে এল সাবি। পদ্ম কি বলল শোনা গেল না। কিন্তু সাবি ঝড়ের মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশিষ্ট দু বাড়ীর জল তুলে দিয়ে বাড়ী আসছিল সাবি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কনকনে শীতে গাঁ একেবারে নিশুতি। আধখানা কাপড় প্রায় ভিজে গেছে সাবির, অন্ধকারে জলের কলসী নিয়ে সামলে চলতে পারে নি। কৌতুকপুরের সীমানা পার হয়ে দুর্গাপুরে পোঁছুবে, রাস্তার বাঁক ঘুরতেই টর্চ্চের তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। চোখে হাত দিতে যাবে, একরশি দূর থেকে জিজ্ঞাসা এল, কে যায়? সঙ্কোচশূন্য গলায় উত্তর দিল সাবি, দেখতেই ত পাচ্ছেন মেয়েলোক, চোরও নয়, ডাকাতও নয়।

আর একবার ঝলসে উঠল বিজলী বাতি। কে, সাবিত্রী? এত রাত্তিরে কোত্থেকে আসছ?

সাবিত্রী! এ নামে তাকে ডাকে শুধু রমাপতি ডাক্তার। সাবি চমকে উঠল, কিন্তু ভয় পেল না। ডাক্তার বাবু? রুগী দেখতে গিছলেন? সাবি দাঁড়াল। জনমানবশূন্য জায়গা। চেঁচিয়ে ডাকলেও লোকের সাড়া মেলে কি না সন্দেহ।

না। গিছলাম একটু ঐ মাঠের পাড়ায়। তোমাদের গাঁয়ে ত লোক পেলাম না।

খোঁচাটা বিঁধল সাবিকে। সত্যই লোকের দরকার রমাপতির।

লোক পেলেন?

না। বলেই আবার টর্চ্চের বোতাম টিপল রমাপতি।

ইঃ, তোমার কাপড় যে একেবারে ভিজে গেছে সাবিত্রী! এই দারুণ ঠাণ্ডা, আর সেদিন অতবড় অসুখটা থেকে উঠলে!

উদ্বেগের সুরটা সাবিকে স্পর্শ করল এবং সেই স্পর্শাতুর মনকে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অবশ করে দিল রমাপতি নিজের গায়ের শালখানা তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে।

এ কি করছেন ? ছিঃ। খুলে নিন। বলে শালখানা খুলতে চেষ্টা করল সাবি।

নোব। আগে তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি। চল. আর দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই। বলতে বলতেই সাবির হাতখানা ধরে একটা টান দিল রমাপতি। সর্ব্বনাশ ! হাতখানা যে একেবারে শীতে জমে গেছে। আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু। এ রকম করে গাঁয়ে ঢুকলে, যদি কেউ দেখে, আমার আর রক্ষে থাকবে না। আপনি যান, এটুকু আমি একলাই চলে যাচ্ছি।

রক্ষে তুমি এমনিই পাবে না সাবিত্রী। কালই পঞ্চার বাড়ীর কাজে ওদের মুরুব্বীরা ঘোঁট পাকাবে। মাঝখান থেকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিমোনিয়া বাধিয়ে আর লাভ কি ? সঙ্গে সঙ্গেই টর্চ্চটিপে পার্শ্ববর্ত্তী বনের ওপর আলো ফেলল রমাপতি। দেখছ, কি রকম শিশির পড়েছে, যেন বৃষ্টি হয়ে গেছে।

পঞ্চুর কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সাবির, 'ভাল থেকে, কি ভাল হল তোর ?' আজ ঠিক সেই কথাই বলল রমাপতি। না ভাল তার কিছুই হয় নি। তার চরম দুর্গতির ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে আজ পঞ্চু।

সাবি বলল, আপনার যে ঠাণ্ডা লাগবে।

আমার গায় মোটা জামা আছে। সাবির আর প্রতিবাদ করতে ভাল লাগল না। পথ চলতে চলতে বলতে লাগল রমাপতি ঃ এখন বাড়ী যাব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো কি করছে, ভগবান জানেন ! যাব, রান্না করব, তবে তারা খেতে পাবে।

সাবি চমকে উঠল। বলল, কেন? তাদের মা কোথায়?

শরীর খুব খারাপ। এখানে কে দেখাশুনো করে, বল? তাই কোলের বাচ্ছাটাকে পর্য্যন্ত কাছে রেখে দিনকতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিইছি। কত লোক রাখলাম। কেউ দুদিন, কেউ দশদিন। মেয়েটার গলার হারছড়াটা নিয়ে পালালেন একজন। এইরকম করেই চলছে।

সাবি বলল, শুনলে কষ্ট নাগে। কিন্তু আমার হাতের জল ত চলবে না আপনার।

রমাপতি বলল, সত্যিই দুলের হাতের জল চলে না। কিন্তু তোমার হাতের জল কেন, ভাতও চলে। অন্ততঃ আমারত চলেই।

সাবির সারাদিনের আঘাতজর্জর মনের ওপর রমাপতির কথাগুনো যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিল। সে বলল, আপনার কাছে না হয় চলল, কিন্তু আপনাদের সমাজে ত চলবে না।

আমার এটা দেশ নয়। তা ছাড়া আমার এখন দরকার। চলা না চলা ওসব পরের কথা।

আপনি না হয় এখন জোর করে খেলেন, কিন্তু আমারত একটা ভয় আছে।

ওটা মিছে ভয় সাবিত্রী। দুদিন পরেই কেটে যাবে।

এইবার এসে গিছি। আপনি চলে যান ডাক্তারবাবু।

সাবির ঘরের সামনে এসে টর্চ্চ জ্বালতেই তার উদ্ভাসিত শিখায় দেখতে পেল দুজনেই, দাওয়ার খুঁটি ধরে তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চু।

রমাপতির শালখানা সাবির গায় জড়ানই রইল। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল রমাপতি। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তুরমত

হেসে বলল পঞ্চু, ডাক্তারকে ডাক সাবি। আমি চলে যাচ্ছি।
ধরে পাকড়ে নিয়ে এলি, আর দুয়োর গোড়া থেকেই চলে যাবে?

সেই দেখতেই বুঝি এয়েলে পঞ্চুদা? তা আমারে নিয়ে যা করবা, ঠিক করেইত থুয়েছ, আর চোরের মতন আড়ি পাতবার ত কোন দরকার ছিল না!

রাগ করিস নে সাবি। আমি চললাম। ভয় কি? ঝোপে ঝাপেই কমনে লুকিয়ে আছে নাগর। এখুনি আসবে।

শোন পঞ্চুদা! যেয়ো না। কথা শুনে যাও।

থাক, আর দরকার নেই।

পঞ্চু চলে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

পঞ্চুর মনের একটা দিক ধ্বসে গেল। গ্রামের লোকের প্ররোচনায় এবং কতকটা নিজের মনের জ্বালায় সাবিকে জব্দ করবার সংকল্প করলেও, মনের যে অংশটা সাবির সঙ্গে, তার সুখদুঃখের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল এতদিন, সেখানথেকে সে ক্রমাগত বাধা পাচ্ছিল। তার মধ্যেই যখন বাপ মায়ের শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে এল এবং ঘটনার চাপে পড়ে নিজের হাত দিয়েই সাবির শাস্তিবিধান অনিবার্য্য হয়ে উঠল, পঞ্চুর নিভৃত অন্তরাত্মা আর সে ব্যবস্থা মেনে নিতে পারল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে সাবির কাছেই ছুটে এল। এ দারুণ সঙ্কটে সাবির সাহায্য ছাড়া সে কি করতে পারে?

আজ, এই প্রথম পৃথিবীর শক্ত মাটির ওপর তার মাথা ঠুকে গেল। নরম মনের কোমল জায়গার ওপর বিশ্বস্ততার যে কটা শিকড় তখনও বেঁচে ছিল, নিজের হাতে তার মূল শুদ্ধ উপড়ে দিল সাবি। শীতের রাত্রে উত্তরীয়মাত্র সম্বল করে যখন সে বাড়ী ফিরে এল, কপালের ওপর তখন তার ঘাম দেখা দিয়েছে। বাড়ীর উঠানে কনকনে ঠাণ্ডায় বসে নিভৃত আলোচনা চলছে মাতব্বরদের মধ্যে। অপরাধীর মত বাড়ী ঢুকল পঞ্চু।

কেডা রে? পঞ্চা নাকি? গলাটা হেলার।

হাঁ। বলেই সোজা ঘরে চলে গেল পঞ্চু।

আমরা এখেনে ভান্‌তে নাগলাম, আর তুই ঘরে গিয়ে সেঁধুলি?

এশো ডেকে বলল পঞ্চুকে। আসরে দেশোও ছিল। সেও টিপ্পনী কাটতে ছাড়ল না। ইদিকে এসো হে ভায়া। তুমি যে একেবারে টিকে ধরিয়ে ছাড়লে! শিয়রে সংক্রান্তি, আর তুমি উটমুখো হয়ে বেড়াচ্ছ! এ সমস্ত কথা পঞ্চুর কানে গেল কি, গেল না ঠিক নেই।

পঞ্চুর বউ ঘরে কি একটা করছিল, বলল, শুনতে পাচ্ছ না? তোমায় ডাকছে যে। ডাকুকগে। তুই বিছেনটা পেতে দে, একটু শোব।

কেন? শরীল ভাল আছে ত?

শরীল খারাপ হবে, তবে শুতে পাব? এ কি কলুর বলদ পেয়ছিস না কি?

রাত পোয়ালে তোমার বাড়ীতে কাজ, সন্ধ্যে থেকে সব এসে বসে রয়েছে, তাই বলছি।

বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে কি খানিকটা ভাবল পঞ্চু। তারপর ঘর থেকে বাইরে এসে দোরটা ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিয়ে উঠানে নেমে এল। কল্কেটা পঞ্চুর হাতে তুলে দিয়ে এশো বলল, কমনে ঘোরছিস্ রে পঞ্চা? ও রকম গাওড়া দিলে কি এখন চলে ভাই। পুরুত ঠাকুরকে খবর দেওয়া হয়েছে?

হুঁ। বলে কলকেয় টান দিতে লাগল পঞ্চু।

এশো বলল, ভালয় ভালয় যাতে উদ্ধার হতে পারিস তাই ভাব।

তোমরা ত রয়েছ, যাতে যা ভাল হয়, কর।

পঞ্চুর কথায় সন্তুষ্ট হল এশো, কিন্তু সাহস পেল না। এতবড় কর্ম্মকাণ্ডের মালিক হয়েও উৎসাহ নেই পঞ্চুর?

এশো বলল, আরে আমরা ত আছিই। তুই বললেও আছি, না বললেও আছি। ভাল কথা, গাঁয়ের নোক সব বলা হয়েছে ত?

হাঁ।

আচ্ছা তুই নাম কর দিনি, কারে কারে বললি ?

সাবিকে বাদ দিয়ে সবাইকে বলা হয়েছে। ক্লান্তভাবে বলল পঞ্চু।

বেশ, বেশ। ঠিক হয়েছে। এইবার বুঝুক বাছাধন. গাঁয়ে মানুষ আছে কিনা। এশোর কথাটা সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করল সবাই।

কি জানি কি বোঝবে ? বিরক্ত ভাবে বলল পঞ্চু।

তার মানে ? তুই কি বলছিস্ পঞ্চা ? এশো জিজ্ঞাসা করল।

বলছি গাঁয়ে মানুষ ত আছে, কিন্তু ঠগ বাছতে যে গাঁ ওজোড়। এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ। পাপ যদি সে একাই করত, তা হলে হয়ত জব্দ হত।

পঞ্চুর কথায় সকলেই চমকে উঠল ; এমন কি ঘরের বন্ধ দরজাটা একটুখানি ফাঁক হয়ে গেল।

এশো বলল, তা বেশ ত। তোর ছাগল, ইচ্ছে হয় ন্যাজের দিকেই কাটবি। না হয়, তেল সিঁদুর দিয়ে সাবিরে নিয়ে এসে খাওয়া। গাঁয়ের নোক কিন্তু তোর বাড়ীর ত্রিসীমানাও মাড়াবে না, তা বলে দেলাম। কি বল গো তোমরা ? সবাই যা বলল সেটা এশোর কথার পুনরাবৃত্তি, এবং সবাই একসঙ্গে মত প্রকাশ করায় রীতিমত গোলমালের সৃষ্টি হল। ইতিমধ্যে ঘরের দোরের শিকলটা স্পষ্ট নড়ে উঠতেই দেশো ঘরের দিকে চলে গেল ও ফিরে এসে হেলার কানে কানে কি বলল। হেলা উঠে দাঁড়াল ও পঞ্চুর হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল, তুই একটু শুয়ে পড় পঞ্চা। নানান ঝক্কিতে মাথা জ্বলে গ্যাছে। তারপর, ফিরে এসে সকলকে শুনিয়ে চাপাগলায় বলল, ওডার কথা তোমরা ধোর না বাপু। এই-

মাত্তর ওর বউ আর শাউড়ী বলল, য্যামন করে হক ওদের দায়ডা ঠেকিয়ে দ্যাও পাঁচজনা মিলে।

তা হলেও যার কাজ সে যদি ব্যাঁক ধরে···এশোকে থামিয়ে দিল হেলা। তুম্‌মো য্যামন বাপু, কাজ ওর হলে কি হবে। বলে, ট্যাকা ত মোর কাছে। বাবু কি বিশ্বেস করে এতগুনো ট্যাকা ওর হাতে দ্যায়!

ভূপতি মজুমদারের টাকায় আর হেলার মধ্যস্থতায় শ্রাদ্ধ মিটে গেল। সাবিকে বাদ দিয়ে ভোজের ব্যাপারটাও নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। আহার ব্যবহারে সম্পূর্ণ সংস্কারশূন্য সহজ রীতি-পদ্ধতির ওপর ভূপতি মজুমদারের আমদানিকরা শাস্তিব্যবস্থা কিন্তু ঠিক কার্য্যকরী হল না। যথাসময়ে মাতব্বরের দল কথাটা তুলল, কিন্তু সাবির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কেউ কোন কথাই বলল না। অধিকন্তু খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরিবার সময় কেউ কেউ যেন বলেও গেল, পঞ্চু যখন মাথা টাথা মুড়িয়ে ফেলেছে, বাবুদের কাছ থেকে ধার করে একগাছা পৈতে পরে ফেললেই ভাল করত।

সংসারের হিসাব নিকাশ কোন দিনই ভাল করে বোঝেনি পঞ্চু। তবুও হেলার মুখে ভূপতি মজুমদারের কাছে তার ঋণের পরিমাণটা শুনে সে একটু চমকে উঠল।

দুশো ট্যাকা? বল কি হেলা দা?

হবে না? গাঁয়ের শালান্‌রা গোঁফ জুবড়ে গিলে গ্যাল, মাগিনরা যখন খেয়ে উঠল যেন দশ মেসে পোয়াতির মত হাঁসফাঁস করছে! মতে সাধ্‌খার দোকানেই ত গেছে পাঁচ গণ্ডা ট্যাকার ওপর। তা ছাড়া ময়রা আছে, জেলে আছে, অগদানী পুরুতের ফর্দ্দ আছে।

তাত বুঝলাম। জন খেটে সংসার চালিয়ে এত ট্যাকা শোধ করব কি করে? হাসিতে ডান চোখের কোনটায় অর্থপূর্ণ ইশারা ফুটল হেলার, তুই যামন বোকা। ওরে বড়নোকের ট্যাকা। ওদের হাত ঝাড়লে পাহাড়। ও কড়া ট্যাকায় ওনাদের কি আসে যায় বল্‌ত?

তবুও ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝল না পঞ্চু। বলল, তা হলেও দিতে ত হবে।

আরে দূর্‌ হতভাগা! দু'দিন মন যুগিয়ে চল, তারপর একদিন পায় ধরে কেঁদে বলবি মাপ করতে। দেখবি, এক আধলাও উপুড়হস্ত করতে হবে না।

না, না, তা হয় না, হেলাদা। ও আমি পারব না।

হেলাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, বেশ ত, দিতে পারিস্‌ ভালই। তবে দিবি কমেন থেকে বলত? পরের মেয়ে নিয়ে ঘর করিস্‌। নিজের ত মুরোদ হল না এককুচি রূপোর খোঁচা দিতে। তার ওপর বাপেরা যা দেল, তাও বেচে মেরে দিলি। বল্‌ত, এতে সোয়ামীর ওপর ছেদ্দা ভক্তি থাকে কোন বউয়ের? মনে মনে হেলার কথাটা মানতেই হল পঞ্চুকে।

বাড়ী ফিরে এসে দেখল পঞ্চু, ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। বউ বাড়ীতে নেই। তামাকের সরঞ্জাম বাইরে ছিল। পঞ্চু তামাক সাজতে বসল। হঠাৎ ভিজে কাপড়ের সপ্‌ সপ্‌ শব্দ কানে যেতেই চমক ভাঙ্গল পঞ্চুর। জলের কলসী নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চুর বউ, কাজে গেলে না? না, ভাল নাগছে না। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে নির্লিপ্তভাবে বলল পঞ্চু। পঞ্চুর দৃষ্টির আড়ালে সরে গিয়ে

গামছা জড়িয়ে ভিজে চুল নিঙড়াতে লাগল পঞ্চুর বউ। তারপর মাথা মুছে কাপড় বদলাতে ঘরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কড়া তামাকের গন্ধ ছাপিয়ে সুস্নিগ্ধ গন্ধ পঞ্চুর নাকে এল।

বাস তেল কমনে পেলি? বউকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু। ভিজে কাপড়খানা চালের বাতায় টাঙ্গিয়ে দিয়ে পঞ্চুর নাকের সামনে মাথাটা এগিয়ে দিল পঞ্চুর বউ। ছ্যাখ ত, কি রকম বাস। হেলার বউ একটু মেখিয়ে দেল। এই রকম এক শিশি তেল এনে দেবা আমারে? হেলার বউ রোজ এই তেল মাখে।

সর্, সর্। নাকে তেল লেগে যাচ্ছে। বউয়ের কাছ থেকে একটু সরে বসল পঞ্চু। হেলার কথা বাদ দে। ও হচ্ছে বাগাতে ওস্তাদ। আমার বাড়ী কাজ হল, ট্যাকা দিল বাবু। কভা লোক খাওয়াল। যা খাওয়াল, লোকে ত ছি ছি করছে। বলে দুশ ট্যাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এখন কমনে থেকে যে দেনা শোধব, ভগবানই জানেন। পঞ্চুর বউয়ের চোখদুটো চকচক করে উঠল; বললে তুমি রাগ করবা, কিন্তু আসলে বোকা হচ্চ তুমি। হেলা বাগাতে পারে, তুমি পার না? দেনা শোধ করবা বলছ, ট্যাকাটা কার হাতে দেবা শুনি? বাবুর, না হেলার?

হেলার সঙ্গে তুলনা করায় প্রথমটা মনে মনে তেতে উঠেছিল পঞ্চু, কিন্তু টাকা শোধের কথাটায় সে কিছু যুক্তি খুঁজে পেল।

পঞ্চু বলল, হেলারে দেব কেন? বাবুর হাতেই দেব।

তাই দেবা। দেখ কি হয়?

কি আবার হবে?

বাবু নেবে না। আমি বলে থুলাম।

মাথা নেড়ে বলল পঞ্চু, নারে না, অত সোজা নয়। শুধু

শুধু এতগুনো ট্যাকা কেউ কাউরে ছ্যায় আজকাল ? এবার কিন্তু পঞ্চুর চেয়েও পাকা কথা বলল পঞ্চুর বউ। শুধু হাতে কি অতগুনো ট্যাকা কেউ দেয় ? পঞ্চু আর উত্তর খুঁজে পেল না। উত্তরটাও পূরণ করল পঞ্চুর বউ। এত পরিপাটিভাবে যে, পঞ্চু অবাক হয়ে গেল।

বউ বলল, বড়নোকের খেয়াল। ট্যাকা ছইড়ে ওন্‌রা নোক বশে রাখে। ঐ করেই গুছিয়ে নিল হেলা। এইবার পঞ্চু রুখে উঠল, তোর হেলার না পিণ্ডি পাকিয়েছে ! ও ত ভূপতিবাবুর কুত্তা। মদ জোগাবে, মাগী জোটাবে, মিথ্যে সাক্ষী দেবে। সাতজরমো না খেতে পেলেও ওসব কাম আমার হাত দিয়ে হবে না। পঞ্চুর বউ রাগ করল না।

হেলা যে কাজের যুগ্যি সেই কাজই ত করবে। তুমি তার মতন করতে যাবা কোন ছঃখে ? তৃপ্তিতে ভরে উঠল পঞ্চুর মনটা। মনে হল বউ তাকে ঠিক চিনেছে। তুই ঠিক বলিছিস্ ! এর আগেও বাবু আমারে ঐ কথা বলেছিল। তা বড়নোকের সঙ্গে মিশতে গেলে মাঝে মাঝে একটু মদ ভাঙ্ খেতে হয়। তা না হয় খাব। কি বলিস ?

পঞ্চুর বউ বলল, তুমি স্যামন বোকা। মদ খেলে ঐ খইয়েই ভুলিয়ে থোবে। আজে বাজে নোকের সঙ্গে না বেইড়ে বাবুর কাছে যাবা। যা বলে শোনবা, তা হলেই ঠিক হবে।

পঞ্চুর বউ উঠে ঘরে চলে গেল এবং একটু পরে একবাটি মুড়ি তেল মাখিয়ে এনে পঞ্চুর হাতে দিল। বউয়ের কথাবার্ত্তা, পরিচর্য্যা আজ তার মনটাকে ভরিয়ে তুলল। মুড়ির বাটি নামিয়ে রেখে সে বউকে একেবারে কোলের ওপর বসিয়ে নিল। স্বামীর আদরে অভিভূত হলেও মাত্রাজ্ঞান ভুলল না পঞ্চুর বউ। তাড়াতাড়ি

কোল থেকে নেমে পড়ে পঞ্চুকে বলল, ন্যাও খেয়ে ন্যাও। বেলা হল। রান্না করতে হবে।

পঞ্চু খেতে আরম্ভ করতেই বউ আবার বলতে লাগল, আগে থাকতে যদি এই মতলব করতে তুলজোড়াটা ঘোচত না। ন্যাড়া বোঁচা কান নিয়ে এয়োস্ত্রী মানুষ বাইরে বেরুতে নজ্জা নাগে।

ও কথাটা প্রায়ই শোনে পঞ্চু, তুলজোড়াটা যাবার পর থেকেই।

র, র বাপু! তু'দিন সবুর কর। সময় হলেই গড়িয়ে দোব।

তোমার সময়ও হয়েছে, আর গইড়েও দিয়েছ।

না হয়, পাবিনে। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল।

আজ বোধ হয় সংকল্প করেছে পঞ্চুর বউ, কোন কিছুতেই রাগ করবে না। পঞ্চুর উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপব বলল, শোন, আগে থাকতে নেপিয়ো না। একজোড়া কানপাশা বিক্রী আছে। খুব ভাল জিনিস, এখন সব দাম নাগবে না। পরে দিলে চলবে। বল ত, নেই।

কেডা আবার তোরে গয়না দেবে? তুল তুল করে তুই পাগল হয়ে যাবি দেখছি!

দেবে একজনা। বল নেব কি না?

না, না। ওসব দরকার নেই এখন। একপয়সা রোজগার নেই, চারিদিকে ধার কর্জ্জ। এখন আমার ঐ সব করবারই সময়!

রাগে গর গর করতে করতে বাড়ী থেকে চলে গেল পঞ্চু।

২

সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোর বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল সাবি। তখনও বেশ ঘোর আছে, এখানে ওখানে তু'একটা

নক্ষত্র মিট মিট করছে। পায়ের তলার মাটি বরফের মত কনকনে। হিমে শিশিরে ভিজে উঠেছে বন ঝোপ; এ পাড়া থেকে ও পাড়া। বহুদিনের মুখস্থ পথ; দুর্গাপুর আর কৌতুকপুরের সংযোগসীমা। পথের বাঁকে দয়াবুড়ীর চালাঘব। খানিকটা বাঁশবন দুধারে। তারপর পঞ্চুর বাড়ী। ফিকে অন্ধকারে তখনও অস্পষ্ট। বহুদিনের পরিচিত মর্ম্মকেন্দ্রগুলো দেখেও আজ দেখল না সাবি। আরও খানিকটা গেলে রমাপতির বাড়ী। বনভূমির কোন দূরান্ত মধ্যভাগ থেকে ঘুমভাঙ্গা এক ঝাঁক পাখী ডেকে উঠল। সামনের দিকে চাইতেই রমাপতির একতালা বাড়ীখানা দেখতে পেল সাবি।

বাড়ীর সংলগ্ন বাগান, রাস্তার ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাখারীর ঘনসন্নিবিষ্ট বেড়া। ধারে ধারে জুঁই, জাঁতি আর অপরাজিতার ঝোপ। মাঝখানে কাঠের গেট, ভেতর থেকে বন্ধ করা। শীতের ঘন কুয়াসার আস্তরণে ভোরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ফুলের গন্ধে। হেনা, অপরাজিতা, ছোটবড় ফুলগুলো পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে।

আলো ফুঠছে চারদিকে। গ্রাম থেকে বাজারে যাবার সদর রাস্তার ওপর রমাপতির বাড়ী। একটু পরেই সুরু হবে লোক চলাচল। স্বপ্নে দেখা বিবস্ত্রার মত লজ্জায় মরে গেল সাবি। ফিরে যাবে কি, গত রাত্রের অপকীর্ত্তির প্রমাণ স্বরূপ রমাপতির শালখানা তখনও তার হাতে। চেঁচিয়ে ডাকবার ইচ্ছা হলেও স্বর আসে না গলায়। আস্তে আস্তে কাঠের গেটটা ঠেলতেই আশাতিরিক্ত শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভেতর থেকে গম্ভীর গলার আওয়াজ এল, কে? কোনরকমে পরিচয় দিল সাবি, দুয়োরটা একবার খুলুন ডাক্তারবাবু।

একটু পরেই ঘরের দোর খুলে বাইরে এল বছর ছয় সাতের একটি ছেলে। চোখ ছুটোয় তার তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে।

কি চাই? জিজ্ঞাসা করল ছেলেটি।

ছুয়োর খোল, বলছি। গেট খুলে দিয়ে ছেলেটি বাইরে এল।

তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে এসে পিঠ দিয়ে গেটটা বন্ধ করে মাটিতে বসে পড়ল সাবি। রাস্তা দিয়ে কে যেন যাচ্ছে মনে হল। শাল খানা ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে বলল সাবি, তোমার বাবাকে এই চাদরখানা দাও ত খোকা। ছেলেটি সাবির মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে একটু হেসে ঘরে চলে গেল।

ছোট ছেলের মুখের এই সামান্য হাসিতে লজ্জায় সমস্ত শরীর শিউরে উঠল সাবির। চলে যাবে কিনা ভাবছে, কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে এল রমাপতি।

ওখানে বসে কেন সাবিত্রী, ভেতরে এস। রমাপতির মুখের দিকে চেয়ে হাঁ, না কিছুই বলতে পারল না সাবি। শুধু তার অচল পা ছুখানা গেটের বাইরে না গিয়ে রমাপতির ঘরের দিকেই এগিয়ে গেল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা সাবির চমক ভাঙ্গল রমাপতির ঘরের মধ্যে এসে। ঘরের ভেতর জিনিসপত্র ঠেসা, কিন্তু কেন কিছুরই গোছ-গাছ নেই। খাটের ওপর রমাপতির বিছানা। ভদ্রলোকের শয্যা যে এমন অপরিষ্কার হতে পারে, ছুলের মেয়ে সাবির তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন হল। বালিশ লেপের ওয়াড়গুলো চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। চাদরেরও সেই দশা। বালিশের তুলো বেরিয়ে সারা বিছানায় ছড়িয়ে আছে। খাটের নীচে ধামা, ঝুড়ি, হাঁড়ি, কলসী গড়াগড়ি যাচ্ছে। মেঝের ওপর নতুন একখানা তোষকের ওপর কাঁথামুড়ি দিয়ে একটি বছর চারেকের মেয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার

পাশেই দু তিন বছরের ছোট্ট পাখীরছানার মত একটি ছেলে ময়লা গেঞ্জী গায় দিয়ে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় পড়ে আছে। গায়ের কাঁথাখানা ঘুমের ঘোরে বড় বোনটির গায়ে সবটা জড়িয়ে গেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় অপকর্ম্মের ফলে শোবার জায়গাটা ভিজে জবজব করছে। ভিজা বিছানায় গায়ে ঢাকা না থাকায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে ছেলেটি।

কি দেখছ সাবিত্রী? আমার ঘরকন্না? দেখ, কত সুখে আমি থাকি। খাটে বসে বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল রমাপতি। ছোট ছেলেটিকে সরিয়ে দিতে গিয়ে দেখল সাবি, শুকন জায়গা বলতে বিশেষ কিছু নেই তোষকখানায়। মেয়েটিরও অনুরূপ দুরবস্থা।

অবস্থান্তরের চাপে তলিয়ে যাওয়া মায়ের বেদনাটা গুমরে উঠল সাবির মনে। অর্থসঙ্গতির অভাব না থাকলেও একি অবস্থা ছেলে মেয়েদের?

শুকন কাঁথা নেই ঘরে? রমাপতিকে জিজ্ঞাসা করল সাবি।

নিশ্চয়ই আছে। তবে খুঁজতে হবে, দয়া করে যখন এসেছ, দেখে শুনে নাও।

গতরাত্রের নাটকীয় ব্যাপারটার গ্লানি মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত থাকলেও দুস্থ সন্তান সম্বন্ধে রমাপতির অনন্যনির্ভরতার ভাবটা সাবিকে যেন হঠাৎ অধিকারের ভিত্তিভূমিতে এনে বসিয়ে দিল। এদিকে ওদিকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা খালি জুতার বাক্সর তলা থেকে খান দুই কাঁথা আবিষ্কার করল সাবি।

ছেলেমেয়ে দুটিকে ভাল করে শুইয়ে রমাপতিকে বলল সাবি, ওদের মা কবে আসবেন? রমাপতি বলল, সে এখন অনেক দেরী।

কথাটার ইঙ্গিতে যেন একটু লজ্জা পেল সাবি।

এদের দেখাশুনা করে কে?

চোখ দুটো ওপরের দিকে তুলে বিশ্ববিধানের অদৃশ্য ভাগ্য নিয়ন্তাকেই হয়ত দেখিয়ে দিল রমাপতি। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে আবার বলতে লাগল: তিনি এখানে থাকতেও দেখাশুনা বিশেষ করতে পারতেন না ওদের। বিশু হবার পর থেকেই শরীরটা ভেঙে ছিল। কিছু মায়ের যত্ন পেয়েছিল বিশু। তারপর থেকে সব নেচে-কুঁদেই মানুষ হচ্ছে। আমি ডাক্তার, তবু আমার এই বিড়ম্বনা! তাই ভাবছি, এবার যদি ভালয় ভালয় প্রসব হন, পাঁচ বছর তাঁকে তফাতে রাখব।

কিন্তু একটা কথা আছে ডাক্তারবাবু ......।

না, না, আর কোন কিছু নেই সাবিত্রী। এ ভার তোমাকে নিতেই হবে। আমি না পারছি ওদের দেখতে; না পারছি তাঁকে দেখতে। সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলের নাম ধরে ডাকল রমাপতি, বিশু, এদিকে এস ত।

সাবির প্রথম দেখা ছেলেটি ঘরে এল। এইবার ছেলেটিকে ভাল করে দেখল সাবি। ফর্সা চেহারা, কিন্তু ময়লা জামা আর ইজেরের মলিনতা কাটিয়ে রংটা যেন ফুটতে পারছে না।

রমাপতি বলল: বিশু, ইনি হচ্ছেন তোমার মাসিমা। সাবিকে চিনত না বিশু, তাই বাপের কথায় সে একভাবে সাবির মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বাপকে জিজ্ঞাসা করল, কোন মাসিমা বাবা?

ছেলেকে বুঝিয়ে দিল রমাপতি, তোমার মামার বাড়ীর কেউ নন, ইনি তোমার এইখানকার মাসিমা। এতটুকু ছেলের মাথায়

...খানি মারপ্যাঁচ ঠিক ঢুকল না। তবে সাবির ফর্সা রং আর বড় বড় চোখ দুটো দেখে তাকে বাপ মায়ের সমশ্রেণীভুক্ত বলেই মনে হল।

মায়ের যত্নের সঙ্গে মায়ের কাছে কিছু শিক্ষাও পেয়েছিল বিশু। ...ই খপ্ করে সাবির একটা পায়ে হাত দিয়েই কপালে ছোঁয়াল।

ওকি করলে বাবা, ছিঃ ছিঃ। বিশুর উদ্দেশ্যে দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল সাবি। রমাপতি হো হো করে হেসে উঠল। মা চলে গিয়ে বড় মুষ্ড়ে পড়েছে ছেলেটা। ভাল করে খায় না, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।

ধ্যেৎ। কাঁদব কেন? অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল বিশু, কিন্তু চোখ দুটো জলে ছাপিয়ে উঠল।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদাভেদ ভুলে বিশুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল সাবি। রমাপতি বলল, আমি সম্বন্ধটা পাতিয়ে দিলাম, কিন্তু আপনার লোক ঠিক চিনে নিয়েছে বিশু। এখন যা ভাল বোঝ কর। জিনিসপত্তর সবই ঘরে আছে। আমি চললাম। বিশুকে বুকে করে বসে রইল সাবি। হাঁ, না কিছুই বলতে পারল না। সম্পূর্ণ অজানা অথচ দুর্লঙ্ঘ্য শৃঙ্খলে যেন তার হাতপা কে জোর করে বেঁধে ফেলছে।

জামা কাপড় বদলে বাইরে চলে গেল রমাপতি। বেলা বারটা নাগাদ ফিরে এসে দেখল ছোট ছেলেটিকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে সাবি। রান্নাঘরের দোর খোলাই ছিল। নজর পড়তেই দেখল সমস্ত সরঞ্জাম গোছান রয়েছে, শুধু রান্নাটা বাকী। শোবার ঘরে ঢুকে দেখল অগোছাল গৃহস্থালি এতটা পরিপাটিভাবে গুছিয়ে তুলতে কম পরিশ্রম করতে হয় নি সাবিকে।

এসব কি তুমি একলাই করলে ? রমাপতি সাবিকে জিজ্ঞাসা করল। সাবি কোন উত্তর দিল না।

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসা করল ঃ ভাবি আসে নি ?

সাবি বলল, এসেছিল, চলে গেছে। ভাবি অর্থে কৌতুকপুর বাজারের বিগতযৌবনা এক বারবনিতা। বর্ত্তমানে এখানে ওখানে দাসীবৃত্তি করেই পেট চালায়। জামাকাপড় বদলে বসবার উদ্যোগ করতেই রমাপতিকে বলল সাবি, বেলা অনেক হল। তাড়াতাড়ি রান্নাটা চাপিয়ে দিন।

রমাপতি হাসল। আমার হাতে তুমি খেতে পারবে ত ? প্রশ্নটা ঠিক বুঝল না সাবি। রমাপতি বলল, কত রোগ বীজাণু ঘাটি আমি ! এইমাত্র আমার হাতের ওপর একটা রুগী মারা গেল। নিউমোনিয়া কেস্। ফুসফুসের দুদিকেই ধরেছিল। অনেক চেষ্টা করলাম। বাঁচল না।

সাবির সমস্ত গাটা ঘিন ঘিন করে উঠল। তবুও বলল, তা হলে চ্যান করে নিন। আর দেরী করবেন না। ছেলেমেয়ে দুটো খিদেয় নেতিয়ে পড়েছে।

স্নান সেরে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বসল রমাপতি। কাঠের উনুন জ্বেলে নিয়ে রান্না চাপাল। সাবি কিন্তু একবারও রান্না-ঘরের দিকে এল না। শেষ পর্য্যন্ত রমাপতি তাকে ডাকল।

দোরের বাইরে থেকে উত্তর দিল সাবি, আমারে ডাকছেন ?

হাঁ। তুমি কি ঘরের চৌকাঠ ডিঙুবে না সাবিত্রী ?

স্পষ্ট করে না বলে, ঘুরিয়ে জবাবটা দিল সাবি, রান্নার জন্যে একজন নোক রাখুন ডাক্তারবাবু। রোজ রোজ হাত পুড়িয়ে রান্না করা পুরুষ মানষের কাজ নয়।

মুখখানা গম্ভীর করে বলল রমাপতি, রাঁধবার লোক যোগাড় করা বড় শক্ত। কিন্তু কুটনো, বাটনা সবই যখন করে রাখতে পেরেছ, দুটো সেদ্ধ চাপিয়ে দিলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ?

কুটনো বাটনা ত আমি করিনি ডাক্তারবাবু।

তবে কে ? ভাবি ? তা হলে ত আরও ভাল। বলে মুখ টিপে একটু হাসল রমাপতি।

সাবি বলল, রোজ করে, আজও করেছে।

করবে বৈ কি ! তার ত আর তোমার মত ভয় নেই।

কোন কিছু না বলে পায়ে পায়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো সাবি।

চলে যেয়োনা সাবিত্রী। একটা কথা আছে শুনে যাও।

সাবি সরে এসে বলল, কি কথা ?

ভারী মজার কথা, কিন্তু ঘরে না এলে বলব না।

সরাসরি রমাপতির বাড়ী এসে ওঠায় ভয়ের বাষ্প ঘুলিয়ে বেড়াচ্ছিল সাবির মধ্যে। রমাপতির মজার কথার ইঙ্গিতটা তার মনটাকে একটা ধাক্কা দিল। বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘরের ভেতর চলে এল সে।

রমাপতি বলতে লাগল, একজন লোক রাগের মাথায় একটা গরু মেরে ফেলেছিল। গোহত্যা ! কিছুদিন পরে তার শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। কিছু খেতে পারে না। পেটের মধ্যে মাঝে মাঝে গরুর মতন কি একটা ডাকে। অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখাল, কিছুই হয় না। শেষকালে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। কথা শুনে লোকটা হেসেই খুন। বললে, তুমি একটা গরু মেরেছ কিনা, তাই ডাকছে। আমার মতন দশ বিশটা মার, দেখবে আর ডাকবে না। পালে মিশে গিয়ে খাসা জাবর কাটবে। তাই ভাবছি ভাবি

আমাকে বেঁধে খাওয়ায়, আর তুমি রান্নাঘরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছ। রমাপতির উপমাটা শুনে সাবির ঠোঁটে একটু চাপা হাসি খেলে গেল। তারপর বলল, তার পাপ পুণ্যের ভয় নেই, তাই সে পারে। সবাই ত আর ভাবি নয়।

রমাপতি বলল, তা হতে পারে। কিন্তু ভাবি এখন কোন পাপ কাজ করে না। দিনের মধ্যে বাষট্টিবার গঙ্গায় ডুব দেয়, আর অতিথ, পতিত যাকে পায় সেবা করে। ঘেয়ো কুকুর, ঠাঙ্গ ভাঙ্গা বেড়াল কত যে পোষে তা বলা যায় না। আসলে পাপ পুণ্য দুটোই যে ফাঁকা জিনিস, প্রাণভরে পাপ না করলে সেটা বোঝা যায় না।

বহুদিনের সংস্কার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ঝটপট করে উঠল সাবির মধ্যে। তবুও অনেক ঘা-খাওয়া বিদ্রোহী মন রমাপতির বিশ্লেষণের চোরাবালির মধ্যেই যেন আশ্রয় খুঁজে বেড়াত লাগল।

তা হলে কি পাপ পুণ্যি কিছু নেই?

আছে বৈ কি সাবিত্রী। নেই, এ কথা ত আমি বলিনি। তবে আমরা যেটাকে পাপ পুণ্য বলে ঠিক করে বসে আছি, সেইটের কথাই বলছি। পুকুরের জল ঠাণ্ডা কি গরম যতক্ষণ পুকুরে না নাবছ, কি করে বুঝবে বল দিকি?

রমাপতি বুঝল সাবি কথাটা ঠিক ধরতে পারছে না।

বুঝতে পারলে না? শোন। পরের মুখে মিথ্যা রটনা শুনে বা নিজের চোখে ভুল দেখে তোমাকে যে একঘরে করল পঞ্চু, এতে নিশ্চয়ই মনে করেছে সে একটা মস্ত পুণ্যির কাজ করল। অথচ সে যদি নিজের মনের কথা শুনত, তাহলে তোমাকে বিয়ে না করে পারত না। লোকে বলত, পঞ্চা মহাপাপ করেছে, কিন্তু আসলে পুণ্য হত তাতেই।

পঞ্চুর নামটা শুনেই সাবির মুখখানা সাদা হয়ে উঠল। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, ও কি কথা ডাক্তারবাবু? তার বউ রয়েছে···।

বউ তার এমনিই থাকবে না সাবিত্রী, তোমাকে বিয়ে করলেও থাকত না।

সাবি ভয় পেল। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করল, বউ আবার কমনে যাবে?

দেখতে পাবে, কমনে যায়।

না, না। ঠাট্টা নয় ডাক্তারবাবু! যদি জানেন, বলুন।

শুনে তোমার লাভ?

আগে থেকে সাবধান করে দিলে হয়ত যাবে না।

ঐ জন্যেই ত বলছি, তোমাকে ছেড়ে বউ নিয়ে থাকাটা তার মহাপাপ হচ্ছে।

যান্। সব কথায় আপনার ঠাট্টা। মুখখানা লাল করে ঘর থেকে বাইরে চলে গেল সাবি।

৩

পল্লীসমাজের নিচের তলা থেকে আন্দোলনটা উঠলেও ওপরের তলায় তার আঘাতটা বেশী করে লাগল। বিশেষ করে ভূপতি মজুমদারের অলস মনের প্রতিহিংসাপর ব্যবস্থাটা সুদ সমেত ফিরিয়ে দিল সাবি। একঘরে হবার আগেই সে রমাপতির ঘরে গিয়ে উঠল।

পর পর দু'দিন ধরে ভেবে শেষ পর্য্যন্ত আগুন হয়ে উঠল ভূপতি। মুহুরী ভোলানাথ বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। পাটোয়ারী বুদ্ধির রাজা। আবেগের তাড়নায় তাকেই শেষ পর্য্যন্ত ধরে বসল ভূপতি।

চেকবই আর খাতাপত্র থেকে চোখ তুলে দড়িবাঁধা চশমাটা খুলে ফেলল ভোলানাথ।

ডাক্তার ত আমাদের সমাজের লোক নয় বাবু। বিদিশী ব্রাহ্মণ, ওরা আমাদের একঝাড়ের বাঁশ নয়। হাঁ, বলে খানিকটা গুম্ হয়ে বসে রইল ভূপতি মজুমদার।

আচ্ছা, ও বেটার ঘর জ্বালিয়ে তুলে দিলে কেমন হয়?

ভোলানাথের সাতষট্টি বছরের অভিজ্ঞতায় কেমন যেন অদ্ভুদ ঠেকল জিজ্ঞাসাটা।

অমন কাজ করবেন না বাবু। বিশখানা গাঁয়ের লোক ওর হাতধরা। ভূপতিও জানে এ কথা।

মুহুরীর ঘর থেকে উঠে গিয়ে বৈঠকখানায় চলে গেল ভূপতি। হেলা এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গিয়েই চমকে উঠে দু'হাত পিছিয়ে দাঁড়াল। মজুমদারের একপাটি চটি তার পিঠে লেগে দোরের বাইরে ছিটকে গিয়ে পড়ল।

হারামজাদা! শূয়োরের বাচ্ছা! বেরিয়ে যা এখান থেকে। এ রকম আদর আপ্যায়নে অভ্যস্ত ছিল হেলা, তাই ভয় পেয়েও ঠিক দমল না। দুহাত জোড় করে দোরের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ভূপতি আবার বলল, তুই আর আমার কাছে আসিস্ নে শালা। আজ থেকে দূর করে দিলাম তোদের।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মজুমদারের পায়ের কাছে বসে পড়ল হেলা। তারপর খপ্ করে তার দুটো পা জড়িয়ে ধরে বলল, নাথিই মারুন আর জুতোই মারুন হুজুর, হেলা ও ছিচরণ ছাড়ছে না।

ওঃ, উনি আমার ছিচরণ ধরে পড়ে থাকলেই আমি একেবারে সগ্‌গে গেলাম আর কি! আমার যেমন হয়েছে যত সব ছাগল

দিয়ে যব মাড়ান! চতুর হেলার বুঝতে বাকী রইল না, ভূপতির ব্যথা কোনখানে। তাই সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্খালনের কোন চেষ্টা করল না। অধিকন্তু মজুমদারের প্রথম সম্ভাষণজনিত স্থানভ্রষ্ট একপাটি চটি কুড়িয়ে এনে যথাস্থানে রেখে দিল।

ভূপতি মজুদারের গোঁফের ফাঁকে একটু ক্ষীণ হাসি খেলে গেল। পঞ্চা হারামজাদাকে ডেকে নিয়ে আয়। আমার টাকা চাই। তোদের স্কুলের ভোঁদড়দের পেট ভরান চলবে না আমার টাকায়।

সে কথা তুশোবার। আমি তেখুনি মানা করেলাম বাবু, ট্যাকাটা দেবেন না। ফরাসের ওপর সজোরে একটু ঘুষি মেরে বলল মজুমদার: হাত পেতে নিলি ত রে শালা। ওসব ন্যাকামো চলবে না, বলে দিচ্ছি। সে না দেয়, তোর ঘাড় থেকে আদায় করব।

সামান্য একটু হাসির ভান করে, হাত কচলাতে কচলাতে হেলা বলল, পঞ্চারে ডাকতে বলেছেন, যাব না কি বাবু?

যাবি না কি, এখানে বসে মন্তর ঝাড়বি, আর সে চলে আসবে! বেটা কুড়ের বাদ্‌শা। বসে বসে গল্প মারবেন আর ন্যাজ নাড়বেন। হুকুম করলে, একবার কেন, দশবার যাব। বলে হেলা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হল? সঙএর মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

আজ্ঞে এত তাড়াতাড়ি ট্যাকাটা চাইলে সব মাটি হয়ে যাবে বাবু! অনেক কাণ্ড করে বলে টোপ গিলিইছি।

সে ত তুই সাবিকেও গিলিইছিলি! মাছ উঠল ত ও বেটা রমাপতির বঁড়শিতে।

ঠিক জায়গাতেই উঠেছে বাবু। ওঠানে ওঠবে নাত কি আপনাদের মত নোকের ঘরে ওঠবে, ঐ সাতহাতফেরা জিনিস?

যাক্। আর বেশী বাহাতুরী করতে হবে না। যা বলি, কর। পঞ্চাকে ডাক। যাবার সময় মোড়ল পাড়া দিয়ে ঘুরে অভয় মোড়লকে একটা খবর দিয়ে যা। বলবি, আমি ডেকেছি, বুঝলি ?

সম্মতি জানিয়ে চলে গেল হেলা।

মজুমদারের আহুত সভাটা সকালে না জমে, জমল সন্ধ্যার পর। বৈঠকখানায় চৌকি সরিয়ে ফেলে আগাগোড়া মেঝে জুড়ে সতরঞ্চি পাতা। মাঝখানে স্বতন্ত্র একখানা চেয়ারে ভূপতি মজুমদারের বসবার ব্যবস্থা। বাজারের নামকরা দোকানদার জনকতক, পাড়ার মাতব্বর তিনকড়ি বাগ, তুলেপাড়ার প্রতিনিধি এশো, অধমর্ণ পঞ্চু, পার্শ্বচর হেলা, সবাই এসেছে, বাকী কেবল অভয় মোড়ল। পিছনের দিকের দোর খুলে ভূপতি মজুমদার ঘরে এসে উপস্থিত সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল। একে একে দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নীচু করে প্রণাম জানাল সবাই। সকলকে বসতে বলে ঘড়ি দেখল ভূপতি।

মোড়লের পো এখনও আসে নি ? জিজ্ঞাসা করল ভূপতি। কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল তিনকড়ি বাগ, তার এখন পায়া ভারী। একশ বিঘের ধান তুলেছে ঘরে।

পাশ থেকে টিপ্পনী কাটল বিষ্টু ঘোষ, আপনারই বা কম কি ?

গলা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জড়ান গলাবন্ধটা একটু আলগা কঁরে নিয়ে বলল তিনকড়ি বাগ, তুমি ত বলবাই ওকথা। আমরা ত চষে খুঁড়েই মরি। মাল ত গোকুলে বাড়ে তোমার আড়তে। দোকানদারী আলোচনাটা থামিয়ে দিল মজুমদার এক

কথায়। তোমরা কেউ কম নও হে। সেইজন্যেই ত তোমাদের ডেকেছি। বেম্মা, বিষ্টু দুজনেই এসেছেন, বাকী আছেন মহেশ্বর। ছোট একটা হাসির রোল উঠল ঘরে।

এই যে, বলতে বলতেই হাজির। অনেকদিন বাঁচবে তুমি মোড়ল। ফিতে বাঁধা জুতোজোড়াটা একহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে অন্য হাতে সরু একগাছা বাঁশের ছড়ি, আজানুলম্বিত পুরান গরমের কোট গায়ে অভয় মোড়ল দোর ঠেলে ঘরে ঢুকল ও জুতো-জোড়া নামিয়ে রেখে ছড়িশুদ্ধ হাতদুখানা জোড় করে প্রণাম করল মজুমদারকে। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলল, কতক্ষণ গো তোমরা ? এই খানিকক্ষণ। বিষ্টু ঘোষ বলল।

হেলা ! তামাক খাওয়া সবাইকে। হেলাকে হুকুম করে অভয় মোড়লকে জিজ্ঞাসা করল ভূপতি মজুমদার, এত দেরী কেন গো ? বড্ড কাজ পড়েছে ? মাথা চুলকে বোধহয় শুদ্ধ ভাষা খুঁজতে লাগল অভয় মোড়ল। তারপর টেনে টেনে জবাব দিল, কাজত সকলেরই আছে। ঝাড়াই, মাড়াইয়ের সময় এখন। তবে কিনা, আমার কথা যদি ধরেন, ও বেগারটালা কাজ আমার 'লেচার' নয়। সুচারুরূপে কাজ সেরে তবে আমার ছুটি।

বিষ্টু আরও জনকতক গা টেপাটিপি করল, কিন্তু কোন কথা বলল না। তা ত বটেই। তুমি হচ্ছ পাকালোক। ভূপতি মজুমদার বলল।

আজ্ঞে তা আপনার বাপমায়ের আশীব্বাদে ওটুকু 'অনর' আমি এস্তোনাগাদ পেয়ে আসছি। কি নিজের, কি পরের, কাজের ফাঁক আমার কেউ কোনদিন ধরতে পারে নি। কি বলগো তিন কড়ি দা ?

দুশো বার। তিনকড়ি বাগ সংক্ষেপে জোরাল সমর্থন জানাল।

ভূপতি মজুমদার বলল, হাতের কাজ মিটিয়ে এসেছ ত। এবার ঠাণ্ডা মাথায় আমার গোটাকতক কথা তোমাদের শুনতে হবে। সেই জন্যেই ডাকা।

আজ্ঞে যথেষ্ট, যথেষ্ট। আপনি বিগিনিং করুন বাবু।

জোর করে হাসি চেপে বলতে লাগল ভূপতি মজুমদার। কথাটা তোমরা সবাই জান। তবুও আমাকে বলতে হচ্ছে, এই হল দুঃখ্যু ; গাঁ আমারও যেমন, তোমাদেরও তেমনি।

এত হক্ কথা অভয়মোড়ল একেবারে গলে গেল।

তা হলে বলতে হবে, তোমাদের কিছুই গায় লাগে না। ঘরের কেলেঙ্কারী যাদের ও-বেটাদের কথা ছেড়েই দিলাম, বেটাদের গণ্ডারের চামড়া গায়ে। বলেই পঞ্চুর মুখের দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে দেখল মজুমদার।

তখনও কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে বোঝেনি সবাই।

মজুমদারের সুর চড়ল, মেজাজও চড়ল।

ওদের দিয়ে শাসন হবে না। কিন্তু ভদ্র পাড়ায় ত বাস করে, সে দিক দিয়ে ত ওদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

অভয় মোড়ল জ্ঞান-ভাণ্ডারের ডালা উপুড় করে শুদ্ধ ভাষা খুঁজতে লাগল, কিন্তু নাতিদীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার মর্ম্মার্থটা ধরে ফেলল বিষ্টু ঘোষ। একটু হেসে বলল, বাবু কি সাবি আর ডাক্তারবাবুর কথা বলছেন ?

ও হো। তাই বলুন। আমরা ত বুঝতেই পারিনি! হাঁ, হাঁ, শুনছিলাম বটে, সাবি না কি এখন ডাক্তারবাবুকে রেঁধে খাওয়াচ্ছে। বলতে বলতে গলা থেকে মাফ্‌লারটা খুলে ফেলল তিনকড়ি বাগ।

খাওয়ায়নি এখনও, তবে খাওয়াবে। পাঁচকড়ি মন্তব্য করল।

দু কানে হাত চাপা দিয়ে বলল মজুমদারঃ থাক, থাক, ও সব কথা কানে শুনলেও কি রকম হয়। অবাক হচ্ছি, তোমরা সব জেনে-শুনেও ন্যাকা সাজছ। তিনকড়ি বাগ বলল, ও সব ত আপনাদের ব্রাহ্মণদের কাণ্ড, আমরা ওর আর কি করব বলুন?

ব্রাহ্মণরা গাঁয়ে থাকলে কি আর তোমাদের ডাকতাম। সবাইত বিদেশে। যারা আছে, তাদের থাকা নাথাকা সমান। ব্রাহ্মণদের জায়গায় এখন উঠছ তোমরা, তোমাদেরই সব দেখা উচিত।

এতক্ষণে অভয়মোড়ল বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে একটু সহজ হল।

রাতদিন কাজ নিয়ে থাকি, নিশ্বেস ফেলিবার টাইম পাইনে, কি করে জানব বলুন বাবু, সাবি ডাক্তারকে ভাত রেঁধে খাওয়াচ্ছে। কেন, ডাক্তারের ওয়াইফ্ কোথায় গেল?

হেলা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, আর পারল না।

তুমি কিছুই খবর রাখ না মোড়লের পো। সাবিরে ঘরে এনে থুয়েছে ডাক্তারবাবু। বউ বাপের বাড়ী, বেয়ারামে ভোগছে.........।

কথাটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যেতেই হেলাকে ধমক দিল মজুমদার, তুই থাম হারামজাদা। ঘরের কেলেঙ্কারী নিয়ে রসান চড়াতে লজ্জাও করে না!

সাবিকে উদ্দেশ্য করে তুলেদের ওপর বার বার আঘাত করায় ধৈর্য্য হারিয়ে গেল পঞ্চুর। পঞ্চু বলল, আমিও এই গাঁয়ে মানুষ। তুলে জাত, জন্তু জানোয়ারের মতন একপাশে থাকি। কিন্তু ভাল জাত, বামুন কায়েতের অনেকের লাড়ির খবরওত আমার জানা আছে। তাতে কোন দোষ হয় না! আজ সাবিরে নিয়ে এত কথা উঠছে কেন বলতে পারেন?

ভূপতি মজুমদারের ফর্সা মুখখানা বন্ধুবাৎসল্যের মুখোস ফেলে দিয়ে ধারাল ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল। উঠছে কেন জানিস নে? তাকে শাসন করবি বলে অনেকগুনো টাকা ভোগা দিয়ে নিয়ে গেলি কি না, তাই উঠছে! আগে থাকতে মাথা নাড়িস্ নে পঞ্চা! সবটা ছ্যাখ, শোন, তারপর কথা বলিস্। খানিকক্ষণ চুপকরে থেকে কি ভাবল মজুমদার। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলতে লাগল ঃ এইবার আসল কথাবলি শোন। সাবি চুলোয় যাক। কিন্তু রমাপতির কথাটা তোমরা মোটেই ধরছ না। বলে ডাক্তার আর পুরুত লোকের অন্দর মহলের খদ্দের। তাদের এই রকম স্বভাব হলে চলে? একটু আগে তিনকড়ি বলল, এটা বামুনের ব্যাপার। ভালকথা কিন্তু কাল যদি তিনকড়ির ছেলের বৌয়ের হাত ধরে রমাপতি, তখন কি বামুনের জাত যাবে?

অভয় মোড়ল ছাড়া প্রায় সকলেই সায় দিল, এমন কি তিনকড়ি বাগ পর্য্যন্ত মাথা চুলকাতে লাগল।

বিষ্টু ঘোষ বলল, আজ পেরায় দশ বছরের ওপর এয়েছে, এ্যাদ্দিন ত কিছু করে নি.........।

জোর করে হেসে উঠে বলল ভূপতি, আমার এই কুকুরটা বরাবর ভালই আছে, কিন্তু কাল যদি ক্ষেপে গিয়ে কামড়ায় তাহলেও কি তাকে ভাল বলতে হবে?

পাকা ব্যবসাদার বলে খ্যাতি ছিল বিষ্টুর। ভূপতির খোঁচাটা তার মর্য্যাদায় একটু বিঁধল। বিষ্টু বলল, সে কথা ত আমি বলিনি বাবু, বলছি এখন থেকে সকলকেই সাবধান হতে হবে।

ইয়া! সোফার হাতলে একটা চাপড় মেরে সোজা হয়ে বসল ভূপতি। এইজন্যেই তোমাদের ডেকেছি। তোমরা হচ্ছ মাতব্বর,

বিশখানা গাঁয়ের লোক তোমাদের কথায় ওঠে বসে। ব্যাপারটা একবার বোঝ, বউটাকে শেষ করে এনেছে। কাল সাবিকেও ছিবড়ে করে ফেলে আবার একটা এনে জোটাবে। এর ওপর তোমরা যদি আস্কারা দাও, মশাই মশাই করে বাড়ী ডেকে নিয়ে যাও, দিন কতক পরে নেড়ানেড়ীর কেত্তন যদি না জোড়ে, আমার নাম তোমরা বদলে রেখ।

তিনকড়ি বাগ পোড়খাওয়া লোক, ভালমন্দ অনেক কিছু দেখেছে। মজুমদারের বর্ণনাভঙ্গিতে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ঘুলিয়ে একাকার হয়ে গেল। গলাটা পরিষ্কার করে সে বলল, বাবু যথাথ্য কথাই বলেছেন। কথায় বলে, যারে বলল ছি, তার রইল কি? আমি ত আর ওরে ঘরের চৌকাঠ ডিঙুতে দিচ্ছি নে।

ডান হাতের কব্জীটা প্যাঁচ কষার ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে বলল মজুমদার আরও একটু টাইট করতে হবে। জানাশুনো খাতক-টাতক যার যত আছে, সক্কলকে জানিয়ে দাও। বুঝলে? রাজু লোকটা দিশী লোক, চিকিৎসাও জানে, শুধু ওষুধ নেই বলে কিছু করতে পারে না। কিছু টাকার ওষুধ ওকে আমি কিনে দোব মনে করছি। তারপর অভয় মোড়লের দিকে চেয়ে বলল, কি গো মোড়ল, তুমি যে একেবারে স্পিকটি নট্! ব্যাপার কি?

এবার আর শুদ্ধ ভাষা খুঁজল না অভয় মোড়ল। নাতিদীর্ঘ ছড়িটার ওপর ডান হাতের ভর রেখে বলল, না বাবু, ওসবের মধ্যে আমি নেই। অভয় মোড়লকে সবাই চিনত, তবুও তার এতখানি ঔদ্ধত্যে সকলের মুখ শুকিয়ে উঠল।

ভূপতি রাগটা সামলে নিয়ে বলল কেন? তোমার আপত্তিটা কিসে শুনি?

কিসে আপত্তি শুনবেন ? সে যদি গাঁ থেকে চলে যায়, লোকে যাহোক ছু ফোঁটা ওষুধ পাচ্ছে, আর পাবে না।

হাতমুখ নেড়ে বলে উঠল ভূপতি, ও যখন আসেনি, লোক সব তখন মরে ভূত হয়ে ছিল !

শান্তস্বরে বলল অভয় মোড়ল, মরার কথা ত বলিনি বাবু। বলছি রোগে চিকিচ্ছের কথা। ছেলেবেলায় দেখেছি, নিমোনিয়ারের রুগীকে ভূতের রোজা ঝাড়াচ্ছে। তখনও ত লোক সব মরে যায় নি ?

এইবার ভূপতির হয়ে তর্কটা তুলল তিনকড়ি বাগ। কি যে বল তুমি মোড়লের পো, ওষুধ খাওয়াটা আগে না লোকের মান-এজ্জৎ আগে ?

কি করে বলব তিনকড়ি দা, কোন্‌টা আগে ? সেবার যখন ন্যাবা আর জ্বরে ভুগে ভুগে হলুদের গাঁট হয়ে গিছলে, জলটুকু খেলেও বমি করে ফেলতে, মনে করে দেখ দিকি তখন কোন্‌টা আগে ছিল ? তখনও ত রাজু ডাক্তার ছিল, আর ন্যাবার মালাও ছিল, তবে ঐ রমাপতি ডাক্তারের কাছে গিছলে কেন ?

অভয় মোড়লের সকলকে উঁচিয়ে কথা বলায়, তিনকড়ি বাগ ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠল। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়ে নতুন ঠাণ্ডা-লাগা কাসিটা অত্যন্ত বেড়ে গেল।

ভূপতিও ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছুলেও, রাগারাগি করে করতলগত জনমতটাকে অঙ্কুরে নষ্ট করতে চাইলনা। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলল ঃ ধরলাম, সে মস্ত বড় ডাক্তার, একেবারে বিলেত ফেরৎ। কিন্তু কথাটা হচ্ছে তার স্বভাব নিয়ে, ডাক্তারী নিয়ে নয়। অভয়মোড়ল অবিচলিত-ভাবে

বলল, স্বভাব পুরুষ মানুষের ওরকম একটু-আধটু খারাপ থাকে। তার জন্যে যে তার অন্ন মারতে হবে, তার কোন মানে নেই।

আজ সাবি দুলেনীকে এনেছে বলে মানে নেই, কাল যখন শিবি মোড়লনীকে নিয়ে আসবে, তখন বোধ হয় মানে হবে! কি বল মোড়ল ?—ভূপতি বলল। শিবি অভয় মোড়লের দূরসম্পর্কের বিধবা ভগ্নী।

অভয় মোড়লের মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে কাল হয়ে উঠল, কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, মোড়লদের মেয়ের ভাবনা মোড়লরাই ভাববে, তার জন্যে পাঁচজনার দোরে দরবার করবে না। বলেই বিনা সম্ভাষণে জুতোজোড়াটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভয় মোড়ল। অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলতে পারল না। দু একজন একটু আধটু টিপ্পনী কাটল, কিন্তু ভূপতি আর সোজাসুজি কারুর মুখের দিকে চাইতে পারল না।

হেলার একটা চোখ সব সময়ই ভূপতি মজুমদারের ওপর থাকত, অতএব প্রভুর বিমনা ভাবটা সহজ করতে তাকে দু এক কথা বলতেই হয়। হেলা বলল, মোড়লের সব তাতেই গাজোয়ারি আছে। দশজনা যা বলবে, তার উল্‌ডোডা ওনার বলা চাই।

এতক্ষণে যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠল পঞ্চু।

উলটো নয় হেলাদা, মোড়ল ঠিক কথাই বলেছে।

ঠিক কথা ? ভূপতির চোখ দুটোয় শাসনের ভঙ্গি ফুটে উঠল।

ঠিক কথা বইকি বাবু ? সামান্য একটা তাল পাতার সেপাই ডাক্তারকে জব্দ করবার জন্য আমরা বিশজনা মিলে জল ঘোলা করছি। ওটাকে পাঁজাকোলা করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে কি হয় ? না হয়, দু বছর ম্যাদ খাটব, আর ত কিছু নয়!

ভূপতি মজুমদার উঠে এসে পঞ্চুর সামনে দাঁড়াল, তারপর বলল, সাবাস্ ভাই, এই-ই ত। ওরে আমি বেঁচে থাকতে তোকে যে জেল খাটাবে, সে বেটা এখনও মায়ের পেটে। তবে একটু বুঝে সুঝে, যখন বলব, তখন। আগে ওদের দৌড়টা একবার দেখ্ না। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলল, খুন খারাপির দরকার হবে না। একটু আধটু ধোলাই দিলেই চলবে। তবে তোমাদের সব্বাইকে বলছি, এসব কথার যেন একটাও তার কানে না যায়।

একবাক্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে একে একে সব সরে পড়ল।

৪

পঞ্চুর সংসারের চাকা অচল হয়ে এল। একদিন কাজ করে ত তিন দিন বেকার। সর্দ্দার ঘরামি রাগ করে, শাসনও করে। পঞ্চুও রাগ করে, মিষ্টি কথায় ভোলাতে পারে না সর্দ্দারকে। শেষ পর্য্যন্ত একদল ছেড়ে আর এক দলে গিয়ে জোটে। উপার্জ্জনের স্বল্পতায় খোরাকে টান ধরে, সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে খাবারের পর্ব্ব। সকালের পান্ত ভাত বন্ধ হয়ে যায়।

শীতের সকালে দেরী করে সূর্য্য ওঠে। তুলেপাড়ার জনমজুরের দল রোদে পিঠ তাতিয়ে পাকাঠির আগুনে তামাক টেনে দলবেঁধে কাজে বেরিয়ে পড়ে। পঞ্চুর বউ ঘুম চোখে বিছানা থেকে উঠে চালের কলসিটায় নাড়া দেয়। তারপর স্বামীর গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকে, এখনো ঘুমুচ্ছ? কাজে যাবা না? গায়ের কাঁথাখানা মাথা পর্য্যন্ত টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শোয় পঞ্চু। ঘুম চোখেই বলে, কেন জ্বালাস্ বল্ ত? রাতেও ঘুমুতে দিবি নে?

কত রাত আছে দেখবা ? ধড়াস্ করে পূবের জানালাটা খুলে দেয় বৌ। আগাছার আবরণ ভেদ করে খানিকটা রোদ এসে পড়ে ঘরে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে পঞ্চু। যাঃ, বেলা হয়ে গিয়েছে !

বাইরে এসে চোখে জল দেয়, তারপর তামাক সেজে নিয়ে বাড়ীর বাইরে রাস্তার ধারে এসে বসে। দক্ষিণ থেকে উত্তর, একপ্রান্তে দুর্গাপুরের বনঝোপে ঢাকা সাবির ঘরখানা, অন্যপ্রান্তে রমাপতির পাকাবাড়ী। রাস্তার এই দুই প্রান্তসীমার মধ্যে মনটা তার আনা-গোনা করে। তামাক পুড়ে যায়। কলকের গায় থেলো হুঁকোটা ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখে। শীতের ফসল তখনও ঘরে ওঠে নি সব। উত্তরের মাঠ থেকে ধানের গাড়ী যায় রাস্তা দিয়ে। বোঝাই গাড়ির চাকা থেকে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত ধুলো উড়ে এসে পঞ্চুর গা মাথা ভরিয়ে দেয়।

সেদিন দুপুর বেলা বাড়ী এসে দেখল পঞ্চু, রান্নাঘরে আঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বউ। বউকে ডাকল পঞ্চু, রান্না করলি নে ?

রান্না করব কি, কি আছে ঘরে ? উঠে বসে মাথার চুলগুনো জড়িয়ে নিল বউ, তারপর পঞ্চুর অপরূপ চেহারার দিকে চেয়ে বলল, ইকি ? ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে এলে নাকি ? গামছাখানা দিয়ে গায়ের মাথার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল পঞ্চু, কিছু নেই ত এতক্ষণ নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলি ? এখন এই তিনপর বেলায় চাল আনব, তবে পিণ্ডী চাপবে ! পঞ্চুর গলার স্বরটা উত্তরোত্তর চড়তে লাগল। পঞ্চুর বউ বলল, চট্ করে চ্যান করে এস, কালকের ভিজে ভাত আছে, দিচ্ছি।

যা আছে দে। খিদেয় আর দ্যাঁড়াতে পাচ্ছি নে। পাথরের থালায় ভাত বেড়ে দিয়ে পঞ্চুর সামনে বসল বউ।

একটা কথা বলব, রাগ করবা না বল? খেতে খেতে বউয়ের মুখের দিকে চাইল পঞ্চু। বউ বলল, বামুনবাড়ীর কাজটা নোব? মা মরে যাবার পর ওরা এখনও নোক পায় নি। কাল বলতে এয়েল বামুনগিন্নী।

তা নিবি বৈ কি! সবাই মিলে আমার মুখটা পোড়া। সবাই কথাটার স্পষ্ট অর্থটা আর বুঝতে বাকী রইল না পঞ্চুর বউয়ের। সারাদিনের অনাহারের ওপর অপমানের তীব্র জ্বালা এসে মিশল। বউ বলল, কেন আমায় বিশ্বেস হয় না? মনে ভাব, সম্মাই তোমার সাবি।

হাঁ, হাঁ, তাই ভাবি। তোরা সব সমান।

আচ্ছা, তাই নাহয় ভাব। ভাত ফেলে ওঠ না, তোমার পায়ে পড়ছি।

কোনরকমে খাওয়া শেষ করে রান্নাঘর থেকে চলে গেল পঞ্চু।

শূন্য ভাতের হাঁড়ি আর নিঃশেষিত-আয়ু পাথরখানার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল পঞ্চুর বউ। বড় ঘরের দিকে অনর্গল হুঁকোয় তামাক টানার শব্দ শুনতে লাগল। তারপরে খাবার জায়গাটা পরিষ্কার না করেই তার পাশে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। শীতের দুপুর, উঠানে রোদ ফেটে পড়ছে। বন্ধ চালা ঘরের ভিজে মাটি ফুঁড়ে শীত যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। এতক্ষণ বোধ হয় বড় ঘরে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে পঞ্চু। চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারল না পঞ্চুর বউ। ঘরে ভাত নেই, তবুও কি পঞ্চু একবার জিজ্ঞাসা করতে পারত না সে খেয়েছে কিনা? ঘরে আর কিছু খাবার আছে কি না? আজ যদি শাশুড়ী বেঁচে থাকত, তারা কখনই এরকম নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারত না। অথচ তারা

মারা যাবার পর সে কতদিন ভেবেছিল, এইবার সে ষোলআনা করে পাবে স্বামীকে। একলা ঘরের গিন্নী হয়ে মনের মতন করে গড়ে নেবে তার সংসার। আজ তার মনে হল শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গেই তার সংসার, তার আশা ভরসা সব শেষ হয়ে গেছে। কতক্ষণ যে সে কেঁদেছে ঠিক ছিল না, হেলার বউয়ের ডাকে তার চমক ভাঙ্গল।

ঘরে ঢুকেই গালে হাত দিয়ে ধনুকের মত বেঁকে দাঁড়িয়ে বলল হেলার বউ, পোড়া কপাল! হাঁড়ি কুকুরে মেরে গ্যাল না কি লো? একেবারে চাটপুট। পিম্‌ড়ে কেঁদে যায়।

পঞ্চুর বউ উঠে বসল। কিন্তু দুর্গতির চিহ্ন লুকাতে পারল না। চোখদুটো লাল, আঁচলের খানিকটা চোখের জলে ভিজে।

কি হয়েছে রে? চোখদুটো একেবারে করমচা।

না, মনডা জুতা নেই দিদি। কোন রকমে সামলাবার চেষ্টা করল পঞ্চুর বউ। চক্ষের নিমেষে অন্তরঙ্গতায় নিবিড় হয়ে উঠল হেলার বউ।

বড় বুনের কাছে লুকুস্ নে বউ। কি হয়েছে খুলে বল। মুখ শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গ্যাছে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না! তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বুঝিছি। দ্যাড়া ভাই। ঝক্ করে এ্যালাম বলে। হেলার বউ চলে গেল।

পঞ্চুর বউ উঠে বাইরে এল। কলসী থেকে জল গড়িয়ে ভাল করে চোখমুখ ধুয়ে ফেলল। ঠাণ্ডা জলের গুণেই হয়ত অনেকটা পরিষ্কার হল মাথাটা। নিশ্চয় তার জন্য ভাত আনতে গেছে হেলার বউ। কিন্তু কেন সে পরের ভাত খাবে? যোয়ান মদ্দ স্বামী থাকতে কেন সে কুকুরের মত পরের দয়ায় বেঁচে থাকবে? না

এখুনি সে পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করবে সে তাকে খেতে পরতে দেবে কি না? নেতিয়ে পড়া মনটাকে হাতুড়ি পিটিয়ে শক্ত করে তুলল পঞ্চুর বউ। কিন্তু বড় ঘরের দোরের সামনে আসতেই তার মনটা আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কোথায় পঞ্চু? দোরে শিকল তুলে দিয়ে কখন সে বাড়ী থেকে চলে গেছে!

আঘাত করবার ইচ্ছাটা ব্যাহত হয়ে ফিরে এল। খিদেয়, অভিমানে টগবগ করে উঠল রক্ত। ঠিক সেই সময় কলাইকরা সানকিতে মানকচুপাতা চাপা দিয়ে ভাত নিয়ে বাড়ীতে ঢুকল হেলার বউ। কেন কষ্ট করে ভাত আনতে গেলে দিদি? ফিইরে নিয়ে যাও, আমি খাব না।

শুনেই একটু থমকে দাঁড়াল হেলার বউ, তারপর একগাল হেসে বলল, কার ওপর রাগ করে লো? আমার ওপর, না মিন্‌সের ওপর?

পঞ্চুর বউ বলল, হাসি নয় দিদি। আমি সত্যি কথাই বলছি। বিয়ে করা মাগকে যে জনা খাওয়াতে পারে না, তার গলায় দড়ি জোটে না? বলেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কান্নার বেগটা থামাবার চেষ্টা করল পঞ্চুর বউ। ভাতের থালাখানা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে পঞ্চুর বউয়ের হাতদুখানায় ধরল হেলার বউ। সে ঝগড়া করতে হয়, সেই জনার সঙ্গেই করিস, আমার ওপর ঝাল ঝাড়িস্ কেন? আমি য্যাখন এনেছি, তোরে খেতেই হবে।

শেষ পর্য্যন্ত ভাতকটা খেতেই হল পঞ্চুর বউকে।

উপস্থিত অন্নচিন্তাটা মিটতেই অন্নসমস্যা নিয়ে কথা পাড়ল হেলার বউ।

ছাখ্ দিকি। রাগ করে খাব না বলছিলি। এখন পেটটা

ভরল কার ? তা ঘরে য্যাখন চাল বাড়ন্ত, আমারে একটু বললেই ত পারতিস্ ? মিছিমিছি পিত্তি পড়ত না।

পঞ্চুর বউ একটু হেসে বলল, একদিন বাড়ন্ত হলে চাইতাম ; বেলান্ত হলে কি করে চাইব ?

তা সত্যি। মাগ ছেলে খাওয়ান, সে একটা মুরোদ আলাদা। একটা পেটে ভাত দিতে পারছে না, ছু পাঁচটা হলে কি করবে ?

পঞ্চুর বউ বলল, রাতদিন হয় কোনচুলোয় ঘোরছে, নয় বাড়ী এসে বসে আছে। দেখে শুনে গা জ্বলে যায় দিদি। চোখের মাথা খাক্, কাণা ঢেলা হক, আমি ভিক্ষে করে খাওয়াব। হাতপা, গতর থাকতে কেডা খাওয়াবে বল ত ?

পানদোক্তাভরা মুখখানা হাসিতে টোল খেয়ে গেল হেলার বউয়ের। তা হলে তুই রোজগার কর।

তাও ত বললাম। ইদিকে তেজ কত ? করতে দেবে না।

হেলার বউ বলল, নোকের বাড়ী বাসন মাজবি ? পোড়া কপাল ! ওতে কোনকালে তুঃখ্যু ঘোচে ? সাতপাড়ার জল তুলে বেড়াত সাবি, ছুবেলা ভাত জোটত না। এখন দেখে আসিস একবার। চোখ ঠিকরে যাবে। ফিনফিনে মোলাম কাপড়, বাস তেলের গন্ধ ভুর ভুর করছে মাথায়। তিন দিন যেতে না যেতেই ছিরি ফিরে গ্যাছে। কেডা বলবে ছুলের মেয়ে। আর তুই হাতী এমন ডোকলা, চারআনা সোনার ছুলজোড়াটা একজনা দিতে চাইছে জলের দরে, দশটা ট্যাকা দিয়ে নিতে পারলি নে !

পঞ্চুর বউয়ের মাথা থেকে সব চিন্তা সরে গেল, এমন কি অন্নচিন্তা পর্য্যন্ত। জলের দরে সোনার জিনিস, কিন্তু সে মন তার স্বামীর কোথায় ?

কথাটা ইচ্ছামত ঘোরাতে লাগল হেলার বউ। কথায় বলে জেলের পন্নে ট্যানা, নিকিরির কানে সোনা। মুখ থুবড়ে নিমুরুদে-ভাতারের ঝঁ্যাটা নাথি খেয়ে মর, আর আত্তি পুরে খাক মাখুক সাবি। সাবির সৌভাগ্যটা স্বীকার করতে সংস্কারে বাধে। কিন্তু নিজের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে তার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক অস্বীকার করাও চলে না। তাহলেও বলল, অমন সুখে কাজ নেই দিদি। পোড়ার দশা আর কি!

সঙ্গে সঙ্গে বলল হেলার বউ, তা বটে। তা হলে যার জিনিস তারে ফিইরে দেই, কি বলিস্?

আর দিনকতক থোও দিদি। এখুনি হাতছাড়া করো না।

হেলার বউ হাসল, দিনকতক পরে বড়লোক হবি, না? ওলো, সোনাদানা পরার ভাগ্যি থাকা চাই; সম্মাই পারে না। মেয়েমানুষের সুখ এইখেনে বলে নিজেরই অনন্ত পরা কাল নিটোল হাতদুখানা দেখাল হেলার বউ।

পঞ্চুর বউয়ের চোখে জল এল। বলল, তা হলে ফিইরে ছাও। বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

মরণ আর কি! কচি খুকি! কেঁদেই হাপুস্হুটি। ফিইরে দেব কেন লা? এই নে ধর। বলেই কাপড়ের আঁচল থেকে বন্ধন মুক্ত করে ঝক্‌ঝকে একজোড়া কানবালা বের করল হেলার বউ। দিনের আলোর বিচিত্ররেখা ঝিলিক দিয়ে উঠল সদ্য পালিশকরা স্বর্ণশিল্পের খাঁজে খাঁজে।

পঞ্চুর বউয়ের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেই নীলাভ হয়ে গেল; কিন্তু হাত দুখানা এগিয়ে এল অজ্ঞাতসারে। মূর্চ্ছাহত কণ্ঠে বলল, কিন্তু ট্যাকা?

থো ত। পঞ্চুঠাকুরপোকে যেন দ্যাখাস নে! কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি কি বলল হেলার বউ। পঞ্চুর বউয়ের বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল।

না দিদি। ও সব আমি পারব না। আমার বড্ড ভয় করে।

হেলার বউ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, কিসের ভয় লা? বর দেখতে পাবে? বলিস্, আমি দিইছি। আর দামটাও চেয়ে নিবি।

তা না হয় বললাম, সত্যি করে বল দিদি কেডা দিয়েছে দুল?

কেডা আবার দেবে? গাঁয়ের যে রাজা সেই দিয়েছে।

শুনে পঞ্চুর বউয়ের গলার ভেতর পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। মজুমদার বাবু? তখনও যেন স্বপ্নের অতলস্পর্শ গহ্বর থেকে হাতপা ছুঁড়ে জাগ্রত ভূমিতে ওঠবার চেষ্টা করছে পঞ্চুর বউ।

তা নয় লো, তা নয়। না ভাবছিস, তা নয়। সেদিন অতগুনো ট্যাকা দেল তোর শ্বশুর-শাউড়ীর ছেরাদ্দ করতে, তাই আমাদের মিন্‌সে বললে, ভূতভুজ্যি করতে একমুঠো ট্যাকা দিলেন, আর বউডোর কানে দুটো দুল ছেল, এশো মেরে নিল। তাই শুনে বাবুর দয়ার শরীল, তোরে এমনি পরতে দিয়েছে।

আঠারো কুড়ি বছরের স্বল্পপরিসর অভিজ্ঞতায় নিঃস্বার্থ দানের এত বড় দৃষ্টান্ত জানা ছিল না বলেই হয়ত, মনটা ঠিক নিঃসঙ্কোচ হল না পঞ্চুর বউয়ের। সে বলল, কিন্তু গাঁয়ে ত অনেক গরীব দুঃখী আছে, তাদের না দিয়ে আমারেই বা দিতে গেল কেন?

তবেই বোঝ কেন দিতে গেল। ওলো তুই বাবুর দয়াই দ্যাখছিস্, আর আমাদেব ওইতি যে কত কাঠখড় পুইড়ে আদায় করেল, সেডা ত দেখছিস্ নে?

না, তা কেন দ্যাখব না। তোমাদের দয়াতেই ত বেঁচে আছি।

৫

শেষ পর্য্যন্ত রমাপতির সংসারেই থেকে গেল সাবি। প্রথম প্রথম সমস্ত কাজ সেরে সন্ধ্যার আগেই নিজের ঘরে ফিরে আসত। কিন্তু সে ব্যবস্থা বেশীদিন টিকল না। অত্যন্ত রুগ্ন ছোট ছেলেটিকে সমস্ত রাত বিশু আর রমাপতির হেপাজতে ফেলে আসতে তার নিজের মনেই কোথায় বাধতে লাগল। তাছাড়া রমাপতি একদিন স্পষ্ট বলে গেল, রাতে সে নাহয় নিজে ডাক্তারখানায় শোবে, তবুও সাবি যেন ছেলেদের ফেলে বাড়ী না যায়। দৃঢ়তার সঙ্গে রমাপতির এ অনুরোধটাও ঠেলে ফেলল সাবি, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পেল যথেষ্ট। গ্রাম এবং সমাজের সঙ্গে যোগসূত্রটা বাঁচাতেই সে ঘরে ফিরছিল, নচেৎ এ আসা-যাওয়ার মধ্যে আনন্দ কিছুই ছিল না। রমাপতির বাড়ীর বাইরে মুক্ত বাতাস ছিল। ছিল চির-দিনের খোলা আকাশের অবাধ উদারতা। কিন্তু সে দাক্ষিণ্যে হয়ত আর কোন অধিকার ছিল না সাবির। কুৎসার বিষে তখন সব একাকার হয়ে গেছে। এমন কি দয়া পর্য্যন্ত দেখা হলেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

একদিন বড় স্যুট্‌কেসটা গুছিয়ে কাপড়জামা পরে সাবির সামনে ঘোরাফেরা করতে লাগল রমাপতি। বিশুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, তোর মাকে একবার দেখতে যাবি বিশু? ঝনাৎ করে মেঝের ওপর শ্লেটখানা ফেলে দিয়ে বাপের সামনে এসে দাঁড়াল বিশু।

কখন যাবে বাবা? এখন?

তোমার মাসিমাকে জিজ্ঞাসা কর। সাবি কিছু বলবার আগেই বিশু তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, যাব মাসিমা?

যাও, বলে রমাপতির মুখের দিকে চাইল সাবি। রমাপতি

বিশুকে বলল, তা হলে মুখ হাত পা পরিষ্কার করে জামা কাপড় পরে নাও।

বিশু চলে যেতেই সাবিকে বলল রমাপতি, অবস্থা খুব ভাল নয়। একবার দেখিয়ে আনি। সংক্ষিপ্ত কটি কথার মধ্যে কি ভয়াবহ সম্ভাবনাই না লুকিয়ে ছিল। সাবির মুখখানা নীল হয়ে উঠল।

বিশুকে সঙ্গে করে চলে গেল রমাপতি। যাবার সময় সমস্ত সংসারের দায়িত্ব, এমন কি ডাক্তারখানার চাবি পর্য্যন্ত সাবির হাতে দিয়ে গেল। তিন চারদিন পরে একলা ফিরে এল রমাপতি।

বিশু এল না? রমাপতিকে জিজ্ঞাসা করল সাবি।

না, বলে কার্য্যান্তরে চলে গেল রমাপতি। কিন্তু যে খবরটা জানতে এ কদিন মনে মনে ছটফট করেছে সাবি,—তিনটি সন্তানের জননী সৌভাগ্যবান স্বামীর ঘরণীর কুশল সংবাদটাযে সকল সমস্যার উর্দ্ধে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও, রমাপতির মুখের ভাব দেখে সে যেন সব ভুলে গেল। এমন কি দিনের মধ্যে অনেকবার রমাপতির সঙ্গে দেখা হলেও এই অত্যাবশ্যক জিজ্ঞাসাটা কোথায় যেন আত্মগোপন করে রইল।

ডাক্তারখানা থেকে একটু বেশী রাত করে ফিরে এল রমাপতি। সাবির ব্যবস্থামত নতুন ভর্ত্তি করা পাচক খাবার ঢাকা দিয়ে নিজের আস্তানায় চলে গেছে। রান্নাঘরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখে শোবার ঘরে চলে গেল রমাপতি।

আমূল পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা! দুদিনেই সব বদলেছে। সন্ধ্যার আগে নিজের খাবার নিয়ে বাড়ী চলে যেত সাবি। এ কদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাত্রিবাস করছে এইখানেই। ছোটছোট দুটি কচি ছেলেমেয়ে, মোটামুটি সম্পন্ন অবস্থা ডাক্তারের। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে গেছে

ভয়ে। হেলা চৌকিদারের হাঁক শুনতে কান পেতে অপেক্ষা করেছে, হঠাৎ ঘুমভাঙ্গার পর। কিন্তু আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রে, ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ে সম্বল বাড়ীতে শুধু রাত কাটানোর প্রয়োজন ছাড়াও তার দায়িত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ রূপটা হঠাৎ কল্পনায় আসতেই ভয়ে, সঙ্কোচে সে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। তবুও কোন রকমে রমাপতির ঘরের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল সাবি। দোরের ফাঁক দিয়ে দেখল খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে রমাপতি।

ডাক্তারবাবু?

কে? সাবিত্রী? বাইরে কেন? ভেতরে এস।

বাইরে থেকেই বলল সাবি, খাবারটা বেড়ে নিয়ে খেয়ে নিন রাত হয়ে গেছে।

আজ আমার ক্ষিদে নেই। কিছু খাব না মনে করছি।

খেয়ে এয়েছেন? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে সাবির সামনে এল রমাপতি।

না, খেয়ে ঠিক আসিনি, চল যাচ্ছি। সাবি বেশ বুঝতে পারল, পাছে সে না খায় এই ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খেতে রাজী হল রমাপতি।

রান্নাঘরে এসে খাবারের ঢাকা খুলল রমাপতি। তরকারিটা ঠাণ্ডায় জমে বড় বাটির ভিতর চাপ হয়ে বসে গেছে। ডালেরও অনুরূপ অবস্থা। খানকতক রুটির ওপর একগোছা লুচি গায়ে-গায়ে জড়িয়ে ময়দার তালের মত ডেলা পাকিয়ে গেছে!

নির্ব্বিকারচিত্তে খাবারের সরঞ্জাম টেনে নিয়ে খেতে বসল রমাপতি।

ও কি করছেন? পিঁপড়ে থুক থুক করছে। পরিষ্কার করে নিন। হাত দিয়ে ওপর ওপর পরিষ্কার করে নিয়ে হেসে বলল রমাপতি,

পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখে। যদি শিখতে পারি আর হাবুডুবু খেতে হবে না। সাধারণতঃ এ ধরনের রসিকতায় ঠিক অভ্যস্ত নয় সাবি। তবুও একটুখানি হাসি সে সামলাতে পারল না।

কিন্তু তবুও যখন একখানা লুচি ছিঁড়ে তরকারির বাটিতে ডুবিয়ে নিতে গেল রমাপতি, হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে আর একবার দেখতে গিয়ে চমকে উঠল সাবি। ছোট ছোট লাল পিঁপড়ে ছেঁকে রয়েছে জমাটবাঁধা তরকারির ওপর। কোথা থেকে কি হল বলা যায় না; সঙ্গে সঙ্গে রমাপতির কোলের কাছ থেকে লুচি তরকারির পাত্র দুটো সরিয়ে নিল সাবি।

খিদে নেই বলছিলেন না, আজ আপনার খেয়ে কাজ নেই ডাক্তারবাবু।

খিদে নেই বলেছি নাকি? তা হবে।

ও মা! এইত বললেন।

বলিনিত বলছিনে। বেশী রাত করে ফিরলে এই অবস্থাই হয় আমার। খাবারগুনো কুকুরকে ধরে দিই। কিন্তু তোমাকে ত উপোস করিয়ে রাখতে পারব না।

রমাপতির আত্যন্ত ব্যবহার, তার চোখমুখের ভাব, কথা বলার ভঙ্গি সাবির বুভুক্ষু নারী মনের অন্তঃপ্রদেশটা একরকম অপূর্ব্ব অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলল।

সাবি বলল, আমার কথা বাদ দেন। আপনি যে খেতে পেলেন না?

তা আর কি করা যাবে বল, কপালে আজ খাওয়া নেই।

সাবির মনে কি একটা যেন বিঁধে গেল।

রমাপতি আবার বলল, কিন্তু কালও যদি এরকম হয়? উড়ে ঠাকুর ত রাত নটার পর ঠিক আড্ডায় ফিরে যাবে।

কথার প্যাঁচের ভেতর দিয়ে যে পথটা খুঁজছিল রমাপতি, সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ঠিক সেই পথের দিকেই চলেছিল সাবি, কিন্তু সে যেন কতকটা অন্ধের মত।

বাজারে দোকান খোলা নেই? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

থাকেতে পারে। তবে বাজারের খাবার আমি খাই নে। কিন্তু অত ভাববার ত কিছু নেই, ঘরে ত সবই রয়েছে।

সাবিও ঠিক এইটাই চাইছিল। তাই বলল, তা হলে ত ভালই হয়। আমি সব যোগাড় করে দিচ্ছি, উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। আপনি লুচি কখানা ভেজে নিন, আর একটু আলুর তরকারি করে ফেলুন।

ছোট একটা টুল টেনে নিয়ে বসল রমাপতি। ময়দা মাখা শেষ করে তরকারি কুটতে লাগল সাবি। এতক্ষণে মনে পড়ল সাবির গৃহকর্ত্রীর খবরটা এখনও জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

হাঁ। ভাল কথা। বিশুর মা কেমন আছেন বললেন না ত? ভাল আছেন তিনি?

একটুখানি চুপ করে থেকে বলল রমাপতি, একটু ভাল বলেই মনে হল। এখানে মোটে যত্ন পেত না, গিয়ে ভালই হয়েছে।

বিশু কবে আসবে?—সাবি জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু ঠিক সঙ্গে সঙ্গে জবাবটা দিতে পারল না রমাপতি। একটু ঢোক গিলে বলল, বিশু? আসবে দিনকতক পরে।

আমার কথা কিছু বলল না বিশু?

বলল বৈকি। বিশু তোমাকে ভালবাসে।

কাঠের উনুন ধরিয়ে রমাপতিকে বলল সাবি, এইবার নিন, তরকারিটা চাপিয়ে দিন।

রমাপতির ওঠবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। নিশ্চিন্তমনে

একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, সবই যখন করলে, ওটুকুও করে ফ্যাল। আমি এখন গাদার মড়া। শরীর একেবারে এলিয়ে পড়েছে।

চিরাচরিত সংস্কারের সঙ্গে এইবার রীতিমত ধাক্কা খেল সাবি।

কি যে বলেন ডাক্তারবাবু। নোকে বলবে কি বলুন ত? উনুন ধরে উঠেছে, আর দেরী করবেন না।

না পার, উনুনে জল ঢেলে দাও। আমি শুতে চললাম।

রমাপতি চলে যায় দেখে সাবি বলল, পারব না কেন? বলুন, পাপ যদি হয় আপনার।

নিশ্চয়। সমস্ত পাপ আমার।

তা হলে আমার কোন দোষ নেই?

না নেই। তিন-সত্যি করব?

ভাল করে হাত ধুয়ে সত্য সত্যই রান্না করতে আরম্ভ করল সাবি। তৃপ্তির একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল রমাপতি, যাক্। এতদিনে একটা দুর্ভাবনা কাটল।

কিসের? রান্না করতে করতে জিজ্ঞাসা করল সাবি।

পেটের! আবার কিসের?

কিন্তু ভাল করলেন না। দেখবেন ছেলেমেয়েদের বিয়ে হবে না।

হেসে উঠে বলল রমাপতি, এখন ত খেয়ে বাঁচুক, তারপর বিয়ে।

আপনার হাতের জলও কেউ খাবে না।

সে ভয় তোমার নেই সাবিত্রী। আমার হাতে জল কেন, বিষ দিলেও লোকে খাবে।

তা নয় খেল। কিন্তু আপনি দুলে হয়ে গেলেন।

না। বরং তুমিই বামুন হলে।

সাবি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সদ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির

ঘোষণায়, কিংবা আগুনের আঁচে, বা অন্য কোন কারণে, গৌরবর্ণ মুখখানা তার সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠল।

রমাপতি আবার বলতে লাগল। আমি জাত মানি না সাবিত্রী, মানুষ মানি। যার প্রাণে দয়া আছে, সেই মানুষ। তা না হলে আর ভাবির হাতে খাই? সাবির মুখের দিকে চাইতে গিয়ে দেখল রমাপতি, রক্তিমাভা সরে গিয়ে মুখখানা তার বিবর্ণ হয়ে উঠছে।

কিন্তু উল্লাস তখনও থামে নি রমাপতির। নিজের বুদ্ধি আর অধ্যবসায়ের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার। সাবিরও রূপ ছিল, যৌবনও ছিল অটুট। অন্ততঃ সেইটুকুর লোভেই গোড়া থেকে রূপশিকারীর মত খেলতে আরম্ভ করেছিল রমাপতি। কিন্তু এক-দিনেই সে ভুল তার ভেঙ্গেছে; বুঝেছে এ খেলা তার আগুন নিয়ে খেলা। ইতরশ্রেণীর নারীদেহের মধ্যে যে এতটা সূক্ষ্ম সংবেদনশীল ভদ্র মন লুকিয়ে থাকতে পারে, যে মনের সংস্পর্শে তার মত চতুর বুদ্ধিও পথ হারিয়ে ফেলে, এ ধারণা তার কোনদিন ছিল না।

কি করে আবার আরম্ভ করবে ভাবছিল রমাপতি, সাবিই সূত্রটা ধরিয়ে দিল। কড়ায় ঘি ঢেলে দিয়ে লুচি বেলতে আরম্ভ করে বলল, শুনিছি লুচি নাকি মুচির হাতেও খাওয়া যায়। ভাত রেঁধে খাওয়াতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।

রমাপতি বলল, তা জানি। জাত ভাতের: মধ্যে। আমাদের গাঁয়ের এক ব্রাহ্মণ জমিদারের ছেলের খুব ছোট বয়সে মা মারা যায়। হাড়ীর মেয়ের দুধ খেয়ে তিনি মানুষ হন। বড় হয়ে একদিন দুপুর বেলা তিনি খেতে বসেছেন, হাড়ী মেয়েটি তখন বুড়ো হয়েছে, সটান এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে খাওয়ার ঘরে। খাওয়া ফেলে উঠতে হল ভদ্রলোককে। দেখ দিকি কি রকম নিষ্ঠা। বলিহারি!

তা বলে কি আমার হাতের ভাতও খাবেন নাকি ?

আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে, খাবার জিনিস সবই সমান; ভাত, লুচি, পোলাও, কালিয়া যাই কেন না বল।

কেন দুদিনের জন্যে বাড়াবাড়ি করছেন ডাক্তারবাবু ? আজ বাদে কাল যখন বিশুর মা ভাল হয়ে ফিরে আসবেন, তখনত তাঁকে জবাব দিতে হবে আমাকে।

রমাপতির উচ্ছ্বাস গলে জল হয়ে গেল। তবুও নিজের জিদ বজায় রাখতে বলল, তোমাকে জবাব দিতে হবে না সাবিত্রী। দরকার হলে আমিই জবাব দেব। কিন্তু কবে তিনি ফিরে আসবেন বলে আমি ত আর উপোস করে মরতে পারি নে।

এখন আপনি ঝোঁকের মাথায় যাই বলুন, পরে দেখবেন, এ নিয়ে অনেক কথা উঠবে। নিন, এইবার খেতে বসুন।

জায়গা পরিষ্কার করে, আসন পেতে খাবার সাজিয়ে দিল সাবি।

বাইরে থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল রমাপতি।

এ কি ? সবগুনো আমাকে ধরে দিচ্ছ, তুমি কি খাবে ?

আপনি খান ত। বড্ড বাজে বকেন আপনি।

ও ! নিজের খাবার কথাটা বুঝি বাজে কথা হল। এইখানেই ভাবির সঙ্গে তোমার তফাৎ সাবিত্রী। ভাবি নিজের খাবার আগে তুলে রেখে তবে আমাকে খেতে দিত।

সাবির সূক্ষ্মমন রমাপতির এই প্রসংসার বাক্যেও সন্তুষ্ট হতে পারল না। অধিকন্তু বারবার ভাবির সঙ্গে তুলনা ওঠায় তার গায়ে যেন আগুনের ছেঁকা লাগছিল। একটু উত্তেজিত ভাবে সে বলল, অদেষ্টের দোষে আপনার দোরে দাসীবিত্তি করতে এইচি বলে ভাবির সঙ্গে আমার তুলনা দেবেন না ডাক্তারবাবু।

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলল রমাপতি, ছি ছি। সত্যিকথা বলতে কি, তোমার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি ওরকম মেয়েমানুষ আমি দেখিনি। তা ছাড়া তোমাকে যদি দাসী মনে করতাম, তা হলে ভাবিকে দিয়েইত সে কাজ চলত।

রমাপতি দোষ স্বীকার করলেও, অপ্রীতিকর আবহাওয়াটা সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার হল না। দুচারখানা লুচি খেয়েই উঠে পড়ল রমাপতি।

এ কি ? কিছুইত খেলেন না ? সাবি ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এত রাত্তিরে এর বেশী আর খাব না। রমাপতি বাইরে চলে গেল।

পান সেজে নিয়ে রমাপতির ঘরের কাছে গিয়ে সাবি দেখল, দরজা বন্ধ। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাঘরে ফিরে এল সাবি। খাবারগুলো ঢাকা দিয়ে সরিয়ে রেখে রান্নাঘরটা ধুয়ে ফেলল। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বাইরে আসবে, রমাপতি দোরের সামনে এসে দাঁড়াল।

খেলে না ?

খেয়েছি ! সরুন আপনি। সাবির সুমুখ থেকে একটু সরে গিয়ে বলল রমাপতি, কোথায় খেয়েছ ?

মেয়েমানুষের খাওয়া বেটাছেলের দেখতে নেই।

খেলে দেখতে নেই, না খেলে দেখতে হয় বৈ কি ! তুমি খাও, আমি চলে যাচ্ছি।

আমার শরীর ভাল নেই ডাক্তারবাবু, আজ আর কিছু খাব না। ঢাকা দেয়া আছে, কাল খাব।

শরীর ভাল নেই ! দেখি ? বলতে বলতেই সাবির কপালে

হাত দিয়ে বল্‌ল রমাপতি ঃ না। শরীর তোমার ভালই আছে। আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল সে। অস্পষ্ট আলোতেও যেন দেখল সাবি, রমাপতির মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেছে।

শীতের রাত্রি জমাট হতে লাগল প্রহরে প্রহরে; নিস্তব্ধ, নিশ্ছিদ্র। ছেলেমেয়ে দুটি গরম বিছানায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সুতোকাটা ঘুড়ির মত বিচ্ছিন্ন হতে লাগল সাবির মন চিরদিনের অভ্যস্ত চিন্তাধারা থেকে। তারই ওপর রাগ করে আজ খেল না রমাপতি। খাবার সময় ভাবির কথা তুলে খোঁচাটা না দিলেই ভাল হত। অথচ বিশেষ অন্যায় কথাত বলেনি রমাপতি। ভাবির সঙ্গে তুলনা করায় এমন কি দোষ হতে পারে? ভাবিও যা করত; সেও ত সেই কাজই করছে। তবে তার এত গায়ের জ্বালা কেন? শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগল সাবি, কিন্তু পাকা ঘরের গরম বিছানা ছেড়ে অবাধ্য মনটা তার পৌষের হাড়কাঁপান ঠাণ্ডায় রমাপতির দোরের সামনে বার বার আনাগোনা করতে লাগল। নিজে ভাল করে না খেয়ে তাকে খাওয়াবার জন্য কত চেষ্টা করল যে লোক, তার সঙ্গে তার ব্যবহারটা কি ভাল হল?

হঠাৎ বাড়ীর সামনে পথচলতি একটা কুকুর আচমকা ডেকে উঠল। তারপর আরও খনিকটা সরে গিয়ে আবার ডাকতে লাগল। একটু পরে মনে হল তার ঘরের পিছনে কে যেন চাপাগলায় কথা বলল দু'একবার। বুকের ভেতরটা সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ ঢিপ করে উঠল সাবির। হাতপাগুনো যেন অবশ হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও আর কিছু শুনতে পেল না সাবি। একটু একটু করে অভিভূত ভাবটা কেটে যেতে, আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে সে

উঠে পড়ল। একলাইনে পাশাপাশি তিনখানা ঘর। প্রথম ঘরখানায় সাবি শোয়। মাঝেরটা খালি। শেষ ঘরখানায় রমাপতি থাকে। বাইরের দিকের জানালাটা খুব সাবধানে একটুখানি ফাঁক করে দেখতে লাগল সাবি। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেল না। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চাইতে যেন মনে হল, রমাপতির ঘরের পূর্ব্বদিকে ছোট পেঁপে-গাছের তলায় দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কাপড়ে চোখদুটো ভাল করে মুছে নিয়ে লোকদুটোকে চিনতে চেষ্টা করল সে। একটু আগে রমাপতির ঘরের ঘড়িতে দুটো বাজতে শুনেছে। চাঁদ না থাকায় আকাশে জ্বল জ্বল করছে নক্ষত্র। কুয়াসার কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নেই কোনখানে। মূর্ত্তিদুটো যেন কৌতুকপুরের বাজারের বারোয়ারী পূজায় গড়া দারোয়ানের মত একভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একটা মূর্ত্তি যেন সাবির বড্ড বেশী চেনা। সারা দেশটায় এক পঞ্চু ছাড়া এতখানি লম্বা চেহারা আর কারুর আছে বলে সে জানে না। শীতের রাত্রেও কানমাথা গরম হয়ে উঠল সাবির; এই, এইত ছায়া থেকে সরে এল মূর্ত্তিদুটো। খালি পা, মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা, লম্বা জামা গায়, মাথায় পাগড়ির মতন করে কি জড়ান। হ্যাঁ, পঞ্চুই বটে। ঘন বর্ষা নামলে ঐ জামাটা নিয়ে রাতে মাছ ধরতে যেত পঞ্চু। রমাপতির ঘরের জানালায় কান রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দুজন। পরে বাগানের বেড়া টপকে দুজনেই বেরিয়ে গেল। জানালার গরাদের ওপর মাথা রেখে অবিষ্টের মত চেয়ে রইল সাবি।

সমস্ত রাত বিছনায় ছটফট করে ভোর বেলায় উঠে পড়ল সে। স্পিরিট ল্যাম্প্ জ্বেলে হরলিক্স্ তৈরি করে খাইয়ে দিল ছোট খোকাকে। মেয়েটিকে উঠতে দেখে বলল, এখন কেন উঠছিস মঞ্জু। রোদ উঠুক, তারপর উঠবি। সাবি বুঝেছে, এ বাড়ীর আশ্রয়ই

তার শেষ আশ্রয়। কোন্ ভরসায় সে এতদিন বাড়ী যাওয়া আসা করছিল! শেষ পর্যন্ত পঞ্চুও তার শত্রু হল? তাকে বাদ দিলে এ বিশ্বসংসারে আর কে রইল তার। ভাবতে গিয়ে চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠল।

রোদ ওঠবার আগেই বাইরের কাজকর্ম্ম সব সেরে ফেলল সাবি। রমাপতি উঠে মুখ ধুতে গিয়ে দেখল, বালতির জল থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। হাত দিয়ে দেখল গরম। মাজন, টুথ্ ব্রাশ্ জলচৌকির ওপর সাজান। হঠাৎ যেন মনে হল রমাপতির, গৃহস্থালির প্রত্যেকটি কাজকর্ম্মে একটা দরদী মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় মাখান রয়েছে। নিজের স্ত্রীর কাছেও ঠিক এ জিনিসটা মেলেনি তার। অথচ নারীধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব দানকে সে ভাবির খেয়ালী দাসীবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করতে গেল! মুখ হাত পা ধুয়ে নিজের হাতে ষ্টোভ জ্বালল রমাপতি। চায়ের বাসন গুনো সাজিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সাবি। রমাপতি বলল, এ কাজটা আমি বরাবর করি। তোমার না করলেও চলবে।

ও আমি পারবও না। বাবা মাঝে মাঝে চা খেত, একঘটি চা আর একঘটি দুধ মিশিয়ে চা হত। চিনি থাকল ভালই, নয়ত গুড় মিশিয়ে মিষ্টি হত। বলেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি গোপন করল সাবি।

রমাপতি বলল, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের ওটুকু শিখে নিতে দু' দিনের বেশী লাগবে না। তবে সকালে চা হালুয়া তৈরি করা আমার একটা নেশা।

কথাবার্ত্তার মধ্যে গত রাত্রের ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করল সাবি, তবে পঞ্চুর নামগন্ধ বাদ দিয়ে। চায়ের বাটি নামিয়ে

রেখে চোখদুটো বড় বড় করে চেয়ে রইল রমাপতি, তারপর বলল, তোমার কি মনে হয় বল ত ?

উত্তরপূর্ব্ব বিচার না করেই বলে ফেলল সাবি, আমাদের পেছনে নোক লেগেছে আর কি !

সাবির সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষাটা অনেকদিন থেকে অঙ্কুরিত হয়ে ভেতরে ভেতরে পত্রপল্লব বিস্তার করছিল, সাবির কথার মধ্যে সমর্থনের ভাবটা পেয়ে একেবারে নিঃসঙ্কোচ হয়ে উঠল রমাপতি। ঠিক তাই। এর ঢেউ কতদূর গিয়ে লেগেছে জান ? বলেই একটু-খানি থেমে আবার বলল রমাপতি, আমার শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত। দেখ দিকি, একে বেচারী অসুস্থ, তার ওপর তার মনটা পর্য্যন্ত ভেঙ্গে গেল। অনেক করে বুঝিয়ে দিয়ে এলাম, তাও কি শুনবে ? মেয়েমানুষের মন, তার ওপর রুগ্ন মানুষগুনোর ঐ ভয়টা বড্ড থাকে।

সাবির মুখখানা লজ্জায় বুকের ওপর নেমে এল, তবুও কোন-রকমে বলল, তা হলে আমার আর এখানে থাকা উচিত নয় ডাক্তারবাবু।

অত্যন্ত শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল রমাপতি, কেন ? ভয়ে ?

একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল সাবি। তারপর সামলে নিয়ে বলল, মিছিমিছি একজন কষ্ট পাবে, সেটা কি ভাল ?

তা হলে তুমি বলতে চাও, সত্যি সত্যি যদি কষ্ট পায় তা হলে ভাল হবে ?

যান্, আমি কি তাই বললাম না কি ?

তুমি না বললেও সবাইত তাই বলছে। এখন তুমি চলে গেলেও, দুর্নাম তোমার যাবে না।

ক্ষীণ অসহায় হাসির সঙ্গে বলল সাবি, নোকের কথা এখন আর গায়ে নাগে না ডাক্তারবাবু। আমি ভাবছি বিশুর মায়ের কথা।

তা ভাব।

সাবিকে আর বাদপ্রতিবাদের অবসর না দিয়ে বাড়ী থেকে চলে গেল রমাপতি।

৬

দুলের ঘরে জন্মালেও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল পঞ্চুর চরিত্রে। উচ্চবর্ণের মোটামুটি ভব্যতার ছাঁচে বাল্যজীবনটা তার গড়ে উঠেছিল। বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীরামদাসের মহাভারত প্রায় সবটাই পড়ে ফেলেছিল। পাঁজির পাতায় ওলকপির বিজ্ঞাপন থেকে হরপার্ব্বতীর সংবাদ পর্য্যন্ত একনিশ্বাসে পড়ে গিয়ে শেষের দিকের রেলওয়ে ডাইরেক্টরীর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুনোর তালিকায় এসে তার মনটা আটকে যেত। জ্বালামুখীতে দেবীর জিভ্ থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে লক্ লক্ করে, নেড়া ভট্চার্য্যের দিদিমা দেখে এসে গল্প করেছেন পাড়ায় পাড়ায়। যাত্রা কথকতার আসরে ভদ্রশ্রেণীর আসনের গণ্ডীর বাইরে বসে স্ত্রীপুরুষের অবাধ প্রণয়ের তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে মনটা তার আদর্শবাদের রূপালী তবকে একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। দেবতার নীলেখেলার দোহাই থাকলেও মনের রসে যে ব্যাখ্যাটা আপনা হতেই জড়িয়ে গিয়েছিল, সেই পরম অনুভূতিটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সেইদিন, যেদিন অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে সাবিকে অধবুড়ো গণেশের গলায় গেঁথে দিল প্রহ্লাদ দুলে। সামাজিক অব্যবস্থার এই দিকটার সঙ্গে ভাগবতের রাসলীলার মধুর রস আর

ঠিক খাপ খেল না। অনেকদিন ধরে সঞ্চয় করা মধুচক্রে কে যেন খোঁচা দিয়ে খানিকটা মধু বের করে দিল। কিন্তু এই অপচয় তার কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে উঠল একদিন, যেদিন উদ্ভিন্নযৌবনা সাবি তার হাত ধরে কেঁদে বলল, নেশাখোর বুড়োর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে তার পঞ্চুর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া অনেক ভাল। মনে পড়ল অনেককিছু, কৃষ্ণযাত্রায় শোনা আয়ান ঘোষের উপাখ্যান। সাবিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী এল পঞ্চু। দু হাত কপালে ঠেকাল। বাপ রে! দেবতাদের লীলেখেলা, আমাদের কাছে মহাপাপ! গুটিপোকার মত তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে জাল বুনছে পঞ্চু। সাবির মত সুন্দরী দেখে সেও বউ আনবে ঘরে।

এইভাবেই এতদিন কেটেছে। সাবির মত সুন্দর না হলেও, মোটামুটি সুশ্রী বউও সে পেয়েছে। কিন্তু সাবিকে নিয়ে যে সমস্যাটা বেধেছে তার অল্পবয়স থেকে, দিনের পর দিন সেটা আরও ঘোরাল হয়েই উঠল। প্রহ্লাদ মরেছে, গণেশও মরেছে, কিন্তু পঞ্চু ঠিক মরতে পারল না। সাবিকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিল, ষোল আনা মনের এক আনাও ভাগ করে দিতে পারল না। তখনও রামায়ণ, মহা-ভারতের এলাকায় কোনরকমে মাথা গুঁজে আছে পঞ্চু।

কিন্তু বাস্তবজীবনের সীমাবন্ধনী ভাববিলাসিতার গণ্ডী ছাড়িয়েও যে বহুদূর বিস্তৃত সেই রকমের একটা আভাস পেল পঞ্চু, যেদিন মাবাপের বিয়োগব্যথার ঘা শুকুতে না শুকুতেই সে দেখতে পেল রমাপতি ডাক্তারের শাল গায়ে জড়িয়ে তার সঙ্গে সোহাগ করতে করতে বাড়ী আসছে সাবি, দুপ্রহর রাত হবার পর। অথচ সাবিকে একঘরে করবার ষড়যন্ত্রটা কি করে উলটে দেওয়া যায়, সেই যুক্তি করতেই সে রাতের অন্ধকারে সাবির বাড়ী এসেছিল।

সাবি যেদিন রমাপতির বাড়ী গিয়ে উঠল, সেইদিনই বউয়ের মুখ থেকে খবরটা শুনতে পেল পঞ্চু। রাগে, দুঃখে অপমানে কথা বলবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে গেল তার। বিক্ষুব্ধ মনের মধ্যে একটি মাত্র অনুভূতি জেগে রইল যে, এক মা ছাড়া নারীজগতের সঙ্গে যেটুকু সংস্রবে সে এসেছে তাতে শুধু লজ্জা ব্যতীত আর কিছু নেই। তার-পর থেকে কথায় কথায় স্ত্রীর চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করে কথা বলা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ হয়ে উঠল। কোমল বৃত্তিতে ভাঁটা পড়ায় মনের সুরটাই বদলে গেল পঞ্চুর। স্বামী স্ত্রীর সংসারযাত্রা, তবুও দিন আর চলে না। ঘরামির কাজে হাত আসে না; চাষের কাজও ভাল জানা নেই। মোড়লদের সঙ্গে মজুমদারের ঝগড়া মিটে গেছে; চরের জমি আপোষে ভাগবাটোয়ারা হয়ে গেছে। অতএব লাঠির প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। বাকী আছে ভূপতি মজুমদারের পার্শ্বচর বৃত্তি। কিন্তু সে বিদ্যাও ঠিক জানা নেই পঞ্চুর। তা ছাড়া মজুমদারের কাছে অনেকগুনো টাকা দেনা। বউয়ের দুলজোড়াটা এবং দু' বছরের জন্য গরুটা দিয়েও তার পাওনা ষোল আনা মেটেনি।

শুকন মুড়ি চিবিয়ে রাত কাটিয়ে ভোর বেলা একদিন বেরিয়ে পড়ল পঞ্চু। বউকে বলে গেল একটু পরেই চাল ডাল নিয়ে ফিরবে। শীতের ঘন কুয়াসার মধ্যে চরণের ছোট্ট জেলে ডিঙ্গিখানা তখন ঘাটে এসে লেগেছে। বড় একটা ঝুড়ি ভরতি ছোট চিংড়ি আর বেলে মাছ, কাছিমের হাড় বাঁধা দড়ির জালে চাপা দেওয়া রয়েছে ডিঙ্গির খোলের ভেতর।

কেডা গো? ফুলচাঁদ ভাই না কি? মোটাগায়ের কাপড়ে একটা চোখ ঢাকা চরণের, তার ওপর ঘন কুয়াসার আস্তরণ, কোলের মানুষ চেনবার উপায় নেই।

না চরণদা, আমি পঞ্চু।

তুগ্ গা, তুগ্ গা। খস্ করে ডাঙ্গার ওপর নৌকার সম্মুখভাগটা তুলে দিয়ে জলের ওপর নেমে পড়ল চরণ। প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল, চরণ একটা কথাও বলল না। বাধ্য হয়ে চুপ করে রইল পঞ্চু।

চরণদা, আমি এয়েছিলাম।

তাত দেখতেই পাচ্ছি। বলেই কুয়াসার ভেতর সূক্ষ্ম দূরবীণের মত দৃষ্টি চালিয়ে কি যেন দেখে নিল চরণ।

এস, এস মেঘনাল, বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি রোজন দেখে ন্যাও বাপু। পঞ্চু দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। মেঘলাল নিকিরী ঘাটে এসে ঝুড়ি নামিয়ে রাখল, তারপর দাঁতন করতে করতে চরণের সামনে বারকতক পায়চারি করে বেড়াল। তাড়াতাড়ি মাছের ঝুড়ি ডিঙ্গিনৌকা থেকে তুলে এনে মাটিতে নামাল চরণ। সেঁউতি ভরে জল তুলে ঝুড়িতে ঢালতেই ছোট ছোট বেলে মাছগুলো সোৎসাহে লাফালাফি করতে লাগল।

এইবার কথা বলল মেঘলাল, ঐ কডা মাছের আর কি ওজন করবা চরণদা। থাউকো একটা দাম বল, দিয়ে দিচ্ছি।

ও সব ঐ পাকিস্থানী জেলেদের সঙ্গে চলে মেঘু। ওদের ত আর খরচা বলতে নেই কিছু, সব ফোকটে করছে, আমাদের কাছে নয়। তা ছাড়া এখন হচ্ছে টানকাল। গর্ত্ত, জুলি, খানা, নালা খটখট করছে। এখন সেরদরে মাছের আঁশ বিকোয়। বলেই মাছের ঝুড়িতে আর এক সেঁউতি জল ঢেলে দিয়ে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসল চরণ।

দাঁতনকাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে চরণের কাছে এল মেঘলাল। মাছের ঝুড়িটা শূন্যে তুলে ধরে সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করে ঝরিয়ে ফেলল।

ওজন মিটিয়ে ফেলে দাম ঠিক করতে যেতেই ইসারায় কি একটা জানাল চরণ, সঙ্গে সঙ্গে মাছ নিয়ে পাড় ভেঙ্গে কিনারায় উঠে চলে গেল মেঘলাল।

এইবার যেন পঞ্চুর কথা মনে পড়ল চরণের। বাঁ চোখটা টেরচা করে জিজ্ঞাসা করল, তারপর পঞ্চাবাবু! রাত পোয়াতেই কি মনে করে? অনাহারে, অর্দ্ধাহারে গায়ের রক্ত মাথায় চড়ে ছিল পঞ্চুর। বিনা ভূমিকাতেই বলল, অনেকদিন হয়ে গেল চরণদা, আমার ট্যাকা-কড়া দিয়ে দ্যাও।

ট্যাকা? দন্তবিহীন মুখগহ্বরটা বেরিয়ে রইল চরণের।

আকাশ থেকে পড়লে নাকি? পেরায় চল্লিশ ট্যাকা পাওনা তোমার কাছে।

হাসতে হাসতে মাটিতে বসে পড়ে বলল চরণ। জলের কাজে বুড়ো হয়ে গ্যালাম পঞ্চা, আজ তুই নতুন কথা শোনালি! আমার জাল, আমার দড়া, নৈকো বঁড়শি সব আমার। শুধু সঙ্গে ছিলি বলে ট্যাকাটা সিকেটা যেদিন য্যামন পেইছি, দিইছি। তোর আবার পাওনা কি র‍্যা পঞ্চা?

পঞ্চুর মাথাটা একটু ঘুরে উঠল। সে কি? নিজের মুখে কথা দিয়ে এখন কথা ঘুরোচ্ছ কেন চরণদা?

টেনে টেনে শুকন হাসি হেসে বলল চরণ, চল্লিশ ট্যাকা! জাল, দড়ি, বাঁশ, সুতো বড়শির দাম দিয়ে, নৈকো মেরামত করে কড়া ট্যাকা থাকে রে, যে তোরে চল্লিশ ট্যাকা দেব? বলে 'মূল ঘরামির মটকা আদল।' শুনতেই মাছধরা ব্যাওসা। শুধু কাদামাখা সার রে, শুধু কাদা মাখাই সার।

ভূতের কাছে মাম্‌দোবাজি কর না চরণদা। সোঁত বরষাডায় কম

করে হাজার ট্যাকার ওপর তুমি ঘরে তুলেছ। দশ ট্যাকার, পনের ট্যাকার মাছ বিক্রী করেছ এস্তোনাগাদ চার পাঁচ মাস ধরে রোজ।

চরণ যেন শুনতেই পেল না কথাটা। নগি পুঁতে ডিঙ্গিটা শক্ত করে বেঁধে মোটা কাঁথাখানা কাঁধে তুলে নিল।

দেবা না? স্পষ্ট করে বল। চরণের পথ আটকে দাঁড়াল পঞ্চু।

সর্, সর্। সকাল বেলা ঝামেলা করিস্ নে বাপু।

দেবা কি না বল। চরণের গলায় হাত দিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিল পঞ্চু।

না, না। দোব না। তোর যা মন চায় করতে পারিস্।

রাগে গর গর করতে করতে পঞ্চুকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল চরণ। বজ্রমুষ্টিতে চরণের একখানা হাত চেপে ধরল পঞ্চু। যাচ্ছ কমনে? পাঁচজনা ভদ্দরনোকের কাছে চল, সেইখেনেই বিচার হবে।

হাত ছাড় শালা, ছোটনোক! ভদ্দরনোকের তেল মাখাগে তোরা শালারা; বউ ঝি তুলে দিগে যা তাদের ঘরে। বলতে বলতেই চিৎকার করে উঠল চরণ, বাপ্‌রে মেরে ফেলেছে!

প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেয়ে মাটিতে পড়ে বারকতক হাত পা ছুঁড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল চরণ। একদিকের কসের অবশিষ্ট দুখানা দাঁত ছিটকে পড়ল দু দিকে।

পঞ্চু ভয় পেল। তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে চরণের মুখে মাথায় ঝাপটা দিতে লাগল।

উঃ! ঠাণ্ডা জলের গুণে একটু পরেই মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল চরণের।

বড্ড লেগেছে চরণদা? ও চরণদা, বলি শুনছ?

রক্তবর্ণ চোখ মেলে পঞ্চুর মুখের দিকে চাইল চরণ। আস্তে আস্তে বলল, একটু জল দে পঞ্চা। বড্ড তেষ্টা লেগেছে।

মাটির ওপর চরণকে শুইয়ে রেখে সেঁউতি ভরে জল নিয়ে এল পঞ্চু। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে চরণের মুখের রক্ত, লালা আর কাদামাটি ধুইয়ে নিজের কাপড়ে মুছিয়ে দিল। তারপর একটু একটু করে জল ঢেলে দিতে লাগল মুখে।

আঃ! আস্তে আস্তে উঠে বসল চরণ, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল মুখের ফাঁক দিয়ে। মাথাডা বড্ড ঘোরছে।

এখন উঠ না চরণ দা। দ্যাঁড়াও, বলতে বলতেই চরণের তুটো হাঁটুর তলায় এক হাত আর মাথার তলায় আর একখানা হাত দিয়ে পাড় ভেঙ্গে ওপরে উঠে পরিষ্কার ঘাসের ওপর তাকে শুইয়ে দিল পঞ্চু।

কুয়াসারজাল ছিন্নভিন্ন করে একটু একটু রোদ দেখা দিচ্ছে তখন। গঙ্গার ওপারের সীমারেখা পর্য্যন্ত স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

আর একটু জল খাবা চরণদা? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

দে। ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল চরণ। আবার জল এনে চরণকে খাওয়াল পঞ্চু।

ঐ যাঃ। নৈকোখানা বেঁধে থুইছি ত? এক্‌খুনি জোয়ার লাগবে আবার।

নৌকো বাঁধা আছে চরণদা, তুমি শুয়ে থাক।

পঞ্চুর একখানা হাত ধরে নিজের তুহাতের মধ্যে চেপে ধরল চরণ।

বড্ড রক্ত বেরুচ্ছে চরণদা, তুমি শুয়ে থাক, আমি ডাক্তার-খানা থেকে একটা ওষুধ নিয়ে আসি।

আরে তুর্‌ পাগলা। দ্যাখ দিনি ঐ বনডায় খুঁজে, আপাঙ্গের শেকড় তুলে ছেঁচে একটু রস করে দে, এক্‌খুনি বন্ধ হয়ে যাবে।

পঞ্চু চুপ করে বসে রইল। চরণ বলতে লাগল, আর ডাক্তারের নাম করিস্‌নে পঞ্চা। তোরে ট্যাকা দেব কি ভাই; সাড়ে তিনশো ট্যাকা গুনে দেলাম রাম ডাক্তারকে। তু তুডো ছেলের নিমোনিয়ায়। এক এক শিশে ওষুধ ঝাড়ে, দাম নেয় তু ট্যাকা, তিন ট্যাকা। সত্যি বলছি, এখন আর দিন চলছে না।

তোমায় আর ট্যাকা দিতে হবে না চরণদা, শুধু তুমি আমায় মাপ কর। বাপের বয়সী নোক তুমি, তোমার গায় আমি হাত দেলাম। বলতে বলতেই চরণের তুখানা পা জড়িয়ে ধরল পঞ্চু।

তাতে কি হয়েছে ভাই? কথায় বলে, রাগ না চণ্ডাল। এত সহজে এত বড় অপরাধের ক্ষমা পেয়ে পঞ্চুর মনের সমস্ত বাঁধন আলগা হয়ে গেল। মনে হল চরণের মত আপনার লোক তার আর কেউ নেই।

পঞ্চু বলতে লাগল, সত্যিই মাথাটার ঠিক ছেল না চরণদা। আজ তু' দিন ভাত জোটেনি। স্ত্রীপুরুষে ছাইভস্ম দিয়ে পেট ভরাচ্ছি।

বলিস্ কি রে? তুই শিগ্‌গীর চলে যা। বাজারে গিয়ে মেঘা নিকিরীকে বল আমার নাম করে, মাছের দামটা আমি তোরে দিতে বলিছি। যা আর দেরী করিস্ নে।

মারও খেলে আবার ট্যাকাও দেচ্ছ? আমি ও-ট্যাকা নিতে পারব না চরণদা। বন থেকে পাতা এনে রস করে চরণের দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে দিল পঞ্চু। আঘাতের বেদনা ভুলে উঠে বসল চরণ।

হক্কের ট্যাকা ফাঁকি দিতে গিইছি আমি, আমি মার খাব না, ত কেডা খাবে? ও ট্যাকা ত দেবই; আরও কিছু দেব, তুই পরে আসিস। পঞ্চু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তিন চার জন লোকসমেত মজুমদারের চাকর হারু ঘাটের ধারে এসে হাজির হল।

বড় চিংড়ি টিংড়ি আছে না কি হে? বলেই চোখ কপালে তুলল হারু। এ কি! কি হয়েছে চরণ, মুখে রক্ত কেন?

আঘাত খাওয়া মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল চরণ, নৈকোর ওপর বড্ডা পড়ে গিছি হারাধন। কপালের গেরো আর কি! যা পঞ্চা। তোরে যা বললাম তাই কর।

পঞ্চু চলে যেতে হারু চরণের কাছে সরে এসে বলল, কি রকম করে পড়লে বলত? উঃ, এ যে রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে! দাঁত ভেঙ্গেছে বুঝি? চরণের মাথাটা আবার কেমন ঘুরে উঠল।

ওরে বাপ্ রে! এ যে মহামারী ব্যাপার, কতক্ষণ লেগেছে? একে এই বুড়ো বয়েস, তার ওপর যে রক্ত বেরুচ্ছে!

চরণের মনের ক্ষমাধর্ম্ম এইবার রক্তের সঙ্গে জল হয়ে বেরুতে লাগল। হারু জমিদার বাড়ীর চাকর, আঘাতের তারতম্য বেশ বোঝে, বিশেষ করে পঞ্চুকেও বিলক্ষণ চেনে। ধূর্ত্তামিভরা চোখদুটো চরণের চোখের ওপর রাখল হারু।

এ ত পড়ে যাওয়া নয় চরণ, কাকে তুমি কি বোঝাচ্ছ? থাক্‌গে। ওহে রতন, একবার রাজু ডাক্তারের কাছে যাও ত।

চরণের আবার সব গোলমাল হয়ে গেল।

রাজু ডাক্তার কেন হারাধন, রাম ডাক্তারকে খবর দ্যাও।

না, রাম ডাক্তারকে ডাকা এ গাঁয়ে বারণ হয়ে গিয়েছে। বাবুর হুকুম।

রাজুডাক্তারের ওপর মোটেই বিশ্বাস ছিলনা চরণের। অতএব হারুর প্রস্তাবে সে সম্মতি দিতে পারল না।

আরে না। ডাক্তার দরকার নেই। পাতানতা ঘষে দিলেই নরম পড়ে যাবে।

বেশ। তা হলে বাবুর কাছে চল। আইডিন টাইডিন সব আছে। হাঁটতে পারবে ত?

না না। কিছু হয়নি, আমি কোথাও যাব না। অগত্যা হারুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নৌকার কাছে চলে গেল চরণ।

মেঘলাল নিকিরীর কাছ থেকে নগদ পাঁচটা টাকা পেয়ে ভাল করে খাওয়া দাওয়া সেরে উঠে দাঁড়াতেই জমিদারের দরোয়ান এসে জানাল পঞ্চুকে, বাবু তাকে ডাকছেন, বহুৎ জরুরী কাজ। দরোয়ানকে যেতে বলে তামাক নিয়ে বসল পঞ্চু।

গেলে না? বউ জিজ্ঞাসা করল।

এই যাই, বলেই জোর করে হুঁকোয় টান দিতে লাগল পঞ্চু। পঞ্চুর বউ তখন খেতে বসেছিল।

শুনছিস্? পঞ্চু ডাকল।

কি বলছ?

এমন অনোক্ত সময় বাবু আমায় ডাকছে কেন বল দিনি?

কি দরকার পড়ছে, যাও না। গেলেই শুনতে পাবা।

কি জানি কি দরকার। চরণশালা গোল বাধাল না কি?

চরণ আবার কি গোল বাধাবে?

এইবার সকালের ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করল পঞ্চু। শুনে বউয়ের মুখে আর ভাত উঠতে চাইল না।

মনে মনে তোলাপাড়া করতে করতে মজুমদারের বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়াল পঞ্চু। মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করে পাৎলা একখানা মুগার চাদর গায়ে দিয়ে বৈঠকখানায় বসেছিল মজুমদার।

কে রে? পঞ্চা? আয়। পঞ্চু ঘরে আসতেই মজুমদার তামাক

সাজতে বলল। কলকে ধরিয়ে দু চারটা টান দিয়ে গড়গড়ায় বসিয়ে দিতেই একগাল হেসে বলল ভূপতি, কি রে? ধরতে-টরতে পারলি?

ওর আর ধরাধরি কি বাবু, ওত ধরাই।

তা হলে দাওয়াই দে। কি বলিস্?

দাওয়াই এখন দিয়ে কি হবে? আগে বাধুক। বলেই নিজের পেটের বর্দ্ধিত পরিধিটা হাত দিয়ে বর্ণনা করল পঞ্চু।

দূর বেটা। ও হল ডাক্তার লোক। কখন মূলে হাবাৎ করে দেবে। জানতেও পারবি নে।

ঘাড় নেড়ে হেসে বলল পঞ্চু, তা হলে আর নিজের বউ মরতে বসত না। ও সব হচ্ছে ভগবানের হাত। ধম্মের কল কেউ ঠেকাতে পারে বাবু?

আজ কিন্তু রসাল প্রসঙ্গটা নিয়ে বেশীদূর এগুল না মজুমদার। পঞ্চুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, শক্ত মাটিতে দাঁত বসাতে ভয় করে, না রে পঞ্চা?

জিজ্ঞাসাটা ঠিক বুঝল না পঞ্চু।

মজুমদার আবার বলল, তোদের এই স্বভাবটা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! যে বেটা দোষী, তোদের বে-ইজ্জৎ করছে, তাকে কিছু বলবি নে। অথচ গরীব লোক চরণ, বুড়ো মানুষ, তাকে এমন মার মারলি, বেচারী যেতে বসেছে।

আপনাকে কে বলল বাবু?

কে বলল? এ তল্লাটের লোক—তা বড়লোকই হক আর গরীবই হক, কে কি দিয়ে ভাত খায়, সে খবরও আমার কাছে আসে। বলেই আলবোলার নলটা টেনে নিয়ে ইজিচেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিল মজুমদার।

বাল্যসখার সর্ব্বজ্ঞতার বহর দেখে আর মাথা তুলতে সাহস করল না পঞ্চু।

মজুমদার বলল, এইত গেল চরণ। রাজুকে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ্ করিয়ে, ইনজেক্শন দিইয়ে তবে ছাড়লাম। যত রাজ্যের আঘাটার মড়া এইখানে জুটবে আর আমার ঘাড় ভাঙ্গবে। তবে কাজটা বড় খারাপ করেছিস পঞ্চা। পুলিসে গেলে পাক্কা একটি বছর। বলে পঞ্চুর দিকে চেয়ে দেখল মজুমদার; মুখখানা তার কালি হয়ে উঠেছে।

মজুমদার আবার বলল, মতলবটা তাই, সাক্ষী সাবুদও যোগাড় করেছে। গোটাকতক ধমক দিলাম, তবে থামে।

টেনে টেনে বলল পঞ্চু, কিন্তু চরণ যে বলল, এ নিয়ে সে কিছু মনে করবে না। আমাকে ক্ষমা করেছে।

সে বলল, আর তুই বিশ্বাস করলি! অতবড় মারটা কেউ কখন ভোলে? তা ছাড়া ডাক্তারের সাক্ষী রয়েছে, এতবড় সুযোগ কেউ ছাড়তে চায়? তবে তোর খুব বরাত জোর, পড়বি ত পড় হারুর চোখে, তাই এখেনে এসে পড়ল। তা নইলে ও কেস্ পুলিসে গেলে আমার বাবারও সাধ্যি ছিল না আটকাবার।

ভয়ে, অনুশোচনায় একেবারে কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল পঞ্চু।

আমার দোষ ছিল না। অনেকগুনো ট্যাকা ভোগা দিয়ে, জাত তুলে গাল দিল ·········।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল মজুমদার, সে আর তোকে বলতে হবে না, বেটা মিষ্টিমুখো শয়তান। তবে তোর ভয় নেই, আমি সব মিটিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চু কোন কথা বলতে পারল না। শুধু চোখমুখে কৃতজ্ঞতার

ছবি ফুটে উঠল তার। মজুমদার আবার বলল, তুই চুপ করে থাক্ না, দেখ্ তোর টাকাও আদায় করে দোব।

ট্যাকা আর দরকার নেই বাবু। খামোকা ডাক্তারের খরচ দেবে আবার আমার ট্যাকাও দেবে। সেটা কিন্তু অন্যায় হবে।

সোজা হয়ে বসে চেঁচিয়ে বলল মজুমদার, অন্যায়? খাজনা লাগে না, ট্যাক্স লাগে না, জলের ব্যবসা; মুঠো মুঠো টাকা কামাচ্ছে, পাওনা টাকা দেবে না! সেদিন মল্‌চেগড়ে গিছলাম, দেখে আর চিনতে পারি নে। জেলে বেটাদের ছিটেবেড়ার চালা ছিল, :পাড়াকে পাড়া পাকা বাড়ী উঠেছে। ভদ্দরলোক উচ্ছন্ন যাচ্ছে, বাড় বাড়ছে ছোটলোকের। তোর বউয়ের পন্নে ত্যানা জোটে না, ওদের মাগীদের গায় গহনা ধরে না। কি যে বলিস তুই?

যুক্তির তোড়ে পঞ্চুর আপত্তি কোথায় ভেসে গেল।

বলা বাহুল্য কথাগুলো আগাগোড়া মিথ্যা। হারুর মুখে ঘটনাটা শুনে ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়েছিল মজুমদার।

হাই তুলে, আড়ামোড়া ভেঙ্গে বলল মজুমদার, তোর মুখ থেকে শুনব বলেই তোকে ডেকেছি। তা যাক্‌গে। বেশ করেছিস। তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, চরের ব্যাপার ত মিটে গেল। দেখলাম, খুন-খারাপি, থানা-পুলিস, লেঠেলের মাইনে এ সমস্ত মিলে ও-ক'ছটাক জমিতে মজুরি পোষাবে না।

পঞ্চু চুপ করে রইল।

চোখ তুটোয় আশার ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে আবার বলতে লাগল মজুমদার, গাঙ্গ মজতে বসেছে। পোর্ট কমিশনারের সার্ভেয়ার এসেছিল। বলে গেছে, সোনাপুরের মজা খালের পাড় ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে। ওদিকের মুখ খুলে গেলেই, গঙ্গা ঐ দিক দিয়েই

বইবে। তখন এই গঙ্গাটায় তামাম চড়া পড়ে যাবে। সেই সময় দেখা যাবে।

ঘাড় নেড়ে সায় জানাল পঞ্চু। চৌকিতে চাপড় মেরে বলল মজুমদার, সেই সময় দেখব তোর লাঠির জোর। তুই, ঘোষপাড়ার নবা আর রতনপুরের রবাই থাকলে, মোড়ল বেটাদের গুষ্টি এলেও ঠেকাতে পারবে না। চেয়ে দেখল মজুমদার, পঞ্চুর মুখ পৌরুষে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

কেমন, পারবি ত? দেখ্ ভাই, ছোটবেলায় তুই ছিলি সর্দ্দার খেলুড়ে। তার ওপর দেখ, তোর বউয়ের অসুখে টাকা দিইছি, বাপমায়ের কাজে দুশো টাকা দিইছি। এই যে চরণার দাঁত ভাঙ্গলি ওটাও সামলে দোব। তোর কাছ থেকে একটা পয়সাও চাইনে। তখন কিন্তু দেখিস, নইলে তোর নরকেও জায়গা হবে না, বলে দিচ্ছি।

চট্ করে মজুমদারের একখানা পায়ে হাত দিয়ে বলল পঞ্চু, এই পা ছুঁয়ে বলছি বাবু, লাঠি যদি কখনও ধরি, আপনার হয়েই ধরব। বলতে বলতে কৃতজ্ঞতায় ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

দেখতে দেখতে শীতের তীব্রতা কমে গেল। হেমন্তের ফসল চাষীর খামার থেকে গোলদারের আড়তে চালান যেতে না যেতেই রবিশস্যের ঝাড়াই মাড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে। তিন চার মাস বৃষ্টি নেই। ম্যালেরিয়াজরা হাড়পাঁজরায় দখিণা বাতাসের সুখকর স্পর্শ এসে পৌঁছুতেই জমিদার আর ইজারাদারের মরসুমও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কৌতুকপুরের বাজারে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বারোয়ারী মেলার অনুষ্ঠান জমতে আরম্ভ করেছে। ভূপতি মজুমদারের কাছারি বাড়ীতে দিনরাত লোকের আনাগোনা। বিষ্টু ঘোষ কৌতুকপুরের মহাজন। তিনদিনের মেলা, একদিন গঙ্গাস্নানের যোগ, বাকী দু' পাঁচদিন ভাঙ্গা হাট। নামকরা দলের যাত্রা হলে ভালই চলবে এ-কদিন। ইচ্ছাটা এবছর বাজারটা নিজেই ডেকে নেয়। কিন্তু জমিদার নাছোড়বান্দা। দুটি হাজার টাকার এক পয়সা কমে ডাক ছাড়া হবে না।

শীত গেলেও শীতের আমেজ তখনও যায় নি। মোটা একখানা ছিটের চাদর গায় জড়িয়ে সন্ধ্যার পর ভূপতি মজুমদারের বৈঠক-খানায় এসে দাঁড়াল বিষ্টু ঘোষ। তাকে দেখেই ফরাসের ওপর থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল হরি আদক।

যাও হে আদক। কাল অব্‌সরমত এস, কথা কইব। ভূপতি মজুমদার বলল।

যে আজ্ঞে। ঘাড় হেঁট করে নমস্কার জানিয়ে বিষ্টুর দিকে একবার চেয়ে চলে গেল হরি আদক।

বিষ্টু গুটি গুটি এসে ফরাসের এককোণে বসে পড়ল।

বিষ্টুকে দেখে একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসল মজুমদার। আদক দেখছি ডাক না নিয়ে ছাড়বে না হে। সন্ধ্যের আগে এসে বসেছিল, এই গেল।

বিনয়ে গলে পড়ে টেনে টেনে বলল বিষ্টু, আদকত আজ তিন সন ডাকছে হুজুর। ও হল বিদেশী লোক, আর আমরা হচ্ছি এস্তোনাগাদ সাতপুরুষ হুজুরের প্রজা।

আলবৎ। এ কথা জজে মানবে। তাইত বেটাকে আমি পাকা কথা দিতে পারছি নে। কিন্তু আসল জিনিসের মারপ্যাঁচ রয়েছে যে। বলেই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তর্জনীর নীচেয় একটা টোকা দিয়ে দেখাল মজুমদার।

কত হাঁকছে? দম আটকে বলে ফেলল বিষ্টু ঘোষ।

তা অনেক। দু' হাজারের ওপর, আরও উঠতে পারে। সেই রকমই যেন আঁচটা।

ওর কথা বাদ ছান বাবু। মেয়েমানুষের পড়ে পাওয়া টাকা। বলতে বলতে থেমে গেল বিষ্টু।

কিন্তু মজুমদার রাগ করল না। অধিকন্তু এক গাল হেসে বলল, সে ত ওর হিক্‌মৎ গো। ঘরের পয়সা ঢেলে লোকে মেয়েমানুষ পোষে, আর ও টাকা বাগাচ্ছে তার ঘাড় ভেঙ্গে। তা তুমি কত পারবে ঝেড়ে কেসে ফেল দিকি।

সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে একেবারে কাছে এসে হাত দুটো কচলে বলল বিষ্টু, আজ্ঞে আমাদের হচ্ছে পুঁটি মাছের প্রাণ। মানে শ' বার টাকা মরে-পিটে যোগাড় করিছি। যদি হুজুরের দয়া হয়…।

মজুমদারের মুখের অবস্থা দেখে কথাটা আর শেষ করতে পারল না বিষ্টু।

এ যে কলমি শাকের দর আরম্ভ করলে বিষ্টু। এ বারোয়ারীতে আমার কত খরচা জান? দু' হাজারে বিলি করলেও, ঘর থেকে আমার পাঁচশর ওপর বেরিয়ে যাবে, সে খবর রাখ?

আজ্ঞে আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা। রাজার খেয়েইত প্রজারা মানুষ হুজুর। বচ্ছরান্তে দেশের একটা আমোদ। ছেলেবেলায় দেখিছি, কর্ত্তাবাবুর আমলে, সাতদিন সাতরাত আসর ফাঁক যেত না। যাত্রা ভাঙ্গল, ত খেমটা আরম্ভ হল; তারপরই ঢপ্, পাঁচালী, তর্জ্জা। সে সব কি দিনই গেছে! খাওয়া শোয়া ভুলে যেত লোক।

হবে না কেন? তখন কত রকমের আদায় ছিল। জমিদারীই ত উঠে যাবে শুনছি। এখন আর কি আছে? পাঁচ পয়সা আদায় করতে পাঁচ টাকা মামলা খরচ করতে হয়। লোক সব এখন হারামজাদা, পাজীর পা ঝাড়া। এদের জন্যে ঘর থেকে খরচ করে আমার কি লাভ শুনি?

অনেক রকমের কষাকষির পর শেষ পর্য্যন্ত আঠার শ' টাকায় রফা হল বিষ্টু ঘোষের সঙ্গে।

কাল হাজার এক টাকা দিয়ে যাব বাবু। বাকীটা মেলা ভাঙ্গলে দাখিল করব।

আরে তাই হবে। তুমি কি আমার আট শ' টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছ! তবে তুমি ত নতুন। ফড় খেলা, কুপন খেলা, বালা খেলা, এর জন্যে পুলিসকে দিতে হয় দুশো টাকা করে। আর ঐ শালা ভাগাড়ে শকুন, ঐ স্যানিটারি হারামজাদাকে শ' খানেক টাকা। এগুলো তোমাকে দিতে হবে।

শুনেই মুখখানা ঝুলে গেল বিষ্টুর।

আজ্ঞে, এ সমস্ত ত হুজুরসরকার থেকেই বন্দোবস্ত হত।

হত, আর হবে না। যা কমিউনিষ্ট হারামজাদাদের উৎপাত। ওসব ঝুঁকি আর ঘাড়ে রাখব না। বলেই বিষ্টুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, ডেঁড়েমুষে আদায় করে নেবে। ডবল ডবল খাজনা ধরবে দোকানদার বেটাদের ঘাড়ে। বেটারা সোজা টাকাটা পেটে! জুয়াওয়ালাদের কাছ থেকে মোটা টাকা গুনে নেবে, তবে ছক পাততে দেবে।

তাত বুঝলাম। তবে বড় খরচা পড়ে যাবে, শেষ পর্য্যন্ত পোষালে হয়। বলে মাথা চুলকাতে লাগল বিষ্টু।

মানে? টাকায় টাকা লাভ হবে দেখে নিয়ো তুমি। আর একটা কথা, ঐ ডাক্তার শালার নামে কিন্তু মোটা টাকা ধরবে, বুঝলে?

আজ্ঞে উনি দেবেন কেন? বিষ্টু এবার হেসে ফেলল।

দেবে না মানে? সব চেয়ে বেশী লাভত ওরই। পোড়া তেলে ভাজা পাঁপর, আর বাসি খাবার খেয়ে অন্ততঃ দশখানা গাঁয়ে ত কলেরা লাগবেই, আর বেটা দু' হাতে টাকা লুটবে।

মনে হল, সন্তুষ্ট হয়েই চলে গেল বিষ্টু।

দশমহাবিদ্যার ষোড়শী বিদ্যামূর্ত্তির তিনদিনব্যাপী পূজা হয় মাঘীপূর্ণিমার দিন থেকে। দুশ' বছরের অনুষ্ঠান। ছেলে বুড়োর অস্থিমজ্জায় বোধনের সুর বেজে ওঠে আমের মুকুল আর বাতাবী-লেবু ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। গঙ্গাস্নানের মেলায় গরুর গাড়ীতে রাস্তাঘাট ভরে যায়। যাযাবরগোষ্ঠীর মত চাল

ডাল হাঁড়ী কলসী নিয়ে সংসার পেতে বসে যাত্রীর দল, ধূলোভরা রাস্তায়, নয়ত ফাঁকা জায়গার ওপর।

বাজারের গঙ্গার ঘাটেই ভিড় বেশী। পাড় থেকে জলের ধার পর্য্যন্ত দড়ির সাহায্যে স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্র স্নানের ব্যবস্থা। গ্রাম্য ইউ-নিয়নের চৌকিদার মারফৎ কড়া পাহারার বন্দোবস্ত। ব্যবধানের শেষ সীমায়, একেবারে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে হেলা, লক্ষ্যটা স্ত্রীলোকের ঘাটের দিকেই বেশী। চিনি, সন্দেশ, ডাব, ফুলবেলপাতা নিয়ে বিক্রি করছে অনেকেই, স্নানার্থীদের ডেকে ডেকে অল্পমূল্যে পুণ্যসঞ্চয়ের তাগাদা দিচ্ছে মাঝে মাঝে, চিনি সন্দেশ নিয়ে যান মা, চার পয়সা করে। ডাব নিয়ে যান, সস্তা। নগদ এক টাকা সওয়া পাঁচ আনা বিষ্টু ঘোষকে ঘাট খাজনা যুগিয়ে ক্ষেত্তর ময়রার দোকান থেকে ধারে চিনি আর ঢেলা সন্দেশ কিনে পঞ্চুও আজ বসে গেছে ঘাটে সকাল থেকেই। যোগটা এবার বহুক্ষণস্থায়ী। বউ ঘুম থেকে ওঠবার আগেই বিছানা থেকে সে উঠে এসেছে, কোন কিছু না বলেই। গঙ্গাপূজার বলির পাঁঠা ধরতেই তার ঘাটে আসা, কিন্তু খেয়ালটা রূপান্তরিত হয়ে গেছে পাঁচ জনের দেখাদেখি।

বেলা দশটা নাগাদ প্রশস্ত স্নানের ঘাটটা ভিড়ে, কলরবে, চিৎকারে ভরে উঠল। চিনি সন্দেশ বেচতে বেচতে পঞ্চুর চোখদুটো মেয়েদের স্নানের ঘাটের দিকে মাঝে মাঝে ঘোরাফিরা করতে লাগল। চিনি সন্দেশ বেচার মূলে যে সূক্ষ্ম প্রেরণাটা তাকে হঠাৎ ঘাটের ধারে এনে বসিয়ে দিয়েছে এবং সেটা যে সাংসারিক আয় উপার্জ্জনের মামুলি সমস্যার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, ভাল করেই সেটা অনুভব করল পঞ্চু যখন চোখদুটো তার মেয়েদের স্নানের ঘাট খোঁজাখুঁজি করে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। উদ্দামযৌবনশ্রীর বহু

বিচিত্র রূপ তার চোখে পড়ল। জলের স্রোতের মত এ যেন অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। রূপলোলুপ মনের ওপর অসংখ্য বুদ্‌বুদের মত উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

চিনি সন্দেশ নিয়ে যান মা, চিনি সন্দেশ নিয়ে যান।

হঠাৎ ভিড়ের দিকে চাইতেই একজোড়া নারী চোখের বিদ্যুৎ পঞ্চুকে একেবারে অবশ করে ফেলল। একঘাট মেয়ে পুরুষের মধ্যে আজন্ম পরিচয়ের খোলস ফেলে দিয়ে একেবারে নতুন হয়ে উঠেছে সাবি। নিঃসঙ্কোচ চালচলনের সহজ গতিভঙ্গির ওপর লজ্জা সঙ্কোচের জড়তা এসে পড়ে তার লাবণ্য অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে। পঞ্চুর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভিড়ের ভেতর মিশিয়ে যাবার চেষ্টা করল সাবি। মহাভারতের একটা গল্প মনে পড়ল পঞ্চুর। হোমরাচোমরা কোন মুনির বরে কোন এক জেলের মেয়ের সারা গা পদ্মগন্ধে ভরে উঠেছিল। ঠিক সেইরকম যেন হয়েছে সাবি। অনেকদিন পরে আজ তাকে দেখল পঞ্চু। হাঁ ; এতদিনে ঠিক সুন্দর হয়েছে সে। সেমিজ কাপড় সমেত গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়েই ঘাট থেকে চলে গেল সাবি। পঞ্চুর কানের কাছেই সুর করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক। বহুদিনের বিয়োগব্যথা শুভদিনের আহ্বানে শতধারে ফেটে পড়ছিল বিস্মৃত দুঃখের ভারে। পঞ্চুর মনটাও ঠিক অনুরূপ দুঃখেই গুমরে উঠল। হাঁক, ডাক, উল্লাস, মাতামাতির মধ্যে কান্নার সুরটা সানাইয়ের আলাপের সঙ্গে আর একটা একঘেয়ে সুরের মত বেজেই চলছিল, এ যেন চিরদিন বাজছে, বাজবেও চিরদিন।

বিক্রি বন্ধ করে জলে নেমে চোখমুখ ভাল করে ধুয়ে ফেলল

পঞ্চু। তারপর একটা বিড়ি খেয়ে, হাত ধুয়ে ফেলে আবার চিনি সন্দেশ বেচতে বসল।

বেলা বারটা নাগাদ খেয়াল হল পঞ্চুর কত টাকা বিক্রি হয়েছে, একবার মিলিয়ে দেখা দরকার। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি, পেটের মধ্যে জ্বালা করছে। গুনে-গেঁথে দেখল চার টাকার ওপর বিক্রি হয়েছে। এখনও যা মাল মজুদ বিকেল পর্য্যন্ত চলবে। ময়রার পাওনা মিটিয়ে, দু টাকার ওপর লাভ দাঁড়িয়েছে এর মধ্যেই।

ভাল করে মুখ হাত পা ধুয়ে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে দিল পঞ্চু। চোখ বুজে দুহাত জোড় করে পাঁজীতে দেখা মকরবাহিনীর মূর্ত্তি ধ্যান করে, দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর পাত্র নিয়ে ময়রার দোকানের দিকে চলে গেল। বাজারের পেছনে সারি সারি দোকান বসেছে—খাবারের, মনিহারির, কাটা কাপড়ের, পানের, সস্তা জুতোর। প্রকাণ্ড একটা টিনের বাক্সের গায় চার পাঁচটা চোঙ্গা লাগিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা দেখাচ্ছে একজন,—দো পয়সা, দো পয়সা। কাশী বিন্দাবন দেখ, আউর বহুৎ তামাসা দেখ। হঠাৎ ভিড়ের ভেতর নজর পড়ল পঞ্চুর, খাবারের দোকানের এক কোণে ছোট্ট একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আছে হেলার বউ আর তার বউ। দুজনের হাতে বড় বড় খাবারের ঠোঙ্গা ; তেলে ভাজা কচুরি, পাঁপরভাজা চিবোচ্ছে দু' জনেই। দোকানী এসে দু জনের ঠোঙ্গায় বড় বড় দুটো রসগোল্লা দিয়ে গেল। পঞ্চুর বউয়ের হাতে এক গোছা করে কাচের চুড়ি। বেঞ্চির উপর দুজনের দু প্রস্থ জিনিস সাজান, টুকিটাকি অনেক রকমের—গন্ধ তেল, সস্তা সাবান, আলতা, মাথার কাঁটা, রঙীন ফিতে, আরও কত কি! পঞ্চু একটু

আড়ালে সরে গেল। এত বড় মেলাটায় একটা পয়সাও হাতে দিতে পারে নি ; হেলার বউয়ের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে একটু কেনা-কাটা করতে এসেছে ; এ ক্ষেত্রে তার সরে যাওয়াই ভাল। চলে যাবে, এমন সময় দেখল দুহাত দিয়ে মেয়েপুরুষের ভিড় সরাতে সরাতে লাঠি বগলে খাবারের দোকানের দিকে আসছে হেলা। পাশে একটা মাঝারি গোছের বেলগাছ দেখে তার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল পঞ্চু। দেখল খুঁজে খুঁজে ঠিক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল হেলা এবং আরও দেখল, যা কোনদিন দেখে নি, অম্লানবদনে তার বউ হেলার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে ; এমন কি হেলার বউয়ের চেয়ে সেই কথাবার্ত্তা কইছে বেশী। দূরে দাঁড়িয়ে ভোজবাজি দেখার মত চেয়ে রইল পঞ্চু। আরও কিছুক্ষণ আলাপ করে পকেট থেকে হয়ত টাকা পয়সাই হবে বের করে হেলার বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে যে পথে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই আবার চলে গেল হেলা।

কি করতে এসেছিল সব ভুলে গেল পঞ্চু। ভুলে গেল মেলার সমারোহ, মকরবাহিনীর বরাভয়করা মূর্ত্তি। চিনি সন্দেশের পাত্র নামিয়ে রাখল মাটিতে। ঠিক সেই সময় অভয় মোড়ল তাকে ডাকল।

কি রে পঞ্চা, এখেনে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস্ ?

পঞ্চু বিরক্ত হল, কিন্তু উত্তর দিতে পারল না। খাবারে ও অন্যান্য জিনিসের প্রকাণ্ড একটা পোঁটলা অভয় মোড়লের হাতে।

অভয় মোড়ল বলল, বলিস্ কেন রে ভাই। 'মেলায় পয়সা দিয়ে ঢেলা কেনা। কি করা যায় বল, মাগীনদের সখ। একমাস আগে থাকতে পোঁ ধরে আছে।

তেনারা আসেন নি ? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

পাগল হলি পঞ্চা? যত মোদো মাতালের হুল্লোড়ে গেরস্তর ঝি বউ এলে জাত থাকে? দেখছিস্ নে কাণ্ড!

কি দেখেছে হাড়ে হাড়ে জানে পঞ্চু।

অভয় মোড়ল বলল, মুখটা শুকিয়ে গেছে যে, কিছু খাস্ নি বুঝি? পয়সা কড়ি আছে ত? বলেই নিজের গায়ের ঝোলা কোটটার পকেটে হাত দিল।

আছে মোড়ল। এইবার খাব।

না থাকে বল্, আমি দিচ্ছি।

পঞ্চুর মনের মরুভূমির প্রদাহ বাষ্পের মত ঠেলে এসে গলাটা প্রায় রুদ্ধ করে আনল।

না মোড়ল। তোমায় দিতে হবে না। বলে রেজকিতে পয়সাতে তহবিলটা অভয় মোড়লকে দেখিয়ে দিল পঞ্চু।

অভয় মোড়ল চলে গেল, কিন্তু পঞ্চু আর এগুতে পারল না। হু হু করে অনেক রকমের এলোমেলো চিন্তা উত্তপ্ত মস্তিষ্কে আনাগোনা করতে লাগল। কিছুদিন আগে ভূপতি মজুমদারের কাছারি ঘরে বসে তারই মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছিল অভয় মোড়ল, মোড়লরা তাদের বউ ঝির ইজ্জৎ রক্ষে করতে জানে। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা বলে নি সেদিন। মজবুত কাঠামো তাদের জাতের; মাটির কাজ করে, ভূতের মত খাটে, ঘরে বাইরে কাউকে ভয় করে না। আর নিজেরা? জলের আগে শ্যাওলার মত ভেসেই চলেছে, জমি নেই, জায়গা নেই, কিসের জোরে দাঁড়াবে তারা?

ক্ষেত্তর ময়রার দোকানে দুটো টাকা জমা দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এল পঞ্চু। কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত দোকানে গিয়ে বউকে আর দেখতে পেল না।

দোকানীকে ডেকে কিছু খাবার চেয়ে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল সে। বছর দশ বার বয়সের একটি ছেলে, চোখে মুখে কথা কয়, খাবার দিতে আসতেই পঞ্চু তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় ছিল না ছেলেটির। তবুও ভাসা ভাসা উত্তর দিতে লাগল।

পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল, একটু আগে এখানে তুমিইত খাবার দিচ্ছিলে খোকা?

হাঁ, কেন বল ত?

মানে, দুজন মেয়েলোক, মানে এই বউ আর কি—একজন কাল আর একজন ফর্সা, এখানে খাবার খাচ্ছিল না? উই বেঞ্চিটার ওপর বসেছিল?

পঞ্চুর মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল ছেলেটি।

হাঁ, খাচ্ছিল। কেন বল ত?

ছেলেটির হাসি আর কথা বলবার ভঙ্গী দেখে বুকের ভেতরটা চমকে উঠল পঞ্চুর।

না, এমনি জিজ্ঞেস্ করছিলাম।

ও। বলে মুখ টিপে আর একবার হেসে কার্য্যান্তরে চলে গেল ছেলেটি।

দু' টাকার খাবার খেয়েও খিদে মিটল না পঞ্চুর। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেই ঘাটে গিয়ে বসল।

বিকেলের দিকে বেচাকেনা শেষ করে বাড়ী আসতে হয়, তাই ফিরে এল পঞ্চু। মনে হচ্ছিল এ আসা-যাওয়ায় আর বিশেষ কোন আনন্দ নেই। বাড়ীর কাছাকাছি এসেছে, বাইরে থেকে হাসি-ঠাট্টার উচ্ছ্বাস তার কানে এল। কোনরকম সাড়াশব্দ না দিয়ে

বাড়ীতে ঢুকে ঘরে চলে যাবে, অনেক দিনের বিস্মৃত কণ্ঠের সরব আহ্বানে যেন ধাতে ফিরে এল পঞ্চু।

কি গো! ডুমুরের ফুল হয়েছ না কি? বাড়ী বয়ে এসেও চুলের টিকি গ্যাখবার যো নেই। চেয়ে দেখল পঞ্চু,—তার বড় শালী; ঠিক তার পাশেই একখানা তাঁতের রঙীন সাড়ী পরা তার বউ।

তখনও একটু বেলা ছিল। শীতের আহ্লাদ-মাখান রোদের রক্তিম আভা জড়িয়ে ছিল বউয়ের পরনের সাড়িখানার লাল রংয়ের সঙ্গে। কিন্তু যে জিজ্ঞাসাটা পঞ্চুর মনের মধ্যে সিঁধ কাটছিল আজ দুপুর থেকেই, নতুন কাপড়খানা যেন তার সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন জুড়ে দিল।

কে, দিদি? কখন আসা হল? ভালত সব?

এইচি অনেকক্ষণ। তোমার দাদা এতক্ষণ হাপিত্যেস করে বসে থেকে এই বেরুল। কম্‌নে যাওয়া হয়েল?

এই গিছলাম একটু কাজে। নে, এই ট্যাকা কডা ধর্। বলে বউয়ের হাতে আনি, দুআনি, সিকিতে প্রায় তিন চার টাকা তুলে দিল পঞ্চু। বিনা বাক্যব্যয়ে পঞ্চুর মুখের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে দুহাত পেতে সিকি দুআনিগুলো ধরে নিল পঞ্চুর বউ।

পঞ্চু ঘরের ভেতর চলে গেল। কর্ত্তব্যের দিক দিয়ে অনেক কিছু ঘাড়ে এসে পড়লেও উপযাচক হয়ে সেসব কথা তোলবার মত উৎসাহ তার ছিল না; তবে মৌখিক একটু আদর অভ্যর্থনা জানানো, তার জন্যে এত ব্যস্ত হবারই বা কি আছে? এখন একমাত্র আশ্রয়স্থল চৌকির ওপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানাটা, কিন্তু সেটাও উপস্থিত বেদখল; দুটি ছেলে পাশাপাশি সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘর থেকে দাওয়ায় এসে দেখল পঞ্চু, মাঝারি গোছের একখানা

কাল পাথরের থালায় কচুরি, সিঙ্গাড়া মিষ্টি সাজিয়ে তুলেছে তার শালী। পঞ্চুকে দেখেই বলল, যাও ভাই, হাত পা ধুয়ে ন্যাও, সন্ধ্যে নেগে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে ন্যাও।

পঞ্চুর অতিথিবিমুখ মনটা একটু নরম হয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে একটু লজ্জাও হল।

আমার বাড়ী এসে তুমি আমারে খাওয়াবা দিদি, এটা কি ভাল হবে?

শুনেই খিল খিল করে হেসে উঠে বলল পঞ্চুর শালী, ওলো, ও সরি, ওলো, তুই হাতে করে দে লো। অপরজনা দিলে ওনার মিষ্টি নাগবে না।

সরি অর্থে সরস্বতী, পঞ্চুর স্ত্রী হাসতে হাসতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

খেতে বসে কোন মতেই জিজ্ঞাসা করতে পারল না পঞ্চু, কে খাবার কিনেছে, বা পয়সা এল কোথা থেকে। অধিকন্তু তরল ঠাট্টার মধ্যে পঞ্চুর সমস্ত কৌতূহল বেমালুম চাপা পড়েই রইল।

২

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে চুপি চুপি বাড়ী এসে শয্যা আশ্রয় করল রমাপতি। সাধারণতঃ এটা তার ফেরবার সময় নয়; তাছাড়া দোরগোড়া থেকে সাড়া না দিয়ে সে কখন বাড়ী ঢোকে না। রমাপতি শুয়ে শুয়ে দেখল, মঞ্জুর হাতে প্রদীপ দিয়ে সব ঘরে সন্ধ্যা দেখিয়ে গেল সাবি। গঙ্গাজলের ছিটে দিল তারই হাতে দিয়ে।

তুলসীতলায় প্রণাম জানাল মঞ্জুকে দিয়েই। প্রার্থনার ভাষা যুগিয়ে দিল ছায়ার মত পেছনে পেছনে থেকে।

বল্, ঠাকুর! আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, বাবাকে ভাল রাখ, দাদাকে ভাল রাখ, ছোট খোকাকে ভাল রাখ, মাকে ভাল করে দ্যাও। সাবির এই কল্যাণী ভাবটার সঙ্গে আজ হঠাৎ পরিচয় হল রমাপতির। শুয়ে শুয়ে নতুন এই অনুভূতিটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল: মঞ্জুর মারফং প্রার্থনা জানালেও, আসলে এ প্রার্থনা কার।

ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে তাদের গল্প শুনিয়ে অনেকক্ষণ তাদের কাছে শুয়ে থাকল সাবি। তারপর উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে রমাপতির ঘরে এসে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আপনি কখন এসে শুয়ে আছেন? এক ঝলক আলো চোখের ওপর পড়তেই তন্দ্রা ছুটে গেল রমাপতির। চেয়ে দেখল সাবি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রমাপতির কাছ থেকে জবাব না পেয়ে, হাতের আলো নামিয়ে রেখে তার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল সাবি। আপনার কি অসুখ করেছে ডাক্তারবাবু?

ইচ্ছা করে এবারও কোন উত্তর দিল না রমাপতি।

একি? কথা কইছেন না কেন? বলেই রমাপতির কপালের ওপর হাত দিল সাবি। আশ্বস্ত সুরের সঙ্গে হাসির রেখা টেনে বলল, আচ্ছা নোক বটে। সাবির কথা শেষ হতে না হতেই সাবির প্রসারিত হাতখানা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল রমাপতি।

মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও সাবিত্রী। জ্বর না হলেও শরীরটা আমার ভাল নেই। সাবির জন্য বসবার জায়গা রেখে খাটের প্রান্তভাগ থেকে একটু সরে গেল রমাপতি।

মাথার যন্তরণা হচ্ছে ? হাত ছাড়ুন, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেই রমাপতির মাথায় হাত বুলুতে লাগল সাবি।

রমাপতির মধ্যে আজ বাঁধন বলতে কিছুই ছিল না। তার বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে বদ্ধ হয়ে ফাঁদে পড়া পাখীর মত যখন ছটফট করে উঠল সাবি। নিজের মনগড়া স্বপ্নভূমি থেকে একধাক্কায় যেন বাহ্যজগতে ফিরে এল রমাপতি।

রমাপতির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একটা কথাও বলতে পারল না সাবি। সংস্কার আর বাস্তবের মধ্যে কোনটাকে যে শক্ত করে ধরবে ঠিক যেন তার মাথায় আসছিল না।

ঠিক সেই সঙ্কট মূহুর্ত্তে নিতান্ত অসহায়ের মত বলে বসল রমাপতি, বোধ হয় আমি অন্যায় করলাম সাবিত্রী, কাল হয়ত তুমি চলে যাবে।

কেন বলুন ত ? আপনার বুঝি ভয় হচ্ছে ?

ভয় ? ভয় আগে করতাম না সাবিত্রী, কিন্তু আজকাল করি।

ভদ্দরনোকের ঐ-এক দশা। পাপ তারা একটুও কম করে না, তবে সব নুকিয়ে নুকিয়ে। অত্যন্ত সহজভাবে কথাটা বলল সাবি। সমগ্র ভদ্রশ্রেণীর ওপর সংক্ষিপ্ত একটু মন্তব্য। তবুও রমাপতির মনে হল তার চরিত্রটা যেন তীক্ষ্ণফলা-ছুরি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে পরীক্ষা করছে সাবি।

জোর করে নিঃশ্বাস চেপে বলল রমাপতি, তা নয় সাবিত্রী। ভদ্দরলোকের তোমরা সবই পাপ দেখ। তারা ঘেন্না করলেও পাপ আবার ভালবাসলেও পাপ। কিন্তু লুকিয়ে ত আমি কিছু করিনি, যে ও-কথা আমাকে বলতে পার ?

আপনার কথা আমি বলিনি ডাক্তারবাবু। আমি জানি আমার জন্যে কতই না আপনি সহ্য করছেন। হয়ত দু'দিন পরে আপনার অন্ন উঠে যাবে এদেশ থেকে।

তবে তুমি পাপের কথা তুললে কেন? তুমি বিধবা সেইজন্যে বোধ হয়?

আমাদের জাতে বিধবারা বিয়ে করে, তার জন্যে নয়। বলে ঘাড় হেঁট করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে ঘরের মেঝের দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে লাগল সাবি।

তবে? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল।

এইবার সমস্ত সঙ্কোচ জোর করে ঠেলে দিয়ে বলল সাবি, এতগুনি ছেলেপিলের মা, বউ থাকতে এসব কথা আপনি কি করে বলছেন?

আমি ত তোমায় বিয়ে করছি না সাবিত্রী। আমি চাইছি তোমার ভালবাসা। বলতে বলতেই খাট থেকে নেমে দাঁড়াল রমাপতি। আবার বলল ঃ তুমি যে কথা বলছ, ওকথা নিয়ে আমি অনেক ভেবে দেখেছি।

বিয়ে করা বউ থাকতেও কেন তোমার ভালবাসা চাইছি, না? বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করলেও আমি ঠিক সাধু ছিলাম না। ভাবতাম ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে মিশে স্বভাব বেগড়াচ্ছে। দিনকতক আগেও তোমাকে ঠিক সেই নজরেই দেখেছি। তখনও বুঝিনি কিসের অভাবে ঘর থাকতে বাবুই পাখীর মতন মনটা আমার বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়।

বুঝিছি, বুঝেছি, আর বোলতে হবে না।

বুঝেছ ত বলছ, কি বুঝেছ বল দিকি?

একটু হেসে বলল সাবি, বুঝব আর কি ডাক্তারবাবু? আজ তিন বছরের ওপর বিধবা হইছি, মেয়েটা না খেয়ে বিনে চিকিচ্ছেয় মারা গেল। নিজের একসন্ধ্যে জুটেছে ত তিনসন্ধ্যে উপোস। কাপড়ের অভাবে কাঁথা জড়িয়ে কাটিইছি, কেউ উঁকি মেরেও দেখেনি। তবুও ভালবাসা জানাতে কসুর করেনি দশখানা গাঁয়ের নোক, কে জানে ভদ্দরনোক, কে জানে ছোটনোক। এত সয়েও পড়ে ছিলাম এ্যাদ্দিন। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে? যেদিকে যাব সেইদিকেই বদ্‌নাম। কিন্তু এখন দেখছি, আমার বরাতেরই দোষ। এ বরাত নিয়ে যেখানে যাব, সেখানেই আগুন জ্বলে উঠবে।

সাবির মুখ থেকে একসঙ্গে এতগুলো কথা কোনদিন শোনেনি রমাপতি। তাই তার মধ্যে নির্ভরযোগ্য বিশেষ কিছু না থাকলেও আত্মপ্রকাশের একটা সহজ ভঙ্গি পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

রমাপতি বলল, তুমি যে বড্ড ভালমানুষ সাবিত্রী। জান ত, যে যত ভাল হয়, দুঃখ্যু পেতে হয় তাকে তত বেশী। কিন্তু.........
বলে চুপ করল রমাপতি।

সাবি বলল, চুপ করলেন কেন? বলুন।

নিতান্ত শুনবে। তাহলে একটু বস, বলছি।

রমাপতির খাটের সঙ্গে লাগান একটা টুল ছিল। তার বর্ণনার আকর্ষণেই হয়ত রমাপতির কথামত তার ওপর বসল সাবি।

রমাপতি বলল, কিন্তু আমার দুঃখ্যু হল আলাদা। আজ আমার ছেলেমেয়ে হয়েছে। ওদের কষ্ট দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওরা যাতে সুখে থাকে, ভাল খেতে পরতে পায়, তার জন্যে আমি সব করতে পারি। তবুও আমি সবচেয়ে ঘেন্না করি কি জান? বছর বছর প্যাঁট্‌ প্যাঁট্‌ করে ছেলেমেয়ে হওয়া।

তার জন্য বুঝি যত দোষ ছেলের মায়ের? কেমন, এই কথাই ত বলবেন?

সাবির কথায় মুখখানার স্বাভাবিক রঙ হারিয়ে গেল রমাপতির। কিন্তু সাবি হাসি চাপতে মুখে আঁচল চাপা দিল।

তুমি হাসছ সাবিত্রী, কিন্তু সত্যিই তাই। ডাক্তার হয়েও এ বিড়ম্বনা রুখতে পারিনি আমি। তা হলেই বোঝ, কত মিল আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে।

ছিঃ ডাক্তারবাবু। আড়ালে রোগা মানুষের নিন্দে করবেন না!

দুঃখের কথা বলছি সাবিত্রী, নিন্দে সুখ্যাতি নয়। কলুর বলদের চোখে যতক্ষণ ঠুলি পরান থাকে, ততক্ষণ বুঝতেই পারে না সারাদিন সে একজায়গাতেই ঘুরছে। যতদিন তিনি এখানে ছিলেন, আমার ঠিক সেই অবস্থাই গেছে। সারাদিন বাইরে কাজ করেছি, বাড়ী এসে রেঁধে খাইয়েছি, ছেলেমেয়ে ধরেছি, বিছানা পেতেছি। মুখধোয়ার জলটি পর্য্যন্ত তুলে দিতে হয়েছে তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন। তাহলেই বোঝ কত সুখের পায়রা আমি।

এবার বেশ গম্ভীরভাবে বলল সাবি, বাঃ রে! রোগা মানুষ, বাড়ীতে অন্য নোক নেই, আপনি করবেন না ত কে করবে?

অনুরূপ গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই উত্তর দিল রমাপতি, তুমি কি আমাকে এত ছোট মনে কর সাবিত্রী, যে নিজের স্ত্রী, বিশেষ করে রোগা মানুষের সেবা করে সেই কথা তুলে খোঁটা দিচ্ছি? যখন তিনি ভাল ছিলেন, রোগ বালাই কিছু ছিল না, সেই সময়কার কথা বলছি। আমাদের ভালবাসার হয়ত মাপজোক ছিল না, তাই প্রাণভরে খাটিয়ে নিয়েও এর বেখাপ্পা দিকটা তার নজরেই পড়ত না।

মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল সাবি, আপনি করতেন কেন ?

করব না ? আমরা যে ভদ্দরলোক। তুমি যা বলছিলে। খালিপায়ে রাস্তায় বেরুলে সাতষট্টিবার আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়,—কি হল, কে মরেছে।

এইজন্যেই বুঝি খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে বউয়ের নিন্দে করতে বসেছেন ?

খোঁচাটুকু বিঁধল রমাপতিকে কিন্তু রহস্যালাপের ভেতর দিয়ে সাবির মনের যেটুকু ছোঁয়া পাচ্ছিল সেটুকু ত্যাগ করাও আর রমাপতির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রমাপতি বলল, নিন্দে নয়, দুঃখেই এসব কথা বেরোয়।

রমাপতির মুখের কথাটা লুফে নিয়েই বলল সাবি, এতে দুঃখ্যু করলে চলবে কেন ডাক্তারবাবু। নিজের বউ থাকতে অজাত কুজাতের মেয়ের ওপর নজর দেবেন......সঙ্গে সঙ্গে সাবির মুখখানা হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল রমাপতি, চুপ কর সাবিত্রী, তোমার মুখ দিয়ে ওকথা শুনলে বড় কষ্ট হয়। তাছাড়া অজাত কুজাতই আমার ভাল সাবিত্রী, ভদ্দরলোকে ঘেন্না ধরে গেছে। তবে তোমাকে কোনদিনই অজাত কুজাত বলে মনে করিনি।

এবার আর রমাপতিকে কোন বাধা দিল না সাবি।

তবুও সংশয় মেশানো কণ্ঠে বলল, কেন ওকথা বলছেন ডাক্তারবাবু ? দিনকতক পরে দেখবেন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে দুষী হব আমিই।

সবাই ভূপতিমজুমদার নয় সাবিত্রী, আর পঞ্চা দুলেও নয়। আমরা মানুষ বাঁচাই মারি, অত ভয়ের ধার ধারি নে।

আচ্ছা, আচ্ছা। বোঝা যাবে, কত বীর পুরুষ আপনি।

তারপর এদিক ওদিক ঘাড়টা দুলিয়ে আবার বলল সাবি সত্যিই আপনার ভয় করে না ডাক্তারবাবু ?

না। বলে খাটের বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল রমাপতি।

সাবির মনের আকাশে দুখানা মুখ পাশাপাশি ভেসে উঠল। একখানা পঞ্চুর, একখানা রমাপতির। কিন্তু দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভেতর দিয়ে একটা নতুন অনুভূতি খেলা করে বেড়াতে লাগল।

আকাশ আর মাটি ; মন ও দেহ ; কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও সংযুক্ত। এই নিয়েই চলে সৃষ্টি। আকাশে কোন আশ্রয় নেই। পঞ্চু আজ তার শত্রু। অথচ দেহের তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়ছে কামনা, বাসনা, রক্তমাংসের সমস্ত নিবেদন। সেই সঙ্গে মান, সম্মান, গৌরব অনেক কিছু। নির্ভীক পুরুষ রমাপতি।

শুয়ে পড়লেন কেন ? চলুন একেবারে খেয়ে নেবেন। সাবির দিকে চেয়ে আবার চোখ বুজল রমাপতি।

কি কথা কইছেন না যে ? রাগ হল বুঝি ? রমাপতির দেহের ওপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল সাবি।

হাঁ। রাগ হল বৈকি। বলতে বলতে সমস্ত শক্তি দিয়ে সাবিকে বুকের ওপর চেপে ধরল রমাপতি। সাবির মনের আকাশ থেকে সব কিছু তখন সরে গেছে। পূর্ব্বাপর সমস্ত অবলুপ্ত। শুধু জাগ্রত চেতনায়, রক্তমাংসের দুর্দ্দান্ত আকর্ষণ আর বলিষ্ঠ প্রাণের স্পন্দন ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই।

রমাপতির ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এল সাবি, ভোরের বাতাসে তখন আগত দিনের স্পর্শ এসে পৌঁছে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ছেলেমেয়েদের ঘরে ফিরে এল সাবি। ছোট খোকার পাশে শুয়ে

পড়বে, বিছে কামড়ানোর মত কি একটা জ্বালা করে উঠল মনে। এ অবস্থায় সে ছেলে মেয়েদের কি করে ছোঁবে? না, তা সে কিছুতেই পারবে না।

টলতে টলতে একখানা ছেঁড়া মাত্বর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল সাবি।

৩

মেলার সমারোহ তখনও শেষ হয় নি। ছোট খোকাকে কোলে করে, মঞ্জুর হাত ধরে সাবি আর রমাপতি সন্ধ্যার একটু আগে বাজার থেকে বাড়ী এসেই যা দেখল, তাতে দুজনেই একেবারে কাঠ হয়ে গেল। তালাবন্ধ ঘরগুলোর বাইরে সামনের রোয়াকের সিঁড়ির ওপর বসে আছে বিশু, মোটা একখানা অল্প দামের সূতির গায়ের কাপড়ের নীচে হতভাগ্যের অব্যর্থ চিহ্নস্বরূপ চাবি বাঁধা উত্তরীয়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। রুক্ষ চুলে আর শোকের বিষণ্ণতায় মুখখানা শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। খালি পা, ছোট একখানা কম্বলের আসন মনের ভুলেই হয়ত পেতে না বসে কোলের ওপর গুটিয়ে রেখে দিয়েছে।

দু চার মিনিট কারুর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। নিদারুণ শোকের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশকে কিসে যেন একটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে রেখেছে।

সঙ্কোচ কাটিয়ে প্রথম কথা কইল সাবি, কি হল বিশু? কার সঙ্গে এলি বাবা? বলতে বলতেই চোখের জলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। সাবি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, রমাপতি ছুটে এসে বিশুকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে যাবে, বন্ধ দরজা দেখে সাবিকে ধমক দিয়ে উঠল, দোরটা খুলে দাও না, সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সাবি তালা খুলে দিল, তারপর অন্য ঘরের তালা খুলে খোকা আর মঞ্জুকে সঙ্গে করে ঘরে চলে গেল।

ছোট মেয়ে মঞ্জু কি বুঝল বলা যায় না, ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলে সাবিকে জড়িয়ে ধরল।

কি হয়েছে মাসিমা ? দাদার কি হয়েছে ?

কিছু হয় নি মা, তুমি কেঁদ না। বলেই মনে মনে চমকে উঠল সাবি। এ বয়সে মা মরা যে কি জিনিস হাড়ে হাড়ে জেনেও ওকি বোঝাচ্ছে সে ? মঞ্জু কিন্তু অত সহজে ভুলল না।

দাদা এল, মা এল না ? মার বুঝি অসুখ ? ডান হাত দিয়ে মঞ্জুকে আর একটা কোলে তুলে নিয়ে গালে একটু চুমু খেয়ে বলল সাবি, ঠিক বলেছিস মঞ্জু। মার যে অসুখ সোনা। কি করে আসবে ?

তুমিই বুঝি বাড়ীর ঝি ? এই দুটি বুঝি ছেলেমেয়ে ? আহাহা, একেবারে দুধের বাচ্চা ! এই বয়সেই মা গেল, কি বরাত ! আ হা হা হা ! পোড়খাওয়া বিধবা, পঞ্চাশের ওপর বয়স। মাথার চুলগুলো সমান করে ছাঁটা। মোটা গায়ের কাপড়ের আঁচলে তিন চারটে মাটির পুতুল, আরও টুকিটাকি অনেক জিনিস। তিলকসেবা করা খাড়া নাকটা একটু যেন কুঁচকেই থাকে। সাবিকে শুনিয়ে আবার বললেন তিনি, কি গলাকাটার দেশ বাপু তোমাদের। এসে দেখলাম দুয়োরে তালা ঝুলছে, তাই ভাবলাম, সামনেই বাজার, একটু ঘুরে আসি। এই কটা মাটির সামিগ্যিরি তাতেই একটা টাকা দাম পড়ে গেল। ভাবলাম ভোঁদার ছোট ছেলেমেয়েগুলো রয়েছে, গেলেই হাঁ হাঁ করে এসে পড়বে—দিদিমা, কি আনলে দ্যাও। তা এগুনো কম্‌নে থুই বল ত বাছা ?

থোন্ না ঐখানে। বলে ঘরের ভেতর একটা তাক দেখিয়ে দিল সাবি।

কম্‌নে ? দেখি, বলতে বলতে ডিঙি মেরে ঘরের ভেতর এসে তাকটা পরীক্ষা করে বললেন : একটু গোবরজল দিয়ে ওখানটা একটু মুক্ত করে ছ্যাও বাছা। খোকাকে একটু নাবিয়ে রাখ। তুমি কি জাতের মেয়ে বাছা ?

খোকাকে কোলে করেই বাইরে চলে গেল সাবি। রমাপতির ঘরে ঢুকে দেখল বিশুকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে আছে রমাপতি। সাবিকে দেখতে পেয়ে তড়াক করে বাপের কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে বাইরে চলে গেল বিশু। রমাপতির বিছানায় খোকাকে শুইয়ে দিয়ে বলল সাবি, এখানে বসে না থেকে কুটুম মানুষ এয়েছেন, একটু দেখাশোনা করলে ভাল হয় না ?

তা হয়ত হয়, তবে আমার ভাল লাগছে না। উনি হচ্ছেন বিশুর মায়ের দূরসম্পর্কের পিসিমা। তুমি দেখাশুনো করলেই চলবে। বলেই বিছানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে ডানহাতখানা দিয়ে চোখদুটো চাপা দিল রমাপতি।

ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে ছোট খোকাকে শুইয়ে দিয়ে বলল সাবি, খোকা রইল। একটু দেখবেন।

রমাপতি বলল, তুমি আমায় বকিয়ো না সাবিত্রী। একটু চুপ করে থাকতে দাও। একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থেকে চলে গেল সাবি। এক ঘটি জল আর একটু গোবর নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। বিশুকে পেয়ে সাবির পরিচয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন বিধবাটি।

কি সব্বনাশ! জাত জন্ম খোয়াতে এ কমনে এলাম বাপু।

তাইত বলি, এই বয়সে মল কেন মেয়েটা ? তাও মল মল, মিত্যু-কালে একবার সোয়ামীর মুখটাও দেখতে পেল না।

আসন্ন সন্ধ্যায় বিদায়ী শীতের আমেজে সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল সাবির। দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত আরও কিছু শুনতে হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে এল। তাকে দেখে বললেন বিধবাটি, কী, জল এনেছ ? তা দ্যাও। গোবরে সব শুদ্ধু। তা ছাড়া গঙ্গার স্তীর......বলে হাত দুখানা কপালে ঠেকালেন।

স্থানমাহাত্ম্য শুনতে শুনতে কাঠের একটা তাক গোবরজল দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল সাবি। দেখে যেন একটু খুশী হলেন বৃদ্ধা। বললেন, বাঃ! কাজকম্ম তোমার বেশ পরিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে। তা ছাড়া ঘরদুয়োরগুনো বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে থুয়েছ। তবে বাপু আমার হক্ কথা বলা অভ্যেস্। তোমার একটু হুঁস্ পব্ব কম আছে বাছা। বাড়ীতে কাজ কর বলে, ছোট জাতের মেয়ে হয়ে বামুনের মেয়ের মুখে কপ্ কপ্ করে চুমু খাওয়াটা ভাল নয়। পরকাল বলে একটা জিনিস আছে, সেটা বুঝে চল। বলতে বলতে গায়ের কাপড় থেকে অগ্নিমূল্যে সওদাকরা জিনিসগুলো একটা একটা করে বের করে ছেলেমেয়েদের আড়াল করে তাকের উপর সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

ঘাড় হেঁট করে সমস্ত শুনল সাবি। রমাপতির স্ত্রীর মৃত্যু নিঃশব্দ অভিশাপের মত এ বাড়ীতে তার অস্তিত্বটা দেখতে দেখতে বিষাক্ততর করে তুলছিল। পরিণতির এ দিকটা কোনদিনই ভেবে দেখে নি সাবি। ছোট জাতের মেয়ে হলেও অধিকার সে ভিক্ষা করে নেয় নি। কিন্তু সে বোঝাপড়ার দিন ত তার এল না। আজ যে সমস্ত দায়-দায়িত্ব, কচি কাঁচা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ

ছেড়ে দিয়ে জন্মের মত চলে গেলেন তিনি. এখন এ শূন্য সংসার সে আঁকড়ে ধরবে কিসের জোরে ?

উপদেশগুনো কানে শুনলেও, শেষ অবলম্বন ত ঐ ছেলে-মেয়েগুলি। এদের আদর না করলে কি নিয়ে থাকবে সে এখানে ? সমস্ত গৌরব অনাবৃত হয়ে পড়লেও, এখানে একটু আশ্রয় সে পাবেই। খোকন তার কোল ছাড়া কোথাও যায় না, মঞ্জুও মাকে প্রায় ভুলতে বসেছিল, ভুলবেও দু দিন পরে। আর বিশু ?

এতক্ষণ পরে যেন জ্ঞান ফিরল সাবির। সমস্ত শক্তি একত্র করে সে বিশুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরল। দেখেও দেখল না ঘোলাটে একজোড়া চোখ বিষের ফলার ধার নিয়ে তাকে জর্জ্জরিত কবে ফেলছে। দুরন্ত ঘোড়ার মত প্রথমটা খানিক ছটফট করল বিশু, এমন কি সাবিকে আঁচড়ে কামড়ে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু শক্তি পরীক্ষার চরম অবস্থায় এসে আজ আর হারলে চলবে না সাবির। তাই শেষ পর্য্যন্ত বিশুই রণে ভঙ্গ দিল। সাবির বুকের ভেতর মাথা গুঁজে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না বাবা ? বিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সাবি। ওঃ, কষ্টে একেবারে ফেটে যাচ্ছে। বলে বাপ্‌কো বেটা, সিপাইকা ঘোড়া। যে যাবার সেই গ্যাল, এখন ত সব ঝাড়া হাত পা। উচ্ছ্বাস শেষে নাভিদেশ থেকে নিশ্বাস টেনে জোর করে সবটুকু ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে গেলেন বৃদ্ধা। সাবি আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাঁদিয়ে আর কি হবে বলুন ? যা হবার তাত হয়েই গিয়েছে।

বৃদ্ধা কিন্তু রাগ করলেন না। আগুনে জল পড়ার মত সমস্ত উত্তাপ নিভে গেল তাঁর।

তা যা বলেছ বাছা। ওদের দোষ দেওয়া বৃথা। যেমন দেখবে তেম্নি শিখবে। ওদের মামাটাই বা কি ? মা মরা ভাগ্নেটাকে তিন দিন আর রাখতে পারল না, যদি ঘাড়ে পড়ে যায়। জানে বুন মরেছে মুঠো মুঠো টাকা আর আসবে না ভগ্নিপতির কাছ থেকে। তাই যাক্ শত্তুর পরে পরে, জাত যায় আমারই যাক।

শেষ কথাটা কতকটা স্বগত উক্তি, কিন্তু সাবির গায়ে বিঁধতে ছাড়ল না। কোন রকমে রাতটা কাটিয়েই সকাল বেলা চলে গেলেন বৃদ্ধা।

বুড়ী চলে গেলেও, দুঃস্বপ্নের ছায়া সরল না সাবির মন থেকে। কাল সারা রাত এক ফোঁটা জলও মুখে দেয়নি রমাপতি। সকালে চায়ের যোগানদার রমাপতি, কিন্তু আজ তার সেদিকে কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হল না। দোরের বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখল সাবি, জামা জুতো পরে বাইরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে রমাপতি।

চা খাবেন না ? জিজ্ঞাসা করে ঘরে এল সাবি।

বড্ড বেলা হয়ে গেছে, তোমরা চা করে নাও, আমি বাজারেই খাব।

আমার খাবার কথা হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের কি এখন চা খেতে আছে ?

চা ? বলে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল রমাপতি, তা চা খেতে আবার দোষ কি ?

কাল দুঃসংবাদটা পাবার পর থেকেই মনের মধ্যে একটা লড়াই চলছিল সাবির। জটিলতার এই দুর্গম রহস্য পথে চলবার মত মনের বল, একা সে আর কত সংগ্রহ করবে !

সাবি বলল, তা না হয় নেই। কিন্তু এ অবস্থায় আমার হাতে

খাওয়া কি ঠিক হবে ? কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রমাপতির কাছ থেকে উত্তরটা শোনবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে উঠল সাবির। কিন্তু কোন আশ্বাস বা সমর্থনের বিন্দুবিসর্গও খুঁজে পেল না রমাপতির মুখের চেহারায়। রমাপতি বলল, মঞ্জু আর খোকার কিছুতেই দোষ নেই। তবে বিশুর কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আচ্ছা আমি তাড়াতাড়ি ঘুরে এসে ব্যবস্থা করছি। বলে, সাবির দিকে না চেয়ে বাইরে চলে গেল রমাপতি।

অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করে উঠল সাবির। কাল রাত থেকে সেও অভুক্ত, কিন্তু এ রকম অনাহার ত তার নতুন নয়। দোরটা চেপে ধরে সেইখানেই সে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে এদিক ওদিক চাইতে তার নজরে পড়ল রমাপতির খাটের ঠিক সামনাসামনি দেওয়ালের একটা অংশ রাতারাতি দখল করে মাঝারি আকারের একখানা ফটো ঝুলছে। রমাপতির স্ত্রীকে বিশেষ করে না চিনলেও ছবিখানার আদল তাকে নিঃসংশয়ে সেই রকম পরিচয়ই জানিয়ে দিল। খাসা গোলগাল নধর চেহারা, সাজসজ্জায় জমজম করছে। সাবি ফটোখানার আরও কাছে সরে এল। ঠিক সেই সময় কোথা থেকে একপা ধুলো মেখে ঘরে এল বিশু। সাবিকে কি বলতে গিয়েই চমকে উঠল, এ ফটোকখানা কে টাঙাল মাসিমা ?

বিশুর মুখের দিকে চাইল সাবি। মাতৃহারা ঐটুকু ছেলে, তবুও সেই কচি মুখের জিজ্ঞাসায় শিউরে উঠল সাবি।

কি জানি ? আমিও এই দেখছি।

বিশুর ফর্সা মুখখানা শোকের ম্লানিমার মধ্যেই বহুরূপীর রঙ বদলানর মতো টকটকে হয়ে উঠল।

কিছু খাস নি বিশু। সমানে ঘুরছিস বাইরে বাইরে। হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাবি চ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সাবি। খাবার জিনিসের অভাব ছিল না ঘরে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে ফলমূল কেটে বিশুকে ডাকল।

চা খাবি বিশু?

দেবে মাসিমা? মামার বাড়ীতে একদিনও চা খেতে পাই নি।

সাবি একটু ভাবল। রমাপতি বিশুর খাওয়া সম্বন্ধে হুকুম না দিয়েই চলে গেছে। তা হ'ক। ছোট ছেলের আবার দোষ কি?

তুই খেতে বস। আমি চা করে দিচ্ছি। ষ্টোভ জ্বালার কৌশলটা জানত না সাবি, উনুন ধরিয়ে জলের কেটলিটা বসিয়ে দিল।

খেতে বসে বলল বিশু, মা আমায় কি বলত জান মাসিমা?

কি বল্‌ত? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

না, বলব না। অত্যন্ত ম্লান হাসি হেসে একটুকরো আক মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে লাগল বিশু।

আমাকে বলবি নে বাবা? বল লক্ষ্মী সোনা আমার।

ঐ ফটোখানা না? বলে একটু থেমে বলল বিশু, মা আমাকে লুকিয়ে রাখতে বলেছিল। আবার চুপ করে গেল বিশু।

সাবি আর জিজ্ঞাসা করবে কি, এই একটা কথা শক্তিশেলের মত তার বুকে বিঁধে রইল।

বিশু বলল, মা বলত, আমি যখন বড় হব, আমার যখন বিয়ে হবে, তখন ছবিখানা বের করব। ছোটছেলের প্রাণখোলা আলাপে ছিন্নমূল লতার মত শুকিয়ে উঠল সাবি।

এত ভাল কথা বাবা। তোমার বিয়ে দিয়ে টুকটুকে বউ এনে তার ঘরে ঐ ছবিখানা টাঙিয়ে দোব।

ধ্যেৎ, বলে এইবার অন্যদিকে মুখখানা ফিরিয়ে নিল বিশু।

ঘর থেকে একটা কাঁসার গ্লাস এনে তাতে চা তৈরী করল সাবি। দু' এক চুমুক চা খেয়েছে বিশু, শালপাতার ঠোঙ্গায় ছানা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল রমাপতি।

কি? খোকা আর একটু সবুর করতে পারলেন না? বলেই ঘরের মেঝেয় ঠোঙ্গাশুদ্ধ ছানাটা নামিয়ে রেখে বাইরে চলে গেল রমাপতি।

বারটা নাগাদ ফিরে এল রমাপতি এবং বিশুকে সঙ্গে করে বাইরে চলে গেল। বেলা দুটো পর্য্যন্ত যখন ফিরল না কেউ, রান্নাঘরের দোরে শিকল তুলে দিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল সাবি।

কৃষ্ণপক্ষের ফাল্গুন সন্ধ্যায় ঠাণ্ডার আমাজে অন্ধকার ঘনিয়ে এল; না ফিরল রমাপতি, না ফিরল বিশু। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, গল্প বলে, ঘুম পাড়িয়ে শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সাবিও ঘুমিয়ে পড়ল। প্রবল জ্বরের সুতীব্র উত্তেজনার মত কি একটা ঘোরাফেরা করছিল তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত। খুট করে শব্দ হতেই ঘুম ভেঙ্গে দু' এক বার দোরের কাছে ছুটে গেল সাবি, আবার ফিরে এসে শুয়ে পড়ল; কোথায় কে? শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে যখন বড্ড বেশী ঘুমিয়ে পড়ল, রমাপতির হাঁক ডাক আর কিছুই তার কানে গেল না।

ঘুম ছেড়ে উঠে বসল সাবি রমাপতি তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই। ছিঃ, ছিঃ, এই ঠাণ্ডায় শুয়ে আছ? ওঠ, এই খাবারটা ধর। বাবা, কি ঘুম তোমার! ডেকে ডেকে সাড়া নেই। শেষ পর্য্যন্ত পাঁচীল টপ্‌কে আসতে হল।

বিশু কোথায়? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

বিশু ? ঘরে এস বলছি। সাবির হাতে খাবারের ঠোঙ্গা দিয়ে ঘরে চলে গেল রমাপতি।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল সাবি, কেন ? কি হয়েছে তার ?

দেওয়াল-আলোর গতি বাড়িয়ে দিয়ে খাটের ওপর বসে বলল রমাপতি, ভেবে চিন্তে দেখলাম এ অবস্থায় তার এখানে না থাকাই ভাল।

কোথায় রেখে এলেন ?

রেখে এলাম, মানে, এই ভূপতিবাবু খবর পেয়েই এলেন, অনেক করে বললেন···।

ইতস্ততঃ করছেন কেন ? বলে ফেলুন। ভূপতিবাবুর বাড়ীতে রেখে এয়েছেন, এই ত ?

হা, তবে তোমার হয়ত রাগ হচ্ছে।

আমার ত রাগের কিছু নেই ডাক্তারবাবু। আপনার ছেলে, আপনি যেখানে খুশি রাখতে পারেন। তবে মঞ্জু, খোকা ওদেরও ত মা মরেছে, ওরা কি অপরাধ করল, যে ডুলের হাতের ভাত খাওয়াচ্ছেন ?

সাবির উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল রমাপতি। তারপর বলল, এই কদিনের জন্যে। তারপর আবার সে তোমার কাছেই ফিরে আসবে। শুধু অশৌচটুকুর জন্যে। এইটুকুই আমাদের কাছ থেকে তার শেষ পাওনা। অন্ততঃ বিশুর কাছ থেকে ত বটেই।

সাবিকে নিরুত্তর দেখে আবার বলল রমাপতি, বল, ওটুকু দিতেও তোমার আপত্তি ?

আপত্তি আমার কেন থাকবে ডাক্তারবাবু ? আমি ত গোড়া

থেকেই বলেছিলাম, আমার হাতের ছোঁয়ানেপা জোর করে চালালেও শেষ পর্য্যন্ত সে জোর থাকবে না। তবে ভূপতিবাবুর কাছে যখন গেছেন, আর সব ব্যবস্থা তিনিই বলে দেবেন।

অত্যন্ত শান্তভাবে কথাগুলো বলল সাবি। এমন কি এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে যে তার ভবিষ্যৎ একটুও জড়িয়ে আছে, কথার সুরে বা মুখের ভাবে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ফুটল না।

এতটা ভাবলেশহীন জবাব ঠিক সহ্য হল না রমাপতির।

যদি তিনি বলে দেন, তখন ভেবে দেখব। কিন্তু তোমার প্রাণে কি দয়ামায়া বলতে কিছু নেই সাবিত্রী? একটা মানুষ জন্মের মত চলে গেল, সে দিক দিয়ে ত একটা কথাও তুমি বললে না?

সারা দিনের অনাহারশীর্ণ মুখখানায় ক্ষীণ একটু হাসি খেলে গেল সাবির, আপনিও ত কোন কথা বলেন নি ডাক্তারবাবু? ছোটজাতের মেয়ের সঙ্গে আর যাই করুন না কেন প্রাণের কথা বলে কি শান্তি পাওয়া যায়? তবে আমার কথা যদি বলেন, তিনি যে মারা গেলেন সেটা সত্যই যাদের বেশী লেগেছে, তাদের কাছেই বলেছি। তাদের ত এখনও অত জ্ঞান হয় নি, বামুন, শূদ্দুর বোঝে না। তাই ভাবছি, ছেলেটারে বামুনের ঘরে পুরে দিয়ে এলেন, তাতে তার জাত হয়ত বাঁচবে, তবে মন গুম্‌রে থেকে অসুখ বিসুখ না হয়।

রমাপতির মনের উত্তাপ কমে গেল।

রমাপতি বলল, তুমি মনে করছ আমি সেধে গিয়ে বিশুকে ভূপতিবাবুর বাড়ী রেখে এসেছি। মোটেই নয়। দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছি, ভূপতিবাবু এসে নিজেই কথা পাড়লেন। ভাবলাম শ্রাদ্ধ শান্তির সময় যদি গোলমাল বাধে, তা ছাড়া আমার ইচ্ছেও নয় যে ওর শেষ কাজটা পণ্ড হয়।

শ্রাদ্ধ কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে কথাটার মর্ম্মার্থের মধ্যে যেন ডুবে গেল সাবি। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্য করেই তার সব গেছে।

রমাপতি দেখল সাবি তার কথা ঠিক শুনছে না।

অনেক রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়গে।

যাই।

সাবি কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু বলবে? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল।

রমাপতির মুখের দিকে চাইল সাবি। ইচ্ছাটা, জিজ্ঞাসা করে শ্রাদ্ধ কোথায় হবে? কিন্তু পারল না। জিজ্ঞাসা করবে কি, যদি শোনে সে এখানে থাকে বলেই শ্রাদ্ধ এখানে হবে না, তা হলে তার মুখ থাকে কোথায়? এ আলোচনা করতে গেলেই নিজের মনের গায়ে বিঁধে যায়।

না, কি আর বলব? বলে দোর খুলে অন্য ঘরে চলে গেল সাবি।

ভূপতি মজুমদারের বাড়ীতে মায়ের শ্রাদ্ধ সেরে নেড়ামাথায় বাড়ী ফিরে এল বিশু। সাবি দেখল এ কদিনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে সে। ভাইবোনেরা কাছে এলেই ছুঁই ছুঁই করে। সাবির সঙ্গে কথা কয় ভাসাভাসা ভাবে।

খেতে বসে একদিন থালা সমেত ভাত-তরকারি ঠেলে রাখল বিশু।

কি হল বিশু? খাবি নে? সাবি জিজ্ঞাসা করল।

না ভাল লাগছে না।

কেন? খিদে নেই? গা ভাল আছে ত?

পরিষ্কার উত্তর দিল বিশু, কিরকম রেঁধেছ, বিচ্ছিরি, খেতে তার লাগে না। ওখানে কিরকম খেতাম, মাছের কালিয়া, এঁচোড়ের চপ, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, আর ও কত কি!

গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে গেল সাবি, সে কি রে! অশৌচ গায়ে মাছ খেতে দিত তোয়ে?

একদিন দ্যায় নি, তারপরে দিত। বাবু একদিন খুব বকলেন। বললেন, ছেলেমানুষের দোষ হয় না।

শুনে আর কথাবাড়াবার প্রবৃত্তি হল না সাবির।

আজকের দিনটা খেয়ে ন্যাও বাবা। কাল তোমার বাবাকে বলব ভাল রাঁধুনী বামুন আনতে।

সাবিকে আর বলতে হল না। দিন দুই পরে একজন পাচক বহাল হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটু কৈফিয়ৎও দিল রমাপতি, রান্নবান্না, ছেলেপিলে দেখা, বড্ড কষ্ট হচ্ছে তোমার, লোকটাও পাওয়া গেল সুবিধামত। ওকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দাও।

দেখে শুনে নেক ও। আমার শরীলটা ভাল নেই। হঠাৎ খানিকটা চোখের জল এসে পড়ায়, রমাপতির সামনে থেকে সরে গেল সাবি। রান্নাঘরের দালান থেকে নেমে এসে সটান ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সাবির ঘরের দোরের সামনে এসে দাঁড়াল রমাপতি।

রমাপতি বলল, তুমি রাগ করছ সাবিত্রী, তোমার ভালর জন্যই এই ব্যবস্থা করলাম।

মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে বলল সাবি, আমি ত রাগ করিনি ডাক্তারবাবু।

করেছ বৈ কি! তা না হলে তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়লে কেন? রমাপতি সাবির পাশে এসে বসে পড়ল। তবুও কোন উত্তর না পেয়ে তার মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

তীরের মত ছিটকে উঠে বলল সাবি, ছিঃ। ছেলে বড় হলে বাপকে একটু হুঁশ করে চলতে হয়।

রমাপতির মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে কাল হয়ে উঠল, তবুও কোনরকমে হাসির চেষ্টা করে বলল, কে? বিশু? ওর আর কি বয়স হয়েছে? তুমিও যেমন?

যে বয়সই হক,। আপনি এখান থেকে উঠে যান, বলে নিজেই ঘর থেকে বাইরে চলে গেল।

চাবিটা দিয়ে যাও। ঠাকুর রান্নাঘরে যেতে পারছে না।

আঁচল থেকে রিংসুদ্ধ চাবির গোছাটা খুলে রমাপতির পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল সাবি।

অপাঙ্গে চেয়ে দেখল সাবি, চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে নিজের হাতে রান্নাঘরের তালা খুলে দিল রমাপতি। সাবির মনে হল, তার গৃহিণীপনার প্রধান অধিকারটুকু নির্ব্বিকারচিত্তে কেড়ে নিল রমাপতি।

রমাপতির মোটামুটি নির্দ্দেশ মত রান্না করল ঠাকুর। ঘরে শুয়ে প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে করতে লাগল সাবি, কোন না কোন দরকারে তার ডাক পড়বেই। কিন্তু যখন মঞ্জুর পর্য্যন্ত খাওয়া হয়ে গেল, সাবি আর শুয়ে থাকতে পারল না।

ঠাকুর মশাই। ইদিকে আসুন ত একবার।

নবনিযুক্ত পাচক সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক, এ গ্রামের সঙ্গে তার পরিচয় পূর্ণিমার মেলা উপলক্ষ্যে। ডাক শুনেই সে সাবির কাছে এসে দাঁড়াল।

রমাপতিকে শোনাবার উদ্দেশ্যেই বলতে লাগল সাবি, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াবার আগে আমাকে একটু ডাকবেন। বুঝলেন?

আজ্ঞে তাই হবে মাঠাকরুণ।

বামুন ঠাকুর চলে যাচ্ছিল, সাবি আবার তাকে ডাকল।

কি রকম খাওয়ালেন বলুন ত? খুকীর খেয়ে পেট ওঠে নি। খোকাবাবু কোথায়?

আজ্ঞে, তিনি ত খেয়ে বাবুর সঙ্গে বাইরে গেলেন।

তাই নাকি? আচ্ছা, আপনি যান। রুদ্ধমুখ উৎসের মত সমস্ত উৎসাহ লুপ্ত হয়ে গেল সাবির। আসন্ন গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ আকাশের সঙ্গে সমতা রেখে ভেতরটা তার জ্বলতে লাগল। চেয়ে দেখল, বামুনঠাকুর তখনও দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা জিজ্ঞাসা গলা পর্য্যন্ত ঠেলে এল সাবির। আপনাকে কে ঠিক করে দিল ঠাকুরমশাই?

আজ্ঞে, হেথাকার জমিদারবাবু। আপনি খাবেন না মা?

না। আপনি খেয়ে নিন গে।

বিকেলের দিকে বিশু ফিরে এসে সাবিকে ডাকল।

মাসিমা! শুয়ে রয়েছ, খেতে দেবে না?

সাবি বলতে যাচ্ছিল, বামুনঠাকুরের কাছে যা, কিন্তু বিশুর মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। কেশবিরল শূন্যশ্রী মাথায়, শুকন রোদ ঝলসান মুখে বড্ড যেন নিঃস্ব দেখাল ছেলেটাকে।

কি হয়েছে মাসিমা? কথা বলছ না যে! অসুখ করেছে বুঝি? বলতে বলতেই এসে সাবিকে জড়িয়ে ধরল বিশু।

সাবি আর থাকতে পারল না। সমস্ত ভুলে গিয়ে সেও বিশুকে বুকে টেনে নিয়ে মাথাটা তার মুখের ওপর চেপে ধরল।

বড্ড খিদে লেগেছে মাসিমা, সেই কখন দুটো খেয়ে গিইছি।

চল বাবা। দেখি কি খাবার আছে?

রান্নাঘরের অবস্থা দেখে গা জ্বলে উঠল সাবির! অ্যালুমিনিয়মের

হাঁড়িতে প্রায় ছুতিন জনের মত ভাত ঢাকাখোলা অবস্থায় জমাট বেঁধে রয়েছে। হাঁড়িটার গায় ফ্যান লেগে শুকিয়ে গেছে। সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় ডাল তরকারিগুনো বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। রান্নাঘরের নর্দ্দমার মুখে হাঁসের ডিমের খোসা পিঁয়াজের খোলা ছড়ান। পাচকঠাকুরের দিবানিদ্রা তখনও শেষ হয়নি। সাবির ডাকে গায়ের ময়লা চাদরখানা খুলে ফেলে সে উঠে দাঁড়াল।

দুধ কোথায় রেখেছেন ঠাকুরমশাই?

দুধ? বলেই যেন আকাশ থেকে পড়ল লোকটি।

জ্বাল দেওয়া হয় নি?

বড় একটা আড়াইসেরী ঘটিতে বটের আঠার মত ঘন দুধ জমে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। একবাটি মুড়ির ওপর খানিকটা খেজুরের গুড় দিয়ে বিশুকে খেতে দিল সাবি।

এখন এই খা। রান্না হলে একেবারে খেয়ে নিবি। আপনি কখনও কাজ করেছেন ঠাকুরমশাই, না এই পেরথম্?

সে কি বলছেন মাঠাকরুণ? মাতৃতৎতুল্য লোক আপনি, আপনাকে কখনও মিছা কথা বলব না। কলকাতায় কুণ্ডু বাবুদের বাড়ীতে বরাবর আমি রসুই করিছি।

আমি বামুন নই ঠাকুরমশাই। তবুও আপনার চেয়ে ঢের ভাল কাজ করতে পারি। আপনি ঘরখানা একটু পরিষ্কার করুন ত, রান্না এবেলা আমিই করব।

বামুনঠাকুর উত্তর দেবে কি, অবাক হয়ে সে সাবির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে থাকবেন না, বেলা পড়ে এল। ছেলে দুটোর ভাল করে

খাওয়া হয় নি। বাচ্ছা ছেলেটা অবধি বিলিতী দুধ খেয়ে রয়েছে। চটপট নিন।

এতক্ষণে হয়ত বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেল পাচকঠাকুরের। পুরু গোঁফজোড়াটার এদিক ওদিক হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, ঘর ধোয়া, সকড়ি মাজা ত আমার কাজ লয়!

তাহলে আপনি সরে যান, আমিই সব করছি।

সাবির মুখের দিকে একাধিক বার আড় চোখে চেয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল পাচকঠাকুর।

ঘরদোর পরিষ্কার করে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সাবি। রান্না করব মুখে বললেও সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি ধরতে কোথায় যেন বাধছিল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাটা করিয়ে নেবে শেষ পর্য্যন্ত এইটুকুই সে ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও যখন বামুনঠাকুর আর ফিরল না, কাপড় বদলে এসে অগত্যা তোলা উনুনটায় আঁচ ধরিয়ে দিল সাবি।

হ্যারিকেনের আলোর বেষ্টনীর বাইরে খানিকটা আলো ও একাধিক লোকের জুতোর শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সাবি। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করল, এ কে ভূপ?

উনুনের আঁচ লেগেই হক বা যে কারণেই হক, নিঃশেষিতআয়ু শীতের সন্ধ্যায় কপালের ওপর ঘাম ফুটে উঠল সাবির। ভূপতি মজুমদারের পেছনে দাঁড়িয়ে একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক, তাঁর পেছনে রমাপতি।

ও বাড়ীর কাজ করে। এই গাঁয়েরই মেয়ে, মেয়েটি বড় ভাল। সাবি বুঝতে পারল তার পরিচয়টা একটু চাপতে চেষ্টা করছে ভূপতি। তবুও মিথ্যার ছলে প্রশংসার স্বরটা তার মনে যেন একটু বল এনে দিল।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু বয়সটা বড্ড কাঁচা মনে হচ্ছে। তা রান্নাবান্না কি ওই করে নাকি ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা জুগিয়ে দিল রমাপতি, না ঠাকুর আছে। তুমি কেন আঁচ দিচ্ছ সাবিত্রী ? ঠাকুর কোথায় ?

বিকেল বেলায় কোথায় বেরিয়েছে। সাবি বলল।

এ বড় খারাপ কথা। বেটার মাইনে না কাটলে আর চলে না। আসুন, আপনারা এ ঘরে আসুন।

মহিলাটি বললেন, তোমরা যাও না। আমি একটু এইখানেই বসি। কই গো মেয়ে, একটা বসবার জায়গা-টায়গা দ্যাও না।

তাড়াতাড়ি একখানা কম্বলের আসন এনে পেতে দিল সাবি।

ভূপতি মজুমদার বলল, এখানে কেন বসবে দিদি। বড্ড ঠাণ্ডা। তার চেয়ে বরং ঘরেই চল।

ঠাণ্ডা ! তোদের দরকার হয়, ঘরে যা। আমি একটু ফাঁকায় বসি। ঘরের মধ্যে ঘিজিঘিজি ভাল লাগে না বাপু।

ভূপতি মজুমদার আর রমাপতি ঘরে চলে যেতে সাবিকে বললেন মহিলাটি, চল, রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে বসি। তুমি কি এইখানেই রান্না করবে ? তোলা উনুনটা ঘরে নিয়ে চল না। আমি না হয় তোমার কুটনো বাটনা করে দিচ্ছি।

না, না। আপনার কিছু করতে হবে না। আপনি বসবেন চলুন। মঞ্জু আসনখানা ঘরে পেতে দেত মা।

ঘরে গিয়ে সাবিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, এইটি বুঝি মেয়ে ?

হাঁ।

আর কি ছেলেমেয়ে ?

আর দুটি খোকা।

তাদের দেখছিনে ত ? চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি।

ছোটটি ঘুমুচ্ছে। বড়টি, এই ত ছিল এখানে। বলেই বিশুর নাম ধরে ডাকল সাবি।

রান্নাঘরের একজায়গায় চুপ করে অপেক্ষা করছিল বিশু। সাবির ডাক শুনে দু এক পা এগিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ও মা ! তুই কোথায় ছিলি রে ? আয়, ইদিকে আয়।

বিশু একবার মুখ তুলে চেয়ে যে ঘাড় গুঁজে দাঁড়াল, দুজনের ডাকাডাকিতে আর এক পাও নড়ল না।

ডানহাতের তর্জ্জনীটা গালের ওপর সংলগ্ন করে বললেন মহিলাটি, আচ্ছা হেজলদাগ্ড়া ছেলে বটে ত ! কি রকম শিক্ষে.হয়েছে ছেলের ? বেশ ত ডাগর হয়েছে দেখছি। নেখাপড়া করে, না টো টো করে ঘুরে বেড়ায় ?

বিশুকে এইবার হাত ধরে টেনে আনল সাবি, ও বড্ড লাজুক। লোক দেখলে জড়সড় হয়ে যায়। ছিঃ বাবা ! ও রকম করতে নেই, পেরনাম কর।

বিশু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেলেন মহিলাটি। থাক্, থাক্, দাদা। আমার এখনও জপ আহ্নিক হয় নি। বলতে বলতে গায়ের শালখানা একটু গুছিয়ে নিলেন।

যাও, ঘরে গিয়ে পড়তে বসগে। বিশুকে বলল সাবি।

বিশু চলে গেলে আত্মপরিচয় দিলেন তিনি।

তুমি আমায় চেন না। আমি ভূপতির মাসতুত দিদি। অনেক দিন আগে একবার এখানে এসেছিলাম। তোমরা তখন

জন্মাও নি। কর্ত্তা মারা যাবার পর এই সাত বছর ঘর থেকে এক পাও নড়িনি। গতর পেড়ে দিইছিল শোকে। কি করব, আই-বড় মেয়ে গলায়, বুকে পাষাণ চাপান। ভূপতি খবরটা দিল। তা কি রকম হবে বল দিকি? সত্যি বল বাপু। লুকিও না।

কথাটা ভাল বুঝল না সাবি।

কিসের কথা বলছেন বলুন ত, ভাল বুঝতে পারছিনে।

তুমি কি ন্যাকা মানুষ বাছা! বলে সাবির আরও কাছে সরে এসে চাপা গলায় বললেন, ডাক্তারের ঘর বংশ ভাল। বউ মরলেও বয়স এখনও কাঁচা। রোজগারপত্তর ভালই করে। ঘরবাড়ীও বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। তবে তিন তিনটে সতীনের কাঁটা। বড় ছেলেটা ত দেখ্‌ছি বেশ ঘাগী হয়ে উঠেছে। বনবে ত? সেই কথা তোমায় জিজ্ঞেস্‌ করছি।

মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইল সাবি। তারপর নিজেই প্রশ্ন তুলল, ডাক্তারবাবু বিয়ে করছেন? এই ত সেদিন বউঠাকরুণ মারা গেলেন! এখনও দু মাস হল না।

তাতে তোমার গায় লাগছে কেন বাপু? তুমি তার মাও নও, বোনও নও, যে পুরাণ বউয়ের জন্যে দরদ উথলে উঠছে?

অবস্থা বিপর্য্যয়ে ভদ্র সমাজের গণ্ডীভুক্ত হলেও, সাবির আজন্ম ক্ষুরধার জিভটা পাষাণী অহল্যার মত সজীব হয়ে উঠল।

কি করে জানব বলুন। হাড়ী বাগদীর ঘরেও অদ্দিনের ঘরকরা বউ মারা গেলে লোকে দুদিন সবুর করে। মা-মরা ছেলেদের গলার কাচা নাবতে না নাবতেই বিয়ের টোপর পরতে ছুটোছুটি করে না!

ও বুঝেছি! সবুর করলেই বোধ হয় তোমার সুবিধে হয়।

বলেই তর তর করে ঘর থেকে উঠে গেলেন মহিলাটি।

জ্বলন্ত উনুনের সামনে বসে জ্বলতে লাগল সাবি। হাতে কাজ করলেও মনটা তার পূর্ব্বাপর সমস্ত জীবনের যাবতীয় অন্ধিসন্ধির মধ্যে পথ খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু যত কিছু সংকল্পই সে গড়ে তুলুক না কেন, সব কিছুর পেছনে লুণ্ঠিত মর্য্যাদার অসম্মানকর ছবি ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না। এইবার হয়ত ভাবির ঘরের পাশেই তাকে চালা বাঁধতে হবে। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? সে নিজে, না রমাপতি?

কতক্ষণ যে এভাবে কেটেছে ঠিক খেয়াল ছিল না সাবির, হঠাৎ রমাপতিকে দেখে তার চমক ভাঙ্গল।

ঠাকুর আসে নি? রমাপতি জিজ্ঞাসা করল।

না।

সে ত দেখতেই পাচ্ছি। কোথায় গেল সে?

সে আর আসবে না। সাবি বলল।

আসবে না কেন?

সে গরীব লোক। তার জাতের ভয় আছে। সেই জন্যেই আসবে না।

খোঁচাটা সহ্য করে নিয়ে বলল রমাপতি, তুমি তাকে কিছু বলেছ?

বলব না? আপনার গুণ চেপে রেখে আর আমার কি লাভ?

হঠাৎ লাভ-লোকসান বুঝতে শিখলে কেন বল দিকি?

সেটা আপনিই বুঝে দেখুন। বলে রমাপতিকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘর থেকে চলে গেল সাবি।

চলে যেওনা সাবিত্রী। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

থাক্। আমারও কাজ আছে

কি এমন কাজ যে দুটো কথা শোনবার সময় নেই ?

রমাপতির টেনে টেনে ঝগড়া করবার প্রচেষ্টায় সাবির মনের বিতৃষ্ণা বেড়ে গেল। কিন্তু কোন বাদানুবাদ না করে ছোট ছেলে-টিকে ঘুম থেকে তুলল ও রমাপতির সুমুখ দিয়ে আবার রান্নাঘরে এসে তাকে দুধ খাওয়াতে বসল।

কি কথা ছিল বলছিলেন না ? বলুন এইবার। রমাপতির মুখের দিকে চাইল সাবি।

এখন থাক্। পরে বলব।

কেন, লজ্জা করছে ? বেশ ত। আমিই নাহয় বলছি শুনুন। বেটাছেলে দুটো কেন, দশটা বিয়ে করলেও দোষ নেই। ওতে আর লজ্জা কিসের ?

আস্তে। কি করছ। বিশু শুনতে পাবে।

পেলোই বা। ওরা ত জানবেই। আজ না হয় কাল। এই ত।

ভাগ্য যাদের খারাপ হয়, তাদের অনেক কিছুই জানতে হয়, সে কথা হচ্ছে না।

তবে কথাটা কি হচ্ছে শুনি ?

ছেলেপিলেদের সামনে এসব কথা বলা ভাল নয়।

আসল কথা তা নয় ডাক্তারবাবু, কেন চাপছেন ? বলুন, আমার মুখে এ সব কথা ভাল শোনায় না।

সত্যিই তাই। কেননা এতে আমার পক্ষে লজ্জা ত আছেই, তোমার পক্ষেও কোন গৌরব নেই। আমি তোমাকে ছোট করতে চাইছিনে সাবিত্রী, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না।

এবার আর কোন উত্তর দিল না সাবি।

গলার স্বর নামিয়ে আবার বলতে লাগল রমাপতি, মনে ভেব না

বিয়ের কথা চলছে বলে তোমার কথা আমি ভুলে বসে আছি। আমার দারুণ দুঃসময়ে তুমি আমার সংসারটা মাথায় করে রেখেছ। নইলে ছেলেমেয়েগুনোর কি যে হত, বলা যায় না। বলতে বলতে আড়চোখে চেয়ে দেখল রমাপতি সাবি যেন কথাগুনো গিলছে।

চুপ করে গিয়ে রমাপতি হয়ত আরও কথা খুঁজতে লাগল।

সাবি বলল, বলুন, বলুন। থামলেন কেন?

এরকম তাগাদা করলে আর বলতে পারব না। এখন থাক্। রমাপতি উঠে চলে গেল।

সমস্ত মন প্রাণ একত্র করে আর একবার জিজ্ঞাসা করল সাবি, বলতেই ত হবে, তবে আর দেরী করা কেন?

হাঁ, বলব। আগে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হ'ক, তারপর।

রমাপতির অপ্রকাশ্য বক্তব্যটার মধ্যে সাবির সমস্ত বুদ্ধি অন্ধের মত পথ খুঁজে বেড়াতে লাগল।

রমাপতি চলে গেল। একটু পরে মঞ্জু আর বিশু এসে খাবার জন্য বায়না ধরল। খোকাকে কোলে করেই সাবি তাদের খেতে দিল। মঞ্জু খেয়ে উঠে গেল, কিন্তু বিশু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল, শুধু ডাল আর আলুভাতে। এ দিয়ে কি খাওয়া যায়?

এদিক ওদিক খুঁজে একটু দুধ এনে দিল সাবি, নে দুধটুকু মেখে খেয়ে নে, আজ আর কিছু নেই। এ কদিন একটু কষ্ট করে খা। তারপর তোদের নতুন মা আসছে। ভাল করে খেতে দেবে।

একগাল ভাত মুখে পুরে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল বিশু, কে? ঐ যে বুড়ীটা এসেছিল। ওকে আমি কক্‌খনো মা বলব না। তোমাকে বলে রাখছি মাসিমা।

বিশুর কথায় হেসে ফেলল সাবি, দূর্‌, হাবা ছেলে কমনে-কারের? ও কেন? ওর মেয়ে, বেশ ছেলেমানুষ। আমার চাইতেও ভাল দেখতে।

ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে বলল বিশু, ভাল দেখতে না কচু। বিচ্ছিরি দেখতে। ওরে আমি বাড়ী ঢুকতে দেব না। তুমিও দিও না, কেমন মাসিমা?

সগুমাতৃহারা ছোট ছেলের মনের বিক্ষোভের সঙ্গে সাবির মনের বিদ্রোহটা একসুরে মিশে গেল বলেই হয়ত কতকটা ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা করল সাবি, তুই পারবি বিশু? তোর বাবা যদি জোর করে আনে, তুই আটকাতে পারবি?

মুখের ভাতগুনো গলাধঃকরণ করে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল বিশু। বাবার সামনে কিছু বলব না। বাবা চলে গেলে পিটনচণ্ডী দোব। তুমি আমাকে বড় দেখে একটা লাঠি তৈরি করে দিয়ো, কেমন?

না বাবা। ওসব কথা বলতে নেই তিনি তোমার মা হন।

মা কথাটা শুনেই মুখখানায় গা র্য্যের ছায়া পড়ল বিশুর। বলল, মা? মা ত মরে গেছে মাসিমা

সাবির চোখ দুটোয় জল ভরে এল। পাছে বিশু দেখতে পায় এই ভয়ে অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

কথা বলছনা? উদিকে কি দেখছ?

সাবি উত্তর দেবে কি, প্রাণপণে তখনও সে চোখের জল চাপছে।

তুমি কাঁদছ মাসিমা? এঁটো হাতেই সাবির গলাটা জড়িয়ে ধরল বিশু।

কাঁদব কেন? চোখটা বড্ড করকর করছে কিনা তাই।

চোখ করকর করছে, না হাতী। তুমি কাঁদছ। বাবা তোমায় বকেছে।

না, না। আঁচিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়গে। রাত হয়েছে।

সাধারণতঃ বিশুর উৎপাত একটু বেশী, আজ কিন্তু বিশুর ব্যবহারে বিরক্তিকর কিছু খুঁজে পেল না সাবি।

না যাব না। আগে বল, কাল আমাকে চার আনা পয়সা দেবে?

দোব। এখন তুই আঁচাবি চল।

গলাটা ছেড়ে দিয়ে থপ্ করে বসে পড়ল বিশু।

তুমি আগে খেয়ে নাও, তোমার সঙ্গে আঁচিয়ে শুতে যাব।

তুই বড় জ্বালাস বিশু। এরকম করলে আমি তোদের বাড়ী থেকে চলে যাব।

এ ভয়টা বিশুকে প্রায়ই দেখাত সাবি। শুনে শুনে অনেকটা গা-সওয়া হয়ে এসেছিল বিশুর। কিন্তু আজ এই কথাতে তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল।

যাচ্ছি যাচ্ছি। আলোটা একটু ধর। বড্ড অন্ধকার বাইরে।

বিশুকে গল্প বলে ঘুম পড়িয়ে সাবির মনের ক্ষোভ মিটল না। রাত প্রায় বারটা, রমাপতি ফিরে এসে সাবিকে ডাকল। পোড়া তুবড়ির খোলের মত শূন্যগর্ভ মন নিয়ে কোন রকমে রান্নাঘরে গেল সাবি।

খাবারের থালা নিয়ে ঘরে এসে দেখল সাবি, নিজেই আসন পেতে জল নিয়ে বসে পড়েছে রমাপতি। ঠক্ করে থালাখানা নামিয়ে বাটি দুটো মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে চলে আসবে, রমাপতি তাকে ডাকল।

ছেলেপিলেগুনোকে আর এখানে রাখা চলে না সাবিত্রী। সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

ঘুমজড়ান চোখদুটো সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল সাবির। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার মত স্বর এল না গলায়।

রমাপতি আবার বলল, বিশেষ করে বিশুটা। ওর আর কিছু নেই।

অভিযোগের ভেতর দিয়ে বিশুর নামটা সাবির মনে আঘাত করল।

কেন? কি করল বিশু?

অকুণ্ঠস্বরে বলল রমাপতি, বাজারে বওয়াটে ছোঁড়াগুনোর সঙ্গে মিশে বিড়ি সিগারেট খেতে ধরেছে। ইস্কুল পালাতে শিখছে। আরও কত গুণ হচ্ছে, কে জানে?

সাবির আর সহ্য হল না, বলল, ইস্কুলে ত ভরতি হল এই সেদিন, এর মধ্যে গেলই বা কবে, আর পালালই বা কবে?

রমাপতি ঝাঁজিয়ে উঠে বলল, থাক্। তোমাকে আর ঢাকতে হবে না। আদর দিয়ে দিয়ে ওদের মাথা খাচ্ছ, আমার আর জানতে বাকী নেই।

জানবেন বৈ কি! এখন থেকে কত রকম জানবেন, কতরকম শুনবেন।

ঝনাৎ করে তরকারির বাটিটা মেঝেয় আছড়ে ফেলে চিৎকার করে বলল রমাপতি, কি বললে? কি বললে-তুমি?

অকম্পিত স্বরে উত্তর দিল সাবি, চেঁচামেচির দরকার নেই। সোজা করে বলে দিন আমাকে নিয়ে আর পোষাচ্ছে না। মিছি-মিছি পরের কথা শুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপান কি ভাল?

আমি কি সে কথা বলছি নাকি? রমাপতির স্বরটা একটু নেমে এল।

কেন বাজে কথা বলছেন ডাক্তারবাবু? আপনি যে কি আমার আর জানতে বাকী নেই। একটু আগে বলে গেলেন আমি না থাকলে ছেলেমেয়েগুনোর কি হত বলা যায় না ; ঘুরে এসেই বলছেন, আদর দিয়ে আমিই তাদের মাথা খাচ্ছি। আমি তুলের মেয়ে, চিরদিন এখানে থাকতে আসিনি। আজ আছি কাল চলে যেতেই হবে। কিন্তু পরের কথা শুনে মা-মরা কচি বাচ্চাগুনোর যে কি তুর্গতি আপনি করবেন, সেই তুঃখ্যুটাই আমার থেকে যাবে।

মুখখানা কাল করে হেসে উঠে বলল রমাপতি, আমার ছেলে-মেয়েদের তুঃখ্যু আমিই ভাবতে পারব। তবে কথা হচ্ছে, ওদের দিন কতক সরিয়ে রাখতে হচ্ছে, তা নইলে ওরাও শান্তি পাবে না…।

আর যিনি আসছেন তিনিও শান্তি পাবেন না। সেইটেই আসল কথা, তাই বলুন। তা অত শত দরকার কি? আমিই কাল চলে যাব। সহজভাবে কথাটা বলতে গিয়েও ঠিক বলতে পারল না সাবি। শেষের দিকটায় গলাটা কান্নায় বুজে এল।

চলে যাবার জন্মে যদি তৈরী হয়ে থাক, যেতে পার। তবে যদি অন্য কোনখানে গিয়ে থাকতে চাও, আমি বন্দোবস্ত করে দোব।

এই কথাটা বলবার জন্মেই তখন থেকে ঘুরঘুর করছিলেন, বলতে পারছিলেন না, আমার মুখ দিয়ে কথাটা আদায় করবেন বলে। এই করেই বিশুর মাকে বিদেয় করেছিলেন এখন বুঝতে পারছি। ভদ্দরনোক কিনা, লেখাপড়া জানেন। বুদ্ধির জোরে মানুষ চরিয়ে খান, আপনারা পারেন না এমন কাজ নেই।

তুমি রাগ করছ কেন সাবিত্রী, আমি ত তোমাকে যেতে বলিনি, আর ছেড়ে দোব এ কথাও বলিনি।

ও আমাকে রাখতে চাইছেন? না? পয়সা আছে বলে কি সকলকে ঐ রকম মনে করেন নাকি?

সাবির তীক্ষ্ণধার জিজ্ঞাসায় এতটুকু হয়ে গেল রমাপতি।

আহাহা, তুমি রাগ করছ কেন গো? কি মুশ্‌কিলেই না পড়লাম তোমাকে নিয়ে। আমি কি তাই বলছি?

আর আপনার বলাবলির দরকার নেই ডাক্তারবাবু, আর ভয় পাবারও দরকার নেই।

ভয় কেন সাবিত্রী, আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে, তাই…।

রমাপতির প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঝনাৎ করে দোরটা বন্ধ করে দিল সাবি। ঘরের দোর বন্ধ করে দিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল এ বাড়ীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ অবশিষ্ট রাতটুকু। কোথায় যাবে, কি করবে, এ সমস্ত চিন্তা মনের বাইরেই পড়ে ছিল। শুধু রমাপতির সংস্পর্শ তাকে ছাড়াতেই হবে। আজকের এই ব্যাপারের পর এখানে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। এখানে আর তার কোন অধিকার নেই, কোন অবলম্বন নেই।

খোকা কেঁদে উঠতেই সাবি তার কাছে সরে গেল। আদর করে ঘুম পাড়াতে গিয়ে দেখল, পেটটা তার একেবারে খালি। পেট ভরে দুধ পায় নি আজ ছেলেটা। সাবি উঠে আলো জ্বালল। স্পিরিট ল্যাম্প্ জ্বেলে জল গরম করে দুধ তৈরি করে খাওয়াল খোকাকে। মনে মনে হিসাব করে দেখল চার মাস সে এসেছে এখানে, তবুও মনে হয় এ ছেলে যেন তার গর্ভেই জন্মেছে। চেয়ে

দেখল মঞ্জু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বিশুর মাথাটা বালিশ থেকে নীচেয় গড়িয়ে পড়েছে। আহা ছেলেটার মাথায় বালিস নেই। উঠে এসে বিশুকে ঠিক করে শোয়াল সাবি। আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়বে, কিন্তু প্যাঁচ ঘোরাতে কেমন মায়া হতে লাগল। ছেলে-মেয়েদের দেখে আজ আর তার তৃপ্তি হচ্ছে না। খোকার গায়ে হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে মঞ্জু আর বিশুকে আদর করতে হঠাৎ তার মনে হল ঘুমন্ত ছেলেদের আদর করতে নেই, অকল্যাণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল দু চোখের জলে আঁচলটা তার ভিজে গেছে। চাবুক মেরে মনের দুর্দ্দমনীয় আবেগটা সংহত করল সাবি।

রাত আর বেশী ছিল না। ঘুমিয়ে পড়লে আর হয়ত তার খাওয়া হবে না। দিনের আলো আর ছেলেমেয়েদের মুখের মায়া তাকে আবার জড়িয়ে ধরবে। জোর করে ভুলিয়ে দেবে সব।

বিশুর ঘুম ভাঙ্গবার উপক্রম দেখেই তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিল সাবি। পাশ ফিরে শুয়ে বিশু আবার ঘুমুতে লাগল।

হঠাৎ সাবির মনে পড়ল তার কাছে চার আনা পয়সা চেয়েছিল বিশু। উঠে গিয়ে বাক্স খুলল সাবি। সংসার খরচের টাকাকড়ি তখনও তার হাতে। অন্ধকারে চুপি চুপি পুরো একটা টাকা এনে বিশুর বালিশের তলায় গুঁজে দিল। একবার ভাবল বিশুকে ডেকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু যদি জেগে উঠে সব জানতে পারে বিশু? না। এদের কাঁদিয়ে রেখে সে কিছুতেই যেতে পারবে না।

আস্তে আস্তে বিশুর জামার পকেট দুটোয় হাত দিয়ে দেখল সাবি। লাট্টু, মারবেল, পেন্সিলের ছোট বড় টুকরায় ভর্ত্তি রয়েছে পকেট দুটো। কই? বিড়ি-সিগারেটের চিহ্ন বলতেও কিছু

নেই। টাকাটা শেষ পর্য্যন্ত পকেটের মধ্যেই রেখে দিল সাবি। তারপর ঘরের শেষ দিকের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল অন্ধকার পাতলা হতে আরম্ভ করেছে। ঘর থেকে বাইরে এসে আস্তে আস্তে দোরটা বন্ধ করে দিল সাবি। আজ সে চোরের চেয়েও অসহায়।

অত্যন্ত সন্তর্পণে, ছেলেমেয়েরা না শুনতে পায়, ভয়ে ভয়ে রমাপতির দোরে শব্দ করল সাবি। রমাপতি উঠে এসে দোর খুলল। বিভ্রান্ত রমাপতির পায়ের কাছে ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা ফেলে দিয়ে বলল সাবি, তুয়োরটা দিয়ে নিন।

জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল রমাপতি, এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ ?

গলার স্বর যথাসম্ভব ছোট করে বলল সাবি, চলে যাচ্ছি। বলেই মুগ্ধ রমাপতির পায়ের গোড়ায় গড় হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল সাবি।

না, না। এরকম করে তোমার যাওয়া হতে পারে না। শুধু হাতে একলা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ?

ভয় নেই ডাক্তারবাবু। ভাববেন না। আমি নালিশও করব না, দশজনাকে সালিসিও মানব না। টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে হবে না।

ছি ছি, আমি কি তাই বলছি। কিন্তু টাকা ত তোমার···আর বলতে পারল না রমাপতি।

বলুন, বলুন, থামলেন কেন ? টাকা আমার পাওনা আছে। কাজ করিছি, তার মাইনে। তুর্দ্দমনীয় বাষ্পবেগটা সামলে নিয়ে আবার বলল সাবি, তা বেশ ত ! লোককে তাই বলবেন। টাকা-

কড়ি চুকিয়ে নিয়ে আমি চলে গেছি। এতেই যদি আপনার মনের দাগ মিলোয়, মান বাঁচে, তাই বলবেন।

রমাপতি আরও কিছু বলতে গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখল সাবি দোর খুলে বাইরের অন্ধকারে কোথায় মিশিয়ে গেল।

৪

চার মাস পরে ঘর ছেড়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়াল সাবি। চেয়ে দেখল সেদিনকার সেইপথ বিপরীত মুখে সেদিনকার ফেলে-আসা আশ্রয়ের দিকেই বিস্তৃতির ইঙ্গিত নিয়ে অন্ধকারে বিলীন হয়ে রয়েছে। অস্তগত শীতের মৃদুমন্দ আভাস তখনও জড়িয়ে ছিল ভোরের হাওয়ায়, সাবির সমস্ত শরীরের অবসাদের অনুভূতি যেন জল হয়ে এল। চার মাসের অপরিচয়ে আর ঝাপসা অন্ধকারে ভুলে-যাওয়া ছবির মত চোখে পড়ল চারপাশ। রাস্তার ওপর ঝুলেপড়া গাছের ডাল আর বাঁশের অগায় সুড়ঙ্গের মত সঙ্কুচিত দেখাচ্ছে পথ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে এগিয়ে চলল সাবি। পঞ্চুর বাড়ীর সামনে আসতেই পা দুটোর গতি আপনা হতেই একটু কমে গেল, কিন্তু মনটা ঠিক দাঁড়াতে চাইল না। আরও খানিকটা এগিয়েছে, পিছন থেকে কে ডাকল, কেডা র‍্যা? ইদিকেও নজর পড়েছে? কোন চুলোয় কিছু করবার জো নেই পাপেদের জ্বালায়?

সাবি চমকে উঠে বলল, কে? দিদিমা? এত রাত্তিরে কি করছ তুমি?

দয়া ঠিক চিনতে পারল না সাবিকে, অথচ উত্তর না দিলেও চলে না। কি আর করব? কুল্লে এই ঝুড়িটাক গোবর প্যালাম। মেলাকাল না মেলাকাল! রাজ্যির গরু ছাড়া, গোবর

কি পাবার জো আছে ? সব ভুঁই ঘেরা, খন্দ কুটো কমনে যে খাবে গরু ? গোবরের ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে সাবির কাছে সরে এল দয়াবুড়ী।

দিদিমা কি গোবর কুড়ুতে বেরিয়েছ ?

কেডা র‍্যা ? সাবি ? রাত পোয়ায় নি, কমনে বেইরিছিস ?

বাড়ী যাচ্ছি দিদিমা।

সাবির উত্তরটা শুনে আকাশপাতাল হাতড়াতে লাগল দয়াবুড়ী এবং পরক্ষণেই হয়ত কিছু খুঁজে পেল। গোবরের ঝুড়িটা পথসংলগ্ন আস্‌শেওড়ার জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে নিজের অপরিষ্কার হাত দিয়েই সাবির একখানা হাত খপ্ করে চেপে ধরে বলল, বুঝেছি। চ, আমার ঘরে চ।

'না' বলতে গিয়েও বলতে পারল না সাবি, সমস্ত শক্তি যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নে, নে। আর নজ্জা করতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেছে, আমার ও সব অনেক দেখা আছে রে। এখনও রাত আছে, ঘাটে পথে একা থাকতে নেই, চ।

অনেকদিন পরে স্নেহসজল মনের ছোঁয়া পেয়ে সাবির ঘা-খাওয়া অন্তরবৃত্তিগুলো একসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল।

দয়ার চালা ঘরখানা সেই বছরেই নতুন করে ছাওয়া হয়েছে। নতুন খড়ের সোনালী রং আর সামনের সদ্যপল্লবধরা গাবগাছটার নতুন সৌষ্ঠবটা অস্পষ্ট আলোতেই সাবির চোখে বড় সুন্দর ঠেকল।

চালাখানা ছাওয়ালে দিদিমা ? ঝকঝকে করে নিকান শুকন দাওয়ায় বসে জিজ্ঞাসা করল সাবি।

কি করি বল! রুঁইয়ে আর ঘুণে সব মাটি করে দিয়েল, অনেকগুনো ট্যাকা পড়ে গেল।

দেখি আমার চালাখানা কেমন আছে। এ কমাস ইদিকে আসিনি।

দেখিস্ নি? তার আর কিছু নেই। বাঁশ ব্যাখারিগুনো কেডা নিয়ে গিয়ে উনুন ধইরেছে। অবিশ্যি যদি নতুন করে ঘর তুলিস, সে কথা আলাদা।

ঘর তুলব বৈ কি দিদিমা, একেবারে পাকা ঘর তুলব।

অন্ধকারের মধ্যে সাবির মুখখানা ভাল দেখতে পেল না দয়া। তবুও মনে হল সাবির কথাগুনোর মধ্যে একটা রিক্ততার সুর যেন কান্নার মত বেজে উঠল।

তবে আর কমনে যাচ্ছিস সাবি? তার চেয়ে এইখেনেই থেকে যা। আমারও বয়স হচ্ছে, একলা মনিষ্যি ছত্রিশ কেত্তন আর পেরে উঠি নে।

সাবির চোখদুটো এইবার জলে ভরে উঠল। কিন্তু আজন্ম শুদ্ধ দয়াবুড়ীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে তার প্রবৃত্তি হল না।

তুমি আমাকে ভালবাস দিদিমা, তাই ও কথা বলছ। কিন্তু আমি কি করে তোমার কাছে থাকব বল ত?

পূবখোলা ঘরের দাওয়ায় সন্ধ্যঝরা দিনের আলোর ক্ষীণতম আভাসেই দয়ার নিষ্প্রভ চোখদুটো সাবির মুখখানায় কি খুঁজে বেড়াতে লাগল। দেখ্ সাবি। তোর মারে য্যাখন তোর বাপ বিয়ে করে এনেল, মোর ত্যাখন সব ঢুকে বুকে গিয়েছে, সোয়ামী পুত্তুর সব। কি করে থাকবি সেডা আমি বোঝব। তোর অত মাথ্যাব্যথা কেন?

কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধির মত পাপের সূক্ষ্ম বোধ নিয়ে তখনও লড়াই চলছিল সাবির মধ্যে, তাই স্পষ্ট কেঁদে ফেলে আবার বলল সাবি, দিদিমা গো! তুমি বুঝতে পারছ না আমি কি ?

দয়ার চোখমুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। সব বুঝি সাবি। কিন্তু মেলা বুঝে কি করব বল্ দিনি? ওরে সব্বনাশের যে এখনও অনেক বাকী। বল্, সেইডে হলে কি ভাল হবে?

নিরুত্তর সাবিকে শুনিয়ে শুনিয়ে আবার বলতে লাগল দয়াবুড়ী। বরাতদোষে মানুষ নষ্ট হয়, স্বভাবদোষে গোল্লায় যায়। ঘর নেই, দুয়োর নেই, রূপ যৈবন নিয়ে কমনে যাবি শুনি? যারা তোর ছেঁচতলা মাড়াতে ভরসা করত না, তারাই যে তোর চুলের মুঠি চেপে ধরবে। ওরে বাঘ-ভাল্লুকের চাইতেও সব্বনেশে মানুষ। যমের হাত থেকেও বাঁচবি, তবু দোপেয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবি নে। ছ মাস আগে হলে দয়ার কথাগুনো মাথা পেতে মেনে নিত সাবি, কিন্তু আজ পারল না। ক মাসের অভিজ্ঞতা তাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে।

তা নয় দিদিমা। নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে মানুষ যতদিন না দাঁড়াতে পারে, ততদিনই তারে এই দুর্গতি ভুগতে হয়। তা বলে মনে কর না, তোমার কাছ থেকে আমি চলে যেতে চাইছি। যদ্দিন তোমার কাছে থাকব, ঐ বিদ্যেটা তোমার কাছ থেকে শিখে নোব।

মনে হল কথাটা ভালই লাগল দয়ার। আম্‌মো ত সেই কথা বলছি লো। দুঃখ্যু ধান্দা কর, এইখেনে থাক। নিজের পায়ে ভরটর ওসব কিছু নয়। দুঃখ্যু করতে করতে শরীল শুকিয়ে য্যাখন আঁটি হয়ে যাবে, তবেই না বাঁচোয়া।

এতক্ষণে দিনের আলোয় স্পষ্ট করে সাবিকে দেখল দয়া। পরিষ্কার কাপড় জামা পরা, গলায় চিক চিক করছে একছড়া সোনার হার। ডান হাতের অনামিকায় একটা সোনার আংটি।

দয়ার মুখের দিকে চেয়ে সমস্ত বুঝে নিল সাবি। তাড়াতাড়ি গলা থেকে হারছড়াটা আর আঙ্গুলের আংটি খুলে দয়ার পায়ের গোড়ায় নামিয়ে দিয়ে বলল, আসবার সময় মনের ভুলে পরে চলে এইছি, খুলে দিতে মনে নেই।

দয়া ভাল বুঝল না।

কেন? তোরে ছ্যায় নি? কিন্তু সাবি আজ মিথ্যা বলবে না, তাই উত্তরে স্বীকারোক্তি থাকলেও সে ভয় পেল না। বলল, দিইছিল। তবে সবই যখন ছাড়লাম, এগুনো কেন আর সঙ্গে থাকে?

না। ফিইরে দিবি কেন? ওগুণো আমার কাছে থাক্। অবরে সবরে কাজে নাগবে তোর। আর কিছু ছ্যায় নি? ট্যাকা পয়সা?

দিতে চেয়েছিল, নেই নি।

বড় কাম করেছ। দাতাকন্ন একেবারে! নিজের পায়ে দ্যাঁড়াবি বলছিলি, কিসের জোরে দ্যাঁড়াবি? বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবার একটা ভঙ্গী করে দেখাল দয়া।

শান্তভাবেই উত্তর দিল সাবি, ও টাকা নিয়ে দাঁড়ানর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া ভাল দিদিমা।

কেন? গতরে খাটিস্ নি? তিন তিনডে ছেলেমেয়ে নিয়ে নাকানিচোবানি খাস্ নি? ট্যাকা নিবি নে, ভিক্ষে? ও সব আমি

শোনব না সাবি। আজই আমি গিয়ে গলায় গামছা দিয়ে ট্যাকা আদায় করে আনছি। উঃ। মেলামাইরি আর কি!

না, না দিদিমা। তোমার দুটি পায়ে পড়ে বলছি, অমন কাজ তুমি কর না। তা হলে সত্যি বলছি, তোমার ঘরে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

বাধা পেয়ে থেমে গেল দয়া। কিন্তু আজন্ম দুঃখের সঙ্গে লড়াই করা মন থেকে অর্থের প্রয়োজনীয়তাটা কিছুতেই তফাৎ করতে পারল না।

দূর হক্ গে যাক্ চেঁদে। যত ভাবি পরের হ্যাঙ্গা নিয়ে থাকব না, ততই গেরো এসে জোটে বরাতে। অসৈরণ সইতে পারি নে, তাই বলতে হয়। খেটে মরলি, ট্যাকা নেব না। যেন কত বড় নোক তুই, দানখয়রাৎ করে এলি। তা ইগুনোই বা মোরে দিচ্ছিস কেন। পায়ের গোড়ায় থুয়ে একটা পেন্নাম করে আয়।

এখন আর দিয়ে আসতে পারব না দিদিমা। তবে তখন যদি মনে পড়ত দিয়ে আসতাম।

তা দিতিস বৈ কি! পীরিত কত! দিবি নে?

গজ গজ করতে করতে ঘরে গিয়ে গহনাগুনো অপেক্ষাকৃত গোপন জায়গায় রেখে এল দয়া।

না ঘরে গিয়ে একটু হাত পা মেলিয়ে শুয়ে পড় গে। দুয়োরডা খিল দিয়ে নে। আল্‌গা থুস্ নে।

সাবি বলল, না দিদিমা। বেলা হল, আর শোব না।

যা, না। এখন কি করবি? বেলা হলে উঠে বাঁওড়ে একটা ডুব দিয়ে আসবি। এখন শো। রাতে ভাল ঘুমোস নি, চোখ-দুটো করমচার মত লাল হয়ে রয়েছে।

সাবির পক্ষে এ আশ্রয়টুকু দরকার ছিল। দয়ার ঘরে শুয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল সাবি। উৎক্ষিপ্ত হাউইয়ের অন্তর্জ্বালা নিয়ে ছিটকে এসেছে সে, কোথায় যাবে, কি করবে সবই ছিল অনিশ্চিত। আমকাঠের জানালার ফাঁক দিয়ে রোদের রেখা পড়ল বিছানায়। আজ আর তার কোন কাজ নেই। খোকা উঠেছে এতক্ষণ। মধু বিশুরও ঘুম ভেঙ্গেছে। ভূতের ভয় করলে মানুষ যেমন রামনাম করে সেইভাবেই চিন্তাটা চাপা দেবার চেষ্টা করল সাবি। কিসের এত মায়া! জোর করে নিজের মনের ঢাকাপড়া ক্ষতস্থানটা টিপে ধরল। মনে করল নিজের মেয়ের কথা। কতদিন সকালে উঠে খাবার জন্যে হাত পা আছড়েছে মেয়েটা। মা হয়েও সবদিন একটু বার্লির জলও দিতে পারেনি মুখে। বর্ষায়, শীতে, ঝড়ঝাপটার দিনে ভাঙ্গা চালাঘরের মধ্যে হিম হয়ে গেছে হাতপা, কি করতে পেরেছে সে? ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করেছে অতটুকু মেয়ে. বোঝেনি মায়ের সঙ্গতি; ঠিক যেমন ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে খোকা সাবিকে নিজের মা মনে করে। মনে মনে হার মানে সাবি। নিজের মেয়ের ভাবনার ভেতর দিয়েই চুপিসাড়ে এসে ঘোরাফেরা করে খোকা, মঞ্জু, বিশুর চিন্তা।

দিন তিনেকের মধ্যেই নিজস্ব সমাজজীবনের সঙ্গে খাসা মিশে গেল সাবি। এত সহজে যে সে আবার জাতের ভেতর স্থান পাবে, এ কল্পনা সে কোনদিন করেনি। এত দুঃখের মধ্যে এ সৌভাগ্যটা সে দয়াকে না জানিয়ে থাকতে পারল না।

দিদিমা! ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম, মা ভগবতীকে কেডা এক পাটনী খেয়াপার করে দিতে গিয়ে মায়ের পা ঠেকে গিয়ে নৌকোর সেঁউতিটা সোনা হয়ে গিছল। তুমিও সেইরকম পুণ্যবতী দিদিমা।

কথাটায় সুখ্যাতি থাকলেও ভাল রকম বোধগম্য হল না দয়ার।

কি বলেছিস্ বল্ তা তোদের কথা আমি ভাল বুঝতে পারি নে বাপু।

উচ্ছ্বাসটা কিছু বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায় একটু সামলে নিয়ে বলল সাবি, বড্ড ভয় হইছিল দিদিমা, কতজনা কত কথা বলবে। এখন দেখছি কেউ কিছুই করছে না। এ তোমার গুণ ছাড়া আর কি দিদিমা ?

আমার গুণ না হাতী। তুই যে ভদ্দরনোকের বাড়ীতে ছিলি, সস্ছন্দে দুটো খেতে পরতে পাচ্ছিলি, এই হিংসেতে সব ফেটে মরছিল। তুই ফিরে এইছিস দেখে তাদের সেই জ্বালাডা জুইড়েছে।

দয়ার এই অভিমতটা মোটেই ভাল লাগল না সাবির।

না দিদিমা। কেউ কেউ তা মনে করতে পারে, সবাই কি ঐ রকম ?

সব, সব, সম্মাই ঐ রকম। সব সামনে একরকম, পেছনে আর একরকম।

দয়ার কথার ভাবটা তবুও ঠিক নিতে পারল না সাবি। কোন রকমে প্রবীণার মতবাদের সঙ্গে একটা আপোষ করবার চেষ্টায় আবার বলল, মানলাম, বেশীর ভাগ লোকই ঐ রকম, তবুও কেউ কেউ ত ভালও আছে।

তুই কার কথা বলছিস, বল্ ত শুনি। কেডা তোর জন্যে দরদে ফেটে পড়ছে ? ভাবছিস, দিদিমা বুড়ো হয়েছে, কাউকেই আর বিশ্বেস করে না। ঘোর ঘোর থাকতে গোবর কুড়ুতে বেইরিছি, পঞ্চা ড্যাকরা মোরে বলে কি জানিস ? বলে তোর ঝুড়িতে কি আছে দ্যাখব। বললাম, আ মর! চেরডা কাল মেলাকালে রাত থাকতে

গোবর কুড়ুচ্ছি, কেডা না জানে? ছাখ, কার ধনদৌলত্ চুরি করে পালাচ্ছি। বলে, না, তা নয়। তোমারে ত বরাবর ভাল বলেই জানতাম কিন্তু যে পাপ তুমি ঘরে পুরে থুয়েছ, আর তোমারে বিশ্বেস হয় না। আমরা জানি কেন ডাক্তার ওরে বাড়ী থেকে সইরে থুয়েছে। পরে পরে কাজডা হাসিল করে আবার ঘরে নিয়ে গিয়ে পোরবে। বোঝ্, বোঝ্ সাবি, কারে তুই ভাল বলবি?

দিদিমা! আহতা নাগিনীর মত মাথা তুলল সাবি।

দয়া আর কথা বলতে পারল না।

আবার যখন দেখা হবে বল, সাবির যদি সে অবস্থা হয়, কারুর ভয়ে সে পেছিয়ে যাবে না। অজান্তি যদি ভুল করে থাকে, জেনেশুনে পাপ করবে না।

বিকেলের দিকে নিজের ঘরখানা দেখতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়ল সাবি।

চৈত্রের খরা দিনান্তে একহাঁটু ধুলো ভেঙ্গে দুর্গাপুরে নিজের বাড়ীতে এসে দাঁড়াল সাবি। দয়ার কথাই ঠিক। ভেঙ্গেপড়া চালাখানাকে খড় বাখারি সমেত প্রায় শেষ করেই এনেছে। দোর জানালার চিহ্নমাত্র নেই, চারদিকের দেওয়ালগুনো তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর স্তূপাকার আবর্জনা আর ছোট ছোট আগাছার মধ্যে ভাঙ্গা তক্তাপোশটা গৃহস্থালির শেষ চিহ্নের মত তখনও পড়ে আছে। ঝিরঝিরে বাতাসে তখন স্নিগ্ধতার আমেজ এসে মিশেছে। ঘরখানা আবরণশূন্য হয়ে পড়ায় চারদিক বেশ ফাঁকা দেখাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে ঘরখানা, তার আশপাশ সমস্ত দেখতে লাগল সাবি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

পূর্ণিমার মেলা মিটে গেল। কিন্তু অন্যান্য বছরের মত গ্রামের নাড়ীতে স্বাভাবিক গতি ফিরল না। জুয়া আর যাত্রার সমালোচনার ধারাটা মামুলি প্রথায় দু চার দিন চলেই আরও বেশী মুখরোচক আলোচনায় এসে মিশে গেল। বাজার থেকে স্নানের ঘাট, তারপর পাড়ার বৈঠক দেখতে দেখতে গুলজার হয়ে উঠল।

সপরিবারে দেশোকে রওনা করে দিয়ে দুদিন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল পঞ্চু। ওপরপড়া আত্মীয়তার চাপে কলের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই কদিন। নিজের চোখকান পর্য্যন্ত পরনির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। বউ, শালী আর দেশো যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছে। সাবির কথা নিয়ে টীকাটিপ্পনী সমেত বেশ একটা গল্প খাড়া করে দেখিয়েছে, বিশেষ কোন নৈসর্গিক কারণে রমাপতির বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব হওয়াতেই দয়ার বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে সাবি।

অভয় মোড়লের আখের খেতে কিছুদিন কাজ করে দুপয়সা উপার্জ্জন করল পঞ্চু। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ, মাঝখানে ঘণ্টাদুই খাবার ছুটি। নিজে সঙ্গে থেকে খেটে কাজ আদায় করে নেয় অভয় মোড়ল। মজুরিও দেয় সঙ্গে সঙ্গে। বাকী বকেয়া নেই। সংসার খরচ চালিয়েও ছ সাত টাকার ওপর হাতে জমে গেল পঞ্চুর। হিসাব করে দেখল এক সপ্তাহ অবসর ভোগ করবার মত পুঁজি তার টেঁকে এসে জমেছে। অতএব সেদিন বেলা আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠল না পঞ্চু।

কাজে যাবা না ? মোড়লদের আখ মাড়া হয়ে গ্যাল ? পঞ্চুর বউ জিজ্ঞাসা করল।

হুঁ। বলে আড়ামোড়া ভেঙ্গে পাশ ফিরে শুল পঞ্চু।

মিনিট পাঁচেকও হয়নি, বাড়ীর বাইরে থেকে গম্ভীরগলার ডাক এল। পঞ্চা ! পঞ্চা বাড়ী আছিস ?

দাওয়া থেকে পঞ্চুর বউ ঘরে আসতেই তার কাপড়ের আঁচল ধরে হিড় হিড় করে টেনে কাছে আনল পঞ্চু। ফিস্ ফিস্ করে বলল, মোড়ল এয়েছে। বল্, বড্ড জ্বর, গায়ে হাতে কাঁকালে বড্ড বেদনা। উঠতে পারছে না।

বউ একটু আপত্তি করতেই তার গায়ে একটা প্রচণ্ড চিমটি কেটে বলল পঞ্চু, যা বললাম বল।

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে পঞ্চুর কথাগুনোর হুবহু পুনরাবৃত্তি করল বউ।

তাই নাকি ? গায়ে গতরে ব্যথা ! ভাল কথা নয়। সময়টা বড্ড অন্‌টাইম। বলে ঝনাৎ করে দাওয়ার ওপর দুটো টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিল অভয় মোড়ল।

আজ জ্বর না ছাড়ে, কাল রমাপতি বাবুকে যেন খবর দেওয়া হয়। তাই ত বলি, পঞ্চা অ্যাব্‌সেণ্ট কেন ? আপন মনে বকতে বকতে চলে গেল অভয় মোড়ল।

টাকা দুটো কাপড়ের আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে ঘরে এল পঞ্চুর বউ।

ঘরে এসে পঞ্চুর গায়ে ঢলে পড়ে বলল, মোড়লডা কি বোকা। হি হি হি ! পুরুষমানুষকে বোকা বানাতে বড্ড মজা লাগে, না রে ? খুব চালাক হইছিস আজকাল।

বা রে ! তুমিই ত বললে বলতে ! আর আমার দোষ হল ?

আমি যদি তোরে গঙ্গায় ডুবে মরতে বলি, মরবি ?

পঞ্চুর বউয়ের মুখের হাসিটা এইবার নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

পঞ্চু আবার বলল, চুপ করে থাকলেই হত। ও ত আর ঘরে ঢুকে দেখত না।

আঁচলে বাঁধা টাকাটা দেখিয়ে বলল পঞ্চুর বউ, তা দেখত না সত্যি। এটাও তাহলে আসত না।

ঐটের জন্যে সব করতে পারিস্, না ?

টাকাদুটো আঁচল থেকে খুলে পঞ্চুর সামনে ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেল পঞ্চুর বউ।

পঞ্চুর আর ঘুম হল না। আত্মীয়কুটুম্বশূন্য বাড়ীতে একক বাস করার আনন্দ ষোল আনা উপভোগ করবে মনে করেই স্বেচ্ছায় সে আজ কাজ কামাই করেছে। কিন্তু অভয় মোড়ালকে উপলক্ষ্য করে বউয়ের স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা-শরমটা যে এত সহজে অনাবৃত হয়ে পড়তে পারে, নিজে হুকুম দিলেও বউয়ের ব্যবহারের একটা সামঞ্জস্য-হীনতা তার মনটাকে খোঁচার পর খোঁচা দিয়ে একেবারে বিস্বাদ করে তুলল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন বউ আর ঘরে এল না, হাই তুলে বাইরে এসে দাঁড়াল পঞ্চু। অনুমানে বুঝল, রান্নাঘরে কোন কাজ করছে বউ, এবং একটু পরেই দেখল, একথালা পান্তা ভাত এনে বড় ঘরের দাওয়ায় নামিয়ে দিয়েই আবার সে রান্নাঘরে চলে গেল। ভাত খেতে খেতে বউকে ডাকল পঞ্চু। কিন্তু দু'তিন ডাকেও আসা ত দূরের কথা, যখন একটা সাড়া পর্য্যন্ত মিলল না, পঞ্চুর আর ধৈর্য্য থাকল না।

কি ? কথা কানে যাচ্ছে না ? নবাবনন্দিনীর কি মান ক্ষয়ে গেল নাকি ?

পঞ্চুর বউ বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বলল, দেখ। মুখ সেমলে কথা বল বলছি, কথায় কথায় বাপ তুল না। তারা তোমার খায়ও না, পরেও না। ভাতের থালা নিঃশেষ করে তখন ঘটি হাতে দাঁড়িয়ে উঠেছে পঞ্চু। সেই অবস্থায় ঘটিসমেত ডান হাতখানা উঁচু করে যাত্রার দলের অভিনেতার মত ভঙ্গি করে বলল, তোর সামনে মুখ সেমলে কথা বলব না! তুই কি এখন কম লোক? তুই একটা জেণ্টেল্‌ম্যান্ লোক, তুই একটা আদমি লোক!

পঞ্চুর এই অর্থহীন কথাগুনোর মধ্যে একটা রুদ্ধ আক্রোশের অন্তর্ব্বাহী জ্বালা ছিল। মরণ আর কি! যেন সং। বলে মুখখানা ঘুরিয়ে পিছনে ফিরে দাঁড়াল পঞ্চুর বউ।

পঞ্চু আর কোন কথা বলল না। বাঁশের আল্‌না থেকে গামছা-খানা টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রুক্ষ ধূসর চৈত্রের দমকা বাতাসে সকালের ছায়াঘন স্নিগ্ধতা তখনও জড়িয়ে ছিল। ছোট ছোট সুঁড়ীপথ, দুধারে রাংচিতা, আসসেওড়া আর ভাঁটবন। থোকা থোকা ঘেঁটুফুলের চার পাশে মৌমাছি আর ভোমরার আনাগোনা। পঞ্চুর আশৈশব স্মৃতির চিরসঙ্গী এ সব। পঞ্চুর মনের খোঁচখাঁচ কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে ভাবল, আর কিছুক্ষণ ঘুরে বাড়ী ফিরে যাবে। ফল, ফুল, লতাপাতার মধ্যে যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দেরই হুবহু ছবি আছে স্ত্রীলোকের রূপলাবণ্যের মধ্যে, তাদের মিষ্টি হাসির মধ্যে, তাদের প্রাণখোলা আলাপের মধ্যে। কেন সে সকালবেলা মিছি-মিছি ঝগড়া করল বউয়ের সঙ্গে। এমনও ত হতে পারে, তাকে সমস্ত দিনটা কাছে পাবে বলেই সে অভয় মোড়লের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়েছিল।

পায়ে পায়ে তখনও পথ চলছে পঞ্চু। ছোট্ট একটা আগাছা ভরা ঢিবি পার হলেই খানিকটা খোলা জায়গা। এ সমস্ত জায়গাটা এশোর। চার-পাঁচখানা ছোটয় বড়য় চালাঘর মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রশস্ত উঠান। বাড়ীর সীমানার পর প্রকাণ্ড একটা গাব গাছের বিস্তীর্ণ ছায়াঢাকা এলাকা। একগাছ কচি পাতার অরুণিমার ওপর দিয়ে রোদ পিছলে পড়ছে। বাঁশের ছোট একটা গোঁজের ভেতর দিয়ে বড় বড় কঞ্চি চালিয়ে দুভাগ করে রাখছে এশো। ঝুড়ি নয়ত চারাগাছের ঘেরা তৈরী হবে। দু-তিন জন পাড়াপড়শী জুটিয়ে চলনসই আড্ডাও জমিয়েছে। তামাকের সঙ্গে আলোচনাও কি একটা চলছিল, পঞ্চুকে দেখে যেন থেমে গেল।

কোন রকম আহ্বান না পেয়েও দলের ভেতর এসে বসল পঞ্চু। কলকেশুদ্ধ হুঁকোটা তার হাতে তুলে দিয়ে প্রথম কথা পাড়ল এশো, পঞ্চা। অনেকদিন পরে যে রে! তারপর! খবর-টবর সব ভাল ত?

এই চলে যাচ্ছে একরকম। তোমরা ভাল ত এশো দা?

কথাটা বলে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখল পঞ্চু, সবাই যেন অন্যদিকে মুখগুনো ফিরিয়ে রয়েছে।

মোটা একটা কঞ্চির অগ্রভাগটার মাঝামাঝি দায়ের হুলটা হাতের জোরে বসিয়ে দিয়ে বলল এশো, এই না-মরে বেঁচে আছি কোনরকমে। তারপর! দেশের খবরাখবর বল্, শুনি। তোরা সব বড় মহলে বেড়াস, অনেক খবর রাখিস।

এ ধরনের আলোচনায় বরাবর একটা বিতৃষ্ণা ছিল পঞ্চুর। হুঁকো থেকে মুখটা তুলে সে বলল, কে জানে ভাই? নিজের খবর কেডা রাখে তার ঠিক নেই, তার পরের খবর।

এশো থেকে আরম্ভ করে সকলেই সঙ্গে সঙ্গে জোরালো কৌতূহলে উন্মুখ হয়ে উঠল। ছোট ছোট চোখদুটো যথাসম্ভব বড় করে জিজ্ঞাসা করল এশো, কেন বল্ দিনি ? আর কিছু দেখেছিস্ নাকি ?

পঞ্চুর সরল মনে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল। কিন্তু এক এশো ছাড়া বর্ত্তমান কজনের সামনে কোন কথা তুলতে তার প্রবৃত্তি হল না। চতুর এশো পঞ্চুর মনের ভাব বুঝল ও তাকে বসতে বলে দলের একজনকে বলল, নরে, যা ত ভাই। ভুঁইয়ে মুসুরগুনো গাদা মারা পড়ে রয়েছে, গোরুতে খাচ্ছে কিনা দেখ্ গে।

সবাই চলে গেলে এশো বল্তে লাগল, হেলার বউডোরে বাড়ীতে ঢুকতে দিস কেন বল্ ত ? য্যাখন খুড়োখুড়ী বেঁচে ছিল, ত্যাখন ত কখনও ভুলেও তোদের বাড়ী মাড়াত না।

পঞ্চুর মনের ভার নেমে গেল, ও একগাল হেসে বলল, বাড়ীতে একলা থাকে, যদি যায়, না বলতে পারে না।

ও না বলতে পারে, তুই ত পারিস। ও না হয় মেয়েনোক, তুই ত পুরুষবাচ্চা, কাছা এঁটে কাপড় পরিস।

কেন বল ত এশো দা ? আমার বাড়ীতে কেডা যায় আসে তা নিয়ে পাড়ার লোকের এত মাথাব্যথা কিসের ?

এশো কিন্তু রাগ করল না, তর্কও বাড়াল না। গলার আওয়াজ যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলল, তোরে হতে দেখিছি পঞ্চা, আর চন্দরখুড়োরেও নিজের বাপখুড়োর মতনই দেখিছি। তোদের বাড়ীর এজ্জৎ নিয়ে, সত্যি হক্, মিথ্যে হক্, কেউ যদি কোন কথা বলে, আমার গায় নাগে। পঞ্চু বলল, তোমায় আমি কিছু বলিনি এশো দা। কিন্তু লোকে কেন আমাদের পেছনে নাগে ?

তার আগে নিজের ঘর সামলান ভাল নয় কি ? নোকে বলবে

কেন? বুড়ো হয়ে মরে গ্যাল খুড়ী, তোর মা, কই, কোন শালা ত কোনদিন কিছু বলতে পারল না।

মায়ের প্রশংসায় বুকটা উদ্বেল হয়ে উঠলেও এই এশোকে নিয়ে তার বাপের মনের কুৎসিত সন্দেহের স্মৃতিটা পঞ্চুর মনটাকে স্ত্রীজাতির স্বপক্ষে একেবারে দ্বিধাশূন্য করে তুলল।

পঞ্চু বলল, দেখ, এশো দা। ও যে যা বলে বলুক। নিজের চোখে যতক্ষণ কিছু না দেখছ, ততক্ষণ কাউকে মন্দ বলতে নেই। তোমার চাইতে আমার বয়স অনেক কম, তবুও আমার এই কথাটা তুমি মনে রেখ। বলেই মাটির ওপর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে তুটো গভীর রেখা টানল পঞ্চু। এশোর কালো কালো ঠোঁট তুটোয় হাসি ফুটে উঠল।

তোর মতন য্যাখন বয়েস ছেল পঞ্চা, আমরাও ওরকম ভেবেছি। বুকে থুতু দিয়ে বেড়িইছি, কোন স্মুমুন্দির কথা কাণে তুলিনি। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। পাঁচজনার কথা শুনলে ভয় নাগে।

তা হলে এখন আর তোমার সাহস নেই, তাই ভয় করে। পঞ্চু বলল।

আরে সাহস নিয়ে কি আর ধুয়ে খাব? দেখে দেখে যে ঘেন্না ধরে গ্যাল! বউ ঝি নিয়ে ত ঘর করে গাঁশুদ্ধু নোক, কডা ভাল আছে বল্ দিনি? বিশ বছরের ঘরকরা তারা বাগ্‌দীর বউ, সেদিন অত বড় ছেলেডা গ্যাল, কি করল বল দিনি?

পঞ্চু বলল, তারা বাগ্‌দী? যার নাম করলে হাঁড়ি ফাটে! তার সঙ্গে কেউ চেরকাল বনিয়ে চলতে পারে?

ও সেইজন্যে বিয়েকরা ছেলেপিলের মা বউ রোগা সোয়ামী

ফেলে বাপের বাড়ী চলে যাবে ? তোর দেখছি খুব বিদ্যে হচ্ছে দিন দিন। তবেই তুমি ঘর সংসার করেছ ! ওরে আমরা পুরুষরা কাছাখোলা ঢিলেমারা বলেই ত মাগীণগুনো যা খুশি তাই করে বেড়ায়। হাটে বাজারে যেখানে ইচ্ছে যায়, লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কিছু করে বেড়ায়। তাই বলছি, উড়ুখ্যু পাখীর ড্যানা গজাতে গজাতেই ভেঙ্গে দিতে হয়, বুঝলি ?

পঞ্চুর মনের পাঁক বারবার নাড়া পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত ঘুলিয়ে উঠল। মায়ের আমরণ পবিত্রতার স্মৃতিচিহ্নের ওপর ডালপালা সমেত গজিয়ে উঠল কলঙ্কিত কাহিনীর একটা গোটা অধ্যায়, সাবির গৃহত্যাগ, পূর্ণিমার মেলায় তার নিজের বউয়ের সন্দেহজনক আচরণ, হেলার বউয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, এমন কি কিছুক্ষণ আগে অভয় মোড়লের মত লোকের সামনে আড়াল থেকে কথা বলা।

এশোর গা ঘেঁষে এসে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু, কি কথা তুমি শুনেছ এশো দা, সত্যি করে বল্‌বা ?

এশোর পুরু পুরু ঠোঁট আর রেখাকুঞ্চিত মুখপ্রদেশ থেকে গাম্ভীর্য্যের সমস্ত চিহ্ন সরে গেল। এশো বলল, ছ্যাখ্ ভাই, কানে আসছে অনেক কিছু, কিন্তু সব আমিও বিশ্বেস করি নে। সব কথা শোনালে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে, শুধু হেলার বোয়ের সঙ্গে বউকে আর মিশতে দিবি নে। ও মাগীর মতলব ভাল নয়। পয়সার জন্যে ওরা দুই স্ত্রী পুরুষে পারে না হেন কাম নেই।

তা হলেও বললা কি শুনোছ ?

কেন তুই শুনিস নি পূন্নিমের মেলায় যাত্রা শুনতে গিয়ে হেলার বউ আর একটা কেডারে মাতালে ধরেল ?

পঞ্চু একটু চমকে উঠে বলল, শুনিছি। তবে হেলার বউরে ধরেছে তা ত শুনিনি। আর একজনা কেডা?

সেডা ঠিক শুনিনি। মেলার সময় ঘরে ঘরে কুটুম আসে। বিদিশী নোকও হতে পারে।

এ সম্বন্ধে আর বেশী জানতে সাহস হল না পঞ্চুর। শুধু দু একবার আড়চোখে দেখে নিল, এশোর চোখমুখের ফাঁকে কোন-খানে হাসির মত কিছু লুকিয়ে আছে কি না।

এর পর অনেকক্ষণ বসে রইল পঞ্চু, কিন্তু কেউ আর কোন কথা বলল না। চেরা কঞ্চিগুনো পরিপাটি করে চেঁচে পাশে সাজিয়ে রাখতে লাগল এশো।

পঞ্চু উঠে চলে গেল।

২

বাড়ী ফিরে এসে শুয়ে পড়ল পঞ্চু। বউ দু একবার ঘরে এল, আবার চলে গেল। কেউ কোন কথা বলল না। বেলা তখন বাড়ছে। আগুনের হল্কার মত দমকা বাতাসে ধুলোবালি, খড়-কুটো উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। অবিরাম রোদের ঝাঁজে ঝিমিয়ে-পড়া পাখীর ডাক ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। পঞ্চুর মনের এলো-মেলো চিন্তা চৈত্রের ঘূর্ণি হাওয়ার মত কৌতুকপুর আর দুর্গাপুরের অতীত আর বর্ত্তমানের পদচিহ্ন ধরে কত কি খুঁজে বেড়াতে লাগল। কত অনাচারের মসীলিপ্ত পুরাবৃত্তের সঙ্গে কত একনিষ্ঠ প্রেম ভাল-বাসার দৃষ্টান্ত নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোলাপাড়া করে এক ফাঁকে কখন ঘুমিয়ে পড়ল পঞ্চু।

পঞ্চু ঠাকুরপো ! ও পঞ্চু ঠাকুরপো ! ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখল পঞ্চু হেলার বউ তার গায় হাত দিয়ে ডাকছে। বিতৃষ্ণায়, রাগে সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠল পঞ্চুর, কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না।

নক্ষ্মীর ওপর রাগ করতে নেই ভাই। এ ঘরে তুমি শুয়ে আছ, ও ঘরে সরি ঘুমুচ্ছে। পঞ্চুর বউকে আজকাল নাম ধরে ডাকে হেলার বউ।

শেষ পর্য্যন্ত এ ঘনিষ্ঠতারও মর্য্যাদা রাখল না পঞ্চু। জোর করে সংকোচ কাটিয়ে বলল, তোমারে কেডা দালালি করতে ডেকেছে বল ত ? আমরা খাই, না খাই, যা করি তোমার কি ?

হেলার বউ মোটেই ভয় পেল না, এমন কি লজ্জা পেয়েছে বলেও মনে হল না। জোর করে পঞ্চুর ডান হাতটায় একটা টান দিয়ে বলল, আগো ছুটো খেয়ে ন্যাও ঠাকুরপো, তারপর যত পার অপমান কর, আমি দেঁড়িয়ে শোনব না। সঙ্গে সঙ্গে দোরের বাইরে বোধ হয় পঞ্চুর বউকেই উদ্দেশ্য করে বলল, আর তোরেও বলি সরি, পুরুষ-মানুষকে না খেতে দিয়ে নিজে দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকলে মেয়ে মান্‌ষের গোমর বাড়ে না। নাথি ঝাঁ্যাটা খেয়েও সোয়ামীরে খাওয়াতে হয়।

স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধ সম্বন্ধের ওপর এতখানি প্রলেপ মাখাতে দেখেও পঞ্চুর মন ঠিক সহজ হল না। কিন্তু ক্ষিদে চেপে বেশীক্ষণ থাকা আর তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। পঞ্চু উঠে দাঁড়াতেই হেলার বউ তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে পঞ্চুর বউকে জোর করে টেনে তুলল ও তাকে ভাত বাড়তে বলে আবার পঞ্চুর কাছে এসে বলল, মুখ হাতগুনো ধুয়ে ন্যাও ভাই। পিত্তি পড়ে শরীল ঝান্‌ হয়ে গিয়েছে। আর যে গরম পড়েছে !

পঞ্চু খেতে বসতেই, হেলার বউ আবার বলল, এইবার তোমরা য্যাত পার ঝগড়া কর, আমি চললাম।

ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে বলল পঞ্চু, একটু দ্যাঁড়াও বউ। কথা আছে।

হেলার বউ ফিরে দাঁড়াল।

আমতা আমতা করে বলল পঞ্চু, মানে, কথা হচ্ছে এই,......

হেলার বউ বলল, নজ্জা কি ঠাকুরপো, বল না কি কথা ?

পঞ্চু বলল, পূন্নিমের মেলায় যাত্রা শুনতে গিয়ে কি হয়েছিল বল্‌বা ?

কেন বলব না ? সরি তোমায় কিছু বলেনি ? সরি কোন কিছু বলবার আগেই নিজে বর্ণনাটা পেড়ে বসল হেলার বউ।

তোমরা পুরুষমানুষ থাকতেও যদি নোকে রাস্তাঘাটে বেহায়াপনা করে, মদ খেয়ে ঢলিয়ে বেড়ায়, আমাদের কি দোষ বল ত ? গান শোনতে গিয়ে বারালীঘরের পেছনে দেঁড়িয়েছি. তোমার দাদা এসে আসরে বসিয়ে দেবে, দেখি চারপাঁচজনা, কি আরও কেডা কেডা একটা মেয়েলোক নিয়ে রঙ্গরস করছে। আমাদের দেখেই কেডা কমনে হাওয়া হয়ে গ্যাল। এই ত কথা ভাই, এইবার তুমি কি শুনেছ বল দিনি ?

তবে যে শোনলাম, তোমার নাকি কেডা হাত ধরেছিল ?

খিল খিল করে হেসে উঠে হেলার বউ বলল, আমার হাত ধরে অ্যামন নোক আজও এ গাঁয়ে জরমায় নি। তোমার ত গায়ে অনেক জোর ঠাকুরপো, একদিন ধরে দেখ না কি হয় ? বলে হাসতে হাসতে হেলার বউ চলে গেল।

হেলার বউ চলে যেতেই ফোঁস্‌ করে বলে উঠল পঞ্চুর বউ, কোন্‌

ভালখাগীর বেটার কাছে এ সব শুনে এলে বল ত? এই করতেই বুঝি বাইরে যাও! আমার নিন্দে কর আর শোন।

পঞ্চু বলল, তোর এতে গায়ে নাগল কেন, তুই ছিলি নাকি ওর মধ্যে?

থাকাথাকি আবার কি? যা হয়েছে সব ত শোনলে।

ওর কথা সব আমার বিশ্বেস হয় না। হাসতে হাসতে বলল পঞ্চু।

তা হবে কেন? আমারে যে জনা ভালবাসে তার কথা ত তোমার মনে নাগবে না।

তা নয় রে, তা নয়। কথাটা যদি পেরথম্ তোর মুখ থেকে শুনতাম, তা হলে বিশ্বেস হত। বল্, তোর আগে বলা উচিত ছিল কি না?

তোমার শোনবার মন ছিল যে বলব? যে কদিন দিদিরা ছেল ভাল করে একটা কথাও বল নি তুমি। তবু তারা একটা পয়সাও তোমার খায়নি। আমাদের অবধি খেইয়ে গিয়েছে, কাপড়ে জিনিসে কত কি দিয়ে গিয়েছে।

কথাগুনোর মধ্যে পঞ্চুকে ছোট করবার ইচ্ছা না থাকলেও, পিতৃকুলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু নিজে আকণ্ঠ আহার করে অভুক্ত স্ত্রীর সঙ্গে আর ঝগড়া করতে ইচ্ছা হল না পঞ্চুর। পঞ্চু বলল, কে বলল কথা কইনি? কুটুম মান্সের সঙ্গে যা যা করা দরকার সব করিছি।

পঞ্চুর থালায় নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে বলল পঞ্চুর বউ, আমি ত বলিনি তুমি তাদের সঙ্গে কথা কওনি। আমারে দেখে তুমি ফর্‌কে ফর্‌কে বেইড়েছ। তোমারে কখন এ সব কথা বলব?

এতক্ষণে বউয়ের অনুযোগের সুরটা মন্দ লাগল না পঞ্চুর। বউকে খেতে বসতে বলে সে তামাক সাজতে চলে গেল। দাওয়ায় বসে তামাক সাজতে সাজতে শুনল, খেতে খেতে অনর্গল বকে যাচ্ছে বউ। কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে গুটি গুটি রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল পঞ্চু। শুনল, বউ বলছে, রীত ব্যাভার মনে করলে ছেন্দা আসে না যে মুখ দেখি। মুই যাই মেয়ে তাই সয়ে পড়ে থাকি, অন্য কেডা হলে ছ্যাখাত মজা।

পঞ্চু ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে বলল, পেটে ভাত পড়ে কি মাথা গরম হচ্ছে না কি রে?

মাথা গরম হবে কেন? তোমার গুণের কথা বলছি।

এইবার একটু ঘুরিয়ে কথা বলল পঞ্চু, তা বলবি বৈ কি। যে সব লোকের সঙ্গে মিশছিস্। আরও কত বলবি।

খেতে বসে স্বামীর সম্মুখীন হওয়ায় বাঁ হাত দিয়ে মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে বলল পঞ্চুর বউ, তুমি ত খুব ভাল নোকের সঙ্গে মিশছ, অ্যাদ্দিন পাচ্ছিলে না বলেত ত ফেটে মর্‌ছিলে।

পঞ্চু বলল, এ কথা কেডা বোঝাচ্ছে রে? হেলার বউ না হেলা?

তাদের বয়ে গেছে তোমার কথায় থাকতে।

ও। তারা বুঝি শুধু তোর কথা নিয়েই থাকে? তাই তাদের সঙ্গে এত মেলামেশা, খাবারের দোকানে গায় পড়াপড়ি। যাত্রার আসরে বসিয়ে দেবে, সেও হেলা। হেলা তোর ভবপারের কাণ্ডারী, একেবারে কেষ্ট ঠাকুরটি, শুধু বাঁশী নিলেই হয়! বলতে বলতে স্বভাবসিদ্ধ উগ্র মেজাজের মাত্রা চড়তে লাগল পঞ্চুর।

পঞ্চুর বউ কিন্তু ঝগড়ার দিক দিয়ে গেল না। কোন কথা না

বলে এঁটো বাসনগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগল। অভিযোগের কোন সাফাই না পেয়ে ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগল পঞ্চু। ক্ষীণ আলোর সঞ্চরমান শিখায় বউয়ের মুখখানা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করতেই মনে হল চোখ দিয়ে যেন তার জল গড়িয়ে পড়ছে।

পঞ্চু বলল, কথায় কথায় কাঁদিস কেন বল্ ত? তুই কত কথা বলিস, কই, আমি ত কাঁদি নে।

পঞ্চুর বউ বাইরে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পঞ্চুকে বলল, এ ঘর থেকে যাও। ঘরতুয়োর মুক্ত করতে হবে, সর।

রাত্রে তুজনে পাশাপাশি শুয়ে অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। প্রতীক্ষা করতে করতে মনে হল পঞ্চুর জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত-গুলো যেন জলের মত গলে বেরিয়ে যাচ্ছে তার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। গাছপালা বাঁশঝাড়ের ভেতর সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে। রুদ্ধমুখ তুঃখের হা-হুতাশের মত অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মধ্যে। পঞ্চু আর চুপ করে থাকতে পারল না।

চল্, আমরা এ দেশ থেকে কোথাও চলে যাই।

কি বলছ? পঞ্চুর বউ চমকে উঠে পঞ্চুর কাছে সরে এল।

পঞ্চু আবার বলল, অন্য কোন ঠাঁয় গিয়ে ঘর বাঁধি চল্। এ শালার দেশে আর থাকব না।

তুটো কথা। রাতের ঘুম ফাঁকি দিয়ে সামান্য একটা সংকল্প, শ্লথ, হয়ত অনিশ্চিত। তবুও তার যাতুমন্ত্রে বহুদিনের ভাঙ্গা মন এক মুহূর্ত্তে জুড়ে গেল তুজনের।

তাই চল। কমনে যাবা? একটু চুপ করে থেকে আবার বলল পঞ্চুর বউ, কিন্তু বাপ পিতোমোর ভিটে...

আরে থো থো তোর বাপ পিতোমোর ভিটে। কেবল হিংসে আর হিংসে। এখানকারের লোকের জন্য আবার মায়া?

আমি বলছিলাম কি!...পঞ্চুর বউ থেমে গেল।

কি?

বীজপুর গেলে হয় না? বীজপুর বউয়ের বাপের বাড়ীর দেশ।

তা হলে আর এখেনে থাকতে কি দোষ?

তবে যেখানে খুশি চল। তোমারে সঙ্গে করে বনে যেতেও ভয় করে না।

বলিস কি রে? একেবারে সীতার মত!

এত বড় উপমাটা এক কথায় সহ্য করতে পারল না পঞ্চুর বউ।

চুপ কর। ঠাকুরদেবতার নাম নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।

বা রে! ঠাট্টা আবার কখন করলাম? সীতার মত সোয়ামীর সঙ্গে বনে যেতে চাইছিস, তাই বলছি।

আহা! তুমিও ত রামের মত বনে যাব বলছ, বলেই পঞ্চুর মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে লাগল পঞ্চুর বউ?

তুই আমায় রামচন্দর বললি তাতে দোষ হয় না? তা হলে তোরেও আমি সীতা বলব।

না। আমি বলতে দোব না। বল দিনি? বলে পঞ্চুর মুখখানা জোর করে ডান হাতের তলদেশ দিয়ে চেপে ধরল পঞ্চুর বউ। বল, বল না দেখি। বাইরে তখন বিশ্বচরাচর আচ্ছন্ন করে ঘুমজড়ানো প্রশান্তির সঙ্গে একটানা ঝোড়ো হাওয়া বয়েই চলতে লাগল।

৩

পল্লীজীবনের উৎসবপঞ্জীর শেষ উৎসবের ঘোষণা বয়ে আনল চৈত্রের মাঝামাঝি দিনগুলো। গাজনের ঢাক বেজে উঠল। বছরের শেষ উৎসব। ছুর্গোৎসবের চেয়ে আরও উদার এর আহ্বান, বিশেষ করে ইতর সাধারণের পক্ষে। ভেদাভেদবর্জিত অনুষ্ঠান। গাজনের দেবতা শিব তিনদিন কাঁধে চড়ে বেড়ান, কে জানে ছুলে, কে জানে বাগ্দী, কে জানে চাঁড়াল। সন্ন্যাসী হলেই হল।

লালরঙে ছোপান কাপড় পরে, রঙ্গীন গামছা কোমরে জড়িয়ে সন্ন্যাসী হল পঞ্চু। দিন সাতেকের মত ছুটি। রুজী-রোজগারের চিন্তা নেই, সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন। ঘরে বাইরে কোন তাড়া নেই। ভাবতে গিয়ে বাপ মায়ের কথা মনে পড়ল অনেকবার, চোখে জলও এল। কিন্তু চৈত্রের নির্ম্মেঘ আকাশের সঙ্গে সমতা রেখে শিবের জটার মত রুক্ষ কপিশ হয়ে উঠেছে মাঠ ঘাট। চোখের জল আপনিই শুকিয়ে গেল। চাষাপাড়ার মন্মথ মোড়ল মূল সন্ন্যাসী। উত্তরাধিকারসূত্রে সন্ন্যাসীদের প্রধান, মঠের মোহান্তর মত অপ্রতিহত প্রভাব এই কটা দিন। পঞ্চুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নৈষ্ঠিক আচরণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা নিয়ম বাৎলে দিল। এ কদিন হবিষ্যি কর দিনের বেলা। রাত্তিরে ফলমূল খাবি। ফল ভাঙ্গার দিন থেকে চড়কের দিন পর্য্যন্ত ফাটাফাটি। চৌপর দিন উপোস, বাবার পুজো হয়ে গেলে রাত্তিরে ছুটো হবিষ্যি। শুদ্ধু আচারে যদি পালতে পারিস এ কটা দিন, সামনের বছরে আর তোর মার নেই। বাবার বরে যা মনে করবি, তাই করতে পারবি।

ঘাড় হেঁট করে মূল সন্ন্যাসীর অনুশাসনগুলো শুনে গেল পঞ্চু।

পারলৌকিক কল্যাণের চেয়ে ঐহিক মঙ্গলের আশ্বাসে মনটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। যাবার সময় বৈরাগ্যের চিহ্ন গায়ে নিয়ে স্থূল বৈষয়িক ছুটো কথা তুলতেও ছাড়ল না, খরচটা যদি পেতাম···

পঞ্চুকে আর শেষ করতে দিল না মন্মথ মোড়ল, ও সব গাজন মিটে গেলে পাবি। তোদের ছুলে জাতটার ঐ বড় দোষ। লোকের মুখের দিকে তোরা মোটে তাকাস নে। আট আটটা সন্ন্যেসীর কাপড় গামছা জোটাতেই চকোত্তি ঠাকুরের গিন্নীর গহনা বাঁধা দিতে হয়েছে।

চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গাজনের স্বত্বাধিকারী, শিব ও শিবত্র সম্পত্তির দখলকার।

পঞ্চুর মনে আর কোন ভার ছিল না। কাষায় বস্ত্র আর যজ্ঞোপবীতের অনুকরণে পাটা গলায় নিয়ে নিজের আত্মিক উৎকর্ষ যেন ছবির মত দেখতে লাগল। বাড়ী এসে বউকে জমাট গলায় ডাকতে গিয়ে দেখল, দাওয়ায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে সামনে কাঠের আরসি পেতে সুদীর্ঘ চুলের গোছা ধরে জট ছাড়াচ্ছে বউ, সুগন্ধী তেলের শিশি সামনে সাজান। কেশরাগের গন্ধ ভেসে পঞ্চুর নাকে লাগতেই ছিপিখোলা বোতলের মত মনের সঞ্চিত বৈরাগ্য তার উপে যাবার উপক্রম করল। কিন্তু উঁচু তারে বাঁধা মনের সুরটা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল না।

তোরে ঠিক অন্নপুণ্যোর মত দেখাচ্ছে। বলেই দাওয়ার নীচেয় এসে বউয়ের সামনে ছু হাত পেতে দাঁড়াল পঞ্চু।

প্রথমটা হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে বলল পঞ্চুর বউ, একদিন মানা করেছি না, ঠাকুরদেবতার নাম নিয়ে তাম্‌সা কর না।

পঞ্চুরও কথার সুর ঘুরে গেল। ঠাকুরদেবতার নাম সইতে

পারবি নে, আবার মানুষের মতনও চলতে পারবি নে, তা হলে তোর সঙ্গে ঘর করাই ত দায় হল দেখছি।

পঞ্চুর বউ অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পঞ্চু বলল, মা থাকতে বাবা তারকনাথের সন্ন্যেস করিছি নাগাড় একমাস ধরে। মা হবিষ্যি রেঁধে দিয়েছে। কোনদিন মাছও খায় নি, তেলও দেয় নি মাথায়।

ছেলের কল্যেণে মায়ে যা করে, বউ তা করতে পারে? মায়ের মানত ছেল, তাই মা করত। আমি তোমার হবিষ্যি রাঁধব কি, যে আমায় ও কথা বলছ?

কৈফিয়ৎটা নেহাৎ মন্দ লাগল না পঞ্চুর।

তা ঠিক বলছিস। তবে আমি ত রান্না করতে জানি নে।

ওর আর জানাজানি কি? পাঁচ ব্যান্নুন রান্না করা নয়, শুধু ছুটো চাল ফুটিয়ে নেওয়া। যোগাড় করে দেব, পারবা না?

তা পারব। তবে তোরও ত একটা চেষ্টা করা দরকার। বাবা বুড়ো শিব যদি দয়া করেন, বাবার ফুল যদি পড়ে। সেবার ত নষ্ট হয়ে গ্যাল, এবার যদি থাকে।

মুখখানা কুঁচকে বলল পঞ্চুর বউ, ওঃ, ভারী সখ! বলে আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। শ্বশুর-শাউড়ী মরে গিয়ে ত হাড়ীর হাল হয়েছে। কি করে যে সংসার চলে কোন খবর রাখ?

ধাঁ করে বলে বসল পঞ্চু, কেন? আমি কি বসে খাই নাকি? শিশে শিশে বাসতেল জুটছে, আর বলা হচ্ছে হাড়ীর হাল!

তেলের শিশিটা তুলে নিয়ে ঘরে যেতে যেতে বলল পঞ্চুর বউ,

বাসতেল কি তুমি দেচ্ছ নাকি ? দিদি, জামাইদাদা দিয়ে গিয়েল, তাই মাখছি। আর তোমার অমনি বুক চড়চড় করছে।

রাগে ফুলতে ফুলতে বাড়ী থেকে চলে গেল পঞ্চু।

প্রশস্ত বটগাছের নীচেয় গাজনতলা। নীলপূজার দিন। বিরাট উপচার সংগ্রহ করে দীর্ঘস্থায়ী পূজায় বসেছেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। উপবাসক্লিষ্ট গলায় ক্রমাগত নাম ডেকে চলেছে সন্ন্যাসীর দল। অবিশ্রান্ত ঢাক আর কাঁসির শব্দের মধ্যে দলের পর দল লোক আসছে, যাচ্ছে। ছেলের দল ধূলো উড়িয়ে, চিৎকার করে খেলা করছে। ছোট আকারের বাণলিঙ্গ শিবমূর্ত্তির শীর্ষদেশে কচি বেল-পাতার সমষ্টিভূত ছোট একটা গুলি বসিয়ে দিয়ে উত্তরীয়ের মধ্যে হাত রেখে জপে বসেছেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। এ গাঁয়ের উর্দ্ধতন পিতৃপুরুষ, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের দল, অনেকেরই জন্মের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল এই নীলপূজার দিন বাবা বুড়োশিবের ফুলের প্রসাদে। গাজনের এ কদিন প্রায় ঘরছাড়া হয়েই ছিল পঞ্চু। হঠাৎ কে ডাকতেই, উঠে এসে দেখল মেয়েদের বসবার জায়গা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে তার বউ আর হেলার বউ। সদ্যস্নানের স্নিগ্ধতা তখনও জড়িয়ে আছে বউয়ের নীলাম্বরী শাড়ীর ঘোমটার পাশ দিয়ে ছড়ান এলোচুলে।

হেলার বউ বলল, ঠাকুরমশাইকে বল সরির জন্যে ফুল কাড়িয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচল থেকে সওয়া পাঁচ আনা পয়সা বের করে পঞ্চুর হাতে তুলে দিল পঞ্চুর বউ। হেলার বউ আবার বলল, বল, ছেলে হলে সামনের বছর ধুতি চাদর দিয়ে বাবার পুজো দোব।

যথাকালে মূল সন্ন্যাসী মারফৎ প্রার্থনাটা চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কানে

পৌঁছুল। শিবের মাথায় ফুল চড়তেই চোখ বুজিয়ে কাঠ হয়ে বসে গেল পঞ্চু। অপরিণত স্কুলের ছেলের মনে জপধ্যানের কোন পদ্ধতিই জানা ছিল না। তবুও তার মনে হল কে যেন তাকে প্রতিনিয়ত ভেতর দিকে টানছে। ঢাকঢোলের শব্দ, সমবেত মেয়েপুরুষের কলগুঞ্জন, সন্ন্যাসীদের কাতর কণ্ঠের ডাক, সব কিছুর অন্তর্নিহিত যে আত্মনিবেদনের সুরটা ছিল সেইটুকু ধরে সে ডুবুরীর মত মনের গভীরতম প্রদেশে নেমে গেল। এ প্রার্থনা তার রক্তমাংসের কামনা —তার ভাঙ্গা পাখীর বাসা নতুন করে গুছিয়ে তোলবার কল্পনা।

আরে এই পঞ্চা। বেটা ঘুমিয়ে পড়েছিস্ নাকি ? কই তোর বউ কোথায় ? ডাক্।

ফুল পড়েছে ঠাকুরমশাই ? পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল।

হাঁ, রে বেটা, হাঁ। পড়বে না ? কে ফুল চাপিয়েছে ? বলে এদিক ওদিক চাইতে গিয়ে যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।

ধর্। ধর্। শীগ্গীর ধর্। বাবু এয়েছেন। ওরে মন্মথ, টপ্ করে বাড়ী থেকে একখানা চৌকি-টৌকি এনে দে।

পঞ্চু ফুল ধরবার আগেই মাথার ঘোমটা বাড়িয়ে দিয়ে পূজাবেদীর কাছে এগিয়ে এল পঞ্চুর বউ ও হাতদুটো জোড় করে বোধ হয় একটু গঙ্গাজল চাইল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তখন অত খুঁটিয়ে দেখবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি পঞ্চুর বউয়ের হাতে ফুলটা ফেলে দিয়ে বললেন, দাঁড়ান বাবু। বসবার জায়গা আনতে গেছে। পায়ের ধূলো যখন দিলেন, দয়া করে একটু বসে যান।

আদ্দির পাঞ্জাবির চুড়িদার হাতাটা আরও একটু গুটিয়ে তুলে পকেট থেকে রুমাল বের করে হাওয়া খেতে লাগল মজুমদার।

চুপি চুপি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু। ওদের একটু বাড়ী দিয়ে আসব ঠাকুরমশাই ?

যা। তবে মেলা দেরি করিস্ নে।

বউকে সঙ্গে করে চলে গেল পঞ্চু। আসন ছেড়ে মজুমদারের পাশে এসে দাঁড়ালেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। গ্রামের আর ছু পাঁচটি ভদ্রলোকও গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল।

মজুমদার জিজ্ঞাসা করল, পঞ্চার সঙ্গে ও মেয়েলোকটা কে গেল চক্কোত্তি মশাই ?

মজুমদারের বাপের বয়সী শ্রীবাস চক্রবর্ত্তী একগাল হেসে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে, পঞ্চার পরিবার। ওর জন্যে ফুল কাড়ালাম কিনা।

একটা অভিজাত হাসির সঙ্গে বলল মজুমদার, বউয়ের জন্যে ফুল কাড়ালে ত হবে না, ও বেটার পা ছুটো ভেরে দিতে পারতেন, তবে ত হত! আপনার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই ঐ ছোটলোক-বেটাদের জন্যে ঠাকুরদেবতার নাম খারাপ করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে ছু চার জন সায় দিয়ে উঠল।

আর ভদ্রলোকদের যদি ঠাকুরদেবতার ওপর বিশ্বাস না থাকে, পাপপুণ্যের ভয় না থাকে, তাতে ঠাকুরদেবতার মান যায় না ? অভয় মোড়ল যে ইতিমধ্যে কখন ভিড়ের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ লক্ষ্যই করে নি।

মজুমদারের চোখমুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল, তোমার আস্পদ্দা দিন দিন বড় বেড়ে যাচ্ছে মোড়ল।

শান্তভাবে উত্তর দিল অভয় মোড়ল, আপনার কেন গায় লাগছে বাবু, আমি ত আপনাকে কিছু বলি নি ? আচ্ছা, এই চক্কোত্তি মশাইই বলুন না, এই গাজনতলায় ভদ্দরলোকের

মেয়েপুরুষে কি ভিড়টা হত আগে। তিল থোবার জায়গা থাকত না। আজ কজন আছেন, দেখতেই পাচ্ছেন।

মজুমদার বলল, ভদ্দরলোক কি আর আছে গাঁয়ে, যে থাকবে ?

মাথা নেড়ে বলল অভয় মোড়ল, ও একটা কথাই নয়। গেল বছর যখন ভোটাভুটি হল, তখন সবাই ত আসতে পেরেছিলেন। ইচ্ছে করলে এখনও আসতে পারতেন।

ভদ্রশ্রেণীর ওপর প্রকাশ্য আক্রমণে, পাশ থেকে ভদ্রসমাজভুক্ত একজন বলে উঠলেন, কিন্তু তোমার কথাটা বাপু একটু ট্যাস্‌টেঁসে। পাপপুণ্যি অনেক কিছুই যেন বলে গেলে !

কি হচ্ছে সত্যহরি ভাই ? আর তোমাকেও বলি মোড়লের পো, আজকের দিনে এ সব কি করছ তোমরা ? চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু মজুমদার ছাড়বার পাত্র নয়।

তা সত্যহরিদা মিথ্যে বলেন নি। পাপপুণ্য তুলে কথা বলেছে মোড়ল।

অভয় মোড়ল বলল, বলব না ? খাতিরে কথা বলবার ছেলে এ অভয় মোড়ল নয়। যেমন দেখব, তেমনি বলব। সাবিটারে কাজ করতে নিয়ে গেলেন রমাপত্তিবাবু। তারপর তার সব্বনাশ করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ছিল মেয়েটা ঘরে, দুঃখ্যু ধান্দা করে চালাচ্ছিল, এখন যে একেবারে বয়ে গেল, মাছ নিয়ে সহরে যেতে আরম্ভ করেছে। এ পাপে তারে ডোবাল কে শুনি ?

জোর করে হেসে উঠে বলল মজুমদার। এইবার পথে এস। কেমন ? বলি নি সেবার ? মনে নেই ? তখন ত ডাক্তারের জন্যে খুব সাউকুড়ি করেছিলে। আজ এখন উল্‌টো গাইছ কেন ?

উল্‌টো আমি গাই নি বাবু। তিনি ডাক্তার ভাল, সেই কথা বলেছিলাম। এখনও সে কথা বলি।

থাক্‌গে। ও সব কথা বাদ দাও মোড়ল। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বললেন।

এতক্ষণে বেতের একটা মোড়া নিয়ে এসে মজুমদারের বসবার জায়গা করে দিল মন্মথ মোড়ল। কিন্তু মজুমদার আর বসল না। মজুমদার চলে যেতে চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বললেন, কাজটা ভাল হল না। বলে অভয় মোড়লের মুখের দিকে একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে বলল অভয় মোড়ল, মন্মথকে বলুন আমার ঝুড়িটা আজাড় করে দিতে, আর বাবার পূজোর জন্যে এই যৎকিঞ্চিৎ ধরুন। গামছার খুঁট খুলে সিকি, দুয়ানি, আধুলিতে একমুঠো রেজকী পূজাবেদীর ওপর রেখে মাটির ওপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল অভয় মোড়ল। মাননীয় অতিথির ক্ষোভের চিন্তা মন থেকে মুছে গেল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের।

ওরে বাপ্‌রে! মোড়লের আমাদের সব কাজ হল চুটিয়ে। মন্মথর কম্ম ঐ ঝুড়ি নিয়ে যাওয়া। পঞ্চা, আয় ত র‍্যা। ঝুড়িটা বাড়ীতে ঢেলে থুয়ে আয়।

সাধারণতঃ পূজার উপঢৌকন ফল মূল গাজনতলায় ঢেলে রাখা হয়। কিন্তু অভয় মোড়লের জিনিস একেবারে বাছাই করা। ডাব, কলা, তরমুজ, শসা, খরমূজা, বেল, দেখলে আর চোখ ফেরান যায় না।

প্রকাণ্ড বেতের ঝুড়ি ভরতি ফল নিয়ে চলে গেল পঞ্চু। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বললেন, বাবার চরণামৃত নিয়ে যাও মোড়ল।

আমি? আমার এখনও স্নান হয় নি। আমার ওয়াইফ্

এসেছেন, তিনিই নিয়ে যাবেন। একছিলিম তামাক খেয়ে ঝুড়ি নিয়ে চলে গেল অভয় মোড়ল।

রাত দশটায় নীলের পূজা শেষ হলে, বাড়ী এল পঞ্চু। ডাব কেটে, ফলফুল সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল বউ। সমস্ত দিন অনাহারের পর স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে শীতে কাঁপছিল পঞ্চু।

পঞ্চুর বউ বলল, ও কি! কাপড় ছাড়লে না?

ভিজে কাপড়ের একটা খুঁট চালের বাতায় বেঁধে অবশিষ্ট ভিজে অংশটা কোমরে জড়িয়ে খেতে বসল পঞ্চু।

না। গায়ের কাপড় গায়ে শুকুতে হয়। এ সময় ভিজে কাপড় ছাড়তে নেই। পঞ্চুর সামনে বসে গল্প করতে লাগল বউ। মনে আজ তার কোন অশান্তি নেই। বাবা বুড়োশিবের দয়া হয়েছে তার ওপর। তুপুর থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকরকম করে ভাবছে এই কথাটা। মায়ের মনের মিষ্টি পরদাগুনো প্রজাপতির মত বহুবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে ছোট্ট একখানা কচি মুখের স্বপ্ন।

ফুলটা কি রকম করে পড়ল দেখলে?

হুঁ। বলে তরমুজে একটা কামড় বসিয়ে দিল পঞ্চু।

হবে না? তুমি ভক্ত হয়েছ, এখন ত তুমি দেব্‌তা।

পঞ্চু বলল, কাল একটা মাতুলি এনে দোব, ফুলটা পরে ফেলিস।

তোমার শীত নেগেছে। আমার কাচা কাপড়খানা পরে ওটা একটু মেলে ছাও, এখ্‌খুনি শুকিয়ে যাবে।

তুর্ পাগলী! মেয়েমানুষের কাপড় এখন পরতে নেই।

তা জানি। তবে তোমার কষ্ট হবে কি না তাই বলছি।

এতে আবার কষ্ট কি? তা ছাড়া একটু কষ্ট করলে যদি তোরা ভাল থাকিস, সে আবার কষ্ট কোন্‌খানে?

পঞ্চুর বউয়ের চোখে জল এসে পড়ল। এ রকমের কথা সে অনেকদিন শোনে নি স্বামীর মুখ থেকে। পঞ্চুর খাওয়া হয়ে যেতেই সে বলল, তুমি বস, আমি তামাক সেজে দিচ্ছি। তারপর তোমার হবিষ্যির যোগাড় করে দোব। আজ একটু রাত করে খাও, কালও ত চৌপর দিন উপোস। কালকের দিনটে গেলে বাঁচি।

কথার আবেগটুকু স্পর্শ করল পঞ্চুকে। দিনভোর উত্তেজনার পর পঞ্চুর চোখছুটোয় ঘুম জড়িয়ে এল।

চড়কের পূর্ব্বরাত্রে সন্ন্যাসীদের ঘুমের অবসর থাকে না। শিবের নামে সারারাত ধরে কাঠ-সংগ্রহ করতে হয় লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে। সংগ্রহটা অবশ্য না বলেই চলে। পরপীড়নের সংস্কার নিয়ে, লোকের বাড়ীর ঢেঁকি, গরুর গাড়ীর চাকা, বাগানের বেড়ার আগড়, এমন কি দোর-জানালা পর্য্যন্ত আল্‌গা পেলে খুলে এনে গাজনতলায় সাজিয়ে রাখা হয়! অতিসঞ্চয়ী গৃহস্থের ওপরই সাধারণতঃ হাম্‌লাটা চলে বেশী।

বউকে দোর বন্ধ করতে বলে অন্ধকারে বাইরে এসে দাঁড়াল পঞ্চু। নিশুতি রাতের গভীরতম রহস্য জড়িয়ে ছিল আকাশে-বাতাসে। মায়াপরীর চোখের মত জ্বল জ্বল করছিল অগণিত নক্ষত্র। বনঝোপের জোনাকীজ্বলা অন্ধকারে মাথার ঘোমটা সরিয়ে স্নিগ্ধ পেলব চোখে অশরীরী ইসারা জানাচ্ছিল সুন্দরী রূপ-কুমারীর দল।

হেই। কেডা যায় র‍্যা?

কেডা? হেলোদা? এত রাত্তিরে কমনে গিয়েলে?

কেডা র‍্যা? পঞ্চা নাকি? আর বলিস কেন ভাই? মোদের আবার রাত-বিরেত। মাঠের পাড়ায় চুরি হয়েছে কাল রাত্তিরে।

শালা দফাদারের হুকুম, গাঁড়া একবার ঘুরে দ্যাখতে হবে। তা তুই কমনে ইদিকে ?

ধাঁ করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল পঞ্চুর, তারার বাড়ীতে কাঠ আছে। দেখি যদি ধূলো দিয়ে বাগাতে পারি।

ও। বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল হেলা। কিন্তু খুক্ করে চাপা হাসির শব্দটা স্পষ্ট কানে গেল পঞ্চুর।

শালার ভূতের চোখ! আপন মনে বলল পঞ্চু।

অনেকদিন পরে দুর্গাপুরে সাবির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল পঞ্চু। ভাঙ্গা মাটির দেওয়ালের সঙ্গে বাঁশের খুঁটি পুঁতে দুখানা চালা কোন রকমে দাঁড় করান। বদ্ধ দরজায় হাত বুলিয়ে দেখল শিকলে তালা ঝুলছে। মাছের আস্টে গন্ধ আসছে কোথা থেকে। হঠাৎ পঞ্চুর নজরে পড়ল, তারার ঘরের দাওয়ায় মিট মিট করে আলো জলছে। এত রাত্তিরে আলো জ্বেলে কি করছে তারা ? তারার বাড়ীর উঠানে এসে যা দেখল পঞ্চু, তাতে তার বুকের ভেতরটা ভয়ে শিউরে উঠল। দাওয়ার ওপর জীর্ণ শবের মত চিৎ হয়ে পড়ে আছে তারা, স্যাকরার হাপরটানার মত অনর্গল একটা শব্দ উঠছে বুকের ভেতর থেকে। আর তার মাথার কাছে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে তন্দ্রায় ঢুলছে দয়া।

চোরের মত চুপি চুপি ডাকল পঞ্চু, দিদিমা।

তন্দ্রা ভেঙ্গে উঠে পঞ্চুর মুখের দিকে চাইল দয়া।

আমি পঞ্চু। তারাদার অসুখ কি বেশী ?

পঞ্চু দেখল নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকে চিনতে চেষ্টা করল তারা। ইসারায় পঞ্চুকে সরে যেতে বলল দয়া, তারপর উঠে এসে বলল, ঐ ধার্‌ড়া পানে চ। দুজনেই একটু সরে এসে দাঁড়াল।

গলার স্বর যথাসম্ভব নামিয়ে বলতে লাগল দয়া, টনটনে জ্ঞেয়ান রয়েছে। মানুষ জন সবই চিনতে পারে। লাই থেকে টানডা ওঠছে আজ হুকুর থেকে। আহা! কি বরাত রে। অমন জাজ্বল্যমন্ত সংসার, এক ফোঁটা জল ছ্যায় কেডা, তার ঠিক নেই। জোর করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল দয়া।

সাবি কমনে দিদিমা?

আবেগের তাড়নায় গলা ক্রমশঃ চড়তে লাগল দয়ার।

আর বলিস্ কেন? তার য্যামন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, গেল সেই মাঝেরপাড়া তারার বউরে আনতে।

মাঝেরপাড়া? সে কি এ দেশ? মালঞ্চ থেকে বাসে যেতে হয় চার ঘণ্টা।

পঞ্চু আবার বলল, কিন্তু সেও ত মেয়েমানুষ। একলা, অত ধুরের পথ।

সব জানি পঞ্চা। কিন্তু সে কথা শোনছে কেডা? বলে, আমার ত এখন সাত দুয়োর খোলা। আমার আবার ভয় কিসের?

তা বটে! মর্ম্মমূল ছিঁড়ে একটা নিঃশ্বাস্ বেরিয়ে এল পঞ্চুর। এই সাবির আকর্ষণে পাটা গলায় করে সে ছুটে এসেছে এত রাত্তিরে। তা বটে দিদিমা, তা বটে!

স্তিমিত দীপের ক্ষীয়মাণ শিখার মত তারার জীবনদীপও নিভে আসতে লাগল। কিন্তু পঞ্চু আর সেখানে দাঁড়াল না।

চড়কের পরদিন। নববর্ষের সূচনায় স্নান সেরে নগদ দশটা টাকা ও একঠোঙ্গা রসগোল্লা নিয়ে তুপুরবেলা বাড়ী এল পঞ্চু। মিষ্টান্ন ও অর্থটা মূলসন্ন্যাসী মন্মথ মোড়লের হাত থেকে পাওয়া। প্রাপ্তিযোগের এ সম্ভাবনাটা সকাল হবার আগেই বউকে জানিয়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল।

বাড়ী ঢুকেই বউকে তু তিনবার ডাক দিল পঞ্চু, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। কি গো? কি করছিস তুই?

ঘর থেকে বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বউ কিন্তু মুখে তার আনন্দ বা কৌতূহলের কোন কিছুই ছিল না। আগে টাকাটা তারপর খাবারের ঠোঙ্গাটা বউয়ের হাতে তুলে দিল পঞ্চু। কিন্তু গরীবের ঘরে এমন তুটো তুর্ল্লভ বস্তু একসঙ্গে হাতে পেয়েও মুখে আনন্দের কোন স্বীকৃতি ফুটল না পঞ্চুর বউয়ের।

কি হল বল্ ত? বর্চ্ছরকার দিন সকালবেলা মুখ হাঁড়ি করলি কেন?

এ কথারও কোন উত্তর দিল না বউ।

কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল পঞ্চু, তারা বাগ্‌দীটা কাল মারা গেল।

ফোঁস্ করে ঘর থেকে উত্তর দিল বউ, ভালই হল!

ভালটা আবার কি হল?

পঞ্চুর বউ কোন উত্তর দিল না। পঞ্চু আবার জিজ্ঞাসা করল, ভাল কি হল, বল্।

ভাল হল, ও পাড়াডায় যা হক একটা মাথাধরা নোক ছেল, চলে গেল। এখন যার যা খুসি করবে, বলবার কেউ রইল না।

কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝলেও, বলবার বিশেষ কিছু ছিল না পঞ্চুর। বোশেখের প্রথম দিনটায় দুর্য্যোগের ছায়া দেখে চমকে উঠল পঞ্চু। মোলায়েম করে বউকে ডাকতে গিয়ে দেখল, দুপ দাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পেতলের একখানা থালায় ঠোঙ্গাসুদ্ধ রসগোল্লাগুলো ঢেলে পঞ্চুর সামনে বসিয়ে দিল বউ।

ইকি? খাবারগুনো সব আমারে দিয়ে দিলি?

কেন? কাউরে ভাগ দেবা নাকি? তা বেশ, আদ্ধেকগুনো তুলে থুচ্ছি, দিয়ে এসোখুনি। পঞ্চুর সামনে বসে পড়ে রাগে ফুলতে লাগল বউ।

পঞ্চুর আজ আর ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি ছিল না। স্বামীস্ত্রীর মান-অভিমানের মামুলি বাঁধা গৎ ছেড়ে কিছুদিন যাবৎ এই মন-কষাকষিটা উভয়ের মধ্যে সন্দেহের কালিতে ক্রমশঃ কুৎসিত হয়ে উঠছিল। দিনকতক আগে এক সন্ন্যাসীকে হাত দেখিয়েছিল পঞ্চু। দাম্পত্য-জীবনের এই দুর্ব্বল স্থানটা যেভাবেই হক তাঁর চোখে পড়েছিল। কোথাকারের কি দুষ্টগ্রহের নামও যেন তিনি করেছিলেন। আজ বোশেখের সকালে রোদ ফেটে পড়ছিল উঠানে, গাছপালার ভেতর দিয়ে সিরসির করে হাওয়া এসে সর্ব্বশরীরে স্নিগ্ধতার আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছিল, অথচ কোন দেবতার রোষে নয়ত জন্মান্তরীণ কোন ব্রহ্মশাপে 'সে বিয়েকরা বউকে না পারছে ভালবাসতে, না পাচ্ছে তার ষোলআনা ভালবাসা।

অদ্ধেক তুলে থো। দিয়ে আর কারে আসব, তুই খেলেই হবে। হাসতে হাসতে বলল পঞ্চু।

থাক্। ঢের হয়েছে। আর [illegible]মেলা সোহাগে কাজ নেই। বলে,

“ভাত পায়না চিঁড়ের নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।” সে ভাগ্‌গি থাকলে আর তোমার ঘর করি !

পঞ্চু বুঝল, এ অভিশাপের উৎপত্তিস্থান আকাশে ছড়ান গ্রহ-নক্ষত্রের দলের চেয়েও আরও নিকটতর ও স্পষ্টতর কোন বস্তু, রক্ত-মাংসে গড়া জীব। মনে মনে এদের চিনলেও, কিছুতেই সে বুঝতে পারে পারে না এ আগুন জ্বেলে তাদের লাভ কি ?

খড়ের আগুনের মত পঞ্চুর মনের কৌতূহল দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, তোর যদি ঝগড়া করতে সাধ হয়ে থাকে, যত পারিস্‌ ঝগড়া কর্‌, আমি চললাম। খেতেও চাই নে, এখেনে থাকতেও চাই নে।

তা চাবা কেন ? আমারে কি তোমার ভাল লাগে, যে আমার কথা ভাল লাগবে ? আমি পায়ে ধরে কাঁদলেও তোমার ঝগড়া করা হয়।

তোরে ভাল লাগে বলে তোর ঝগড়াও ভাল লাগতে হবে ? তুই যদি মন ঠাণ্ডা করে থাকিস্‌, দেখবি আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হাসিতে পঞ্চুর বউয়ের মুখখানা ভরে উঠল।

ও, আমি মন গরম করি বলেই তুমি বাইরে বাইরে ঘোর, না ?

তা নয়ত কি বল ?

তোমার নজ্জা করে না ? গলার পাটা নেবিয়ে এখনও জল মুখে ছ্যাওনি, মিছে কথা বলছ ? পঞ্চুর বউয়ের রাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

কি আবার মিছে কথা বললাম ?

পঞ্চুর বউ বলল, শুধু মিছে কথা। তোমার ধম্মকম্ম সব

ভূয়ো। তা নইলে বাবার সন্ন্যেস করে নীলের দিন তুমি সাবির ঘরে যাও। দুটো দিন পরে গেলে চলত না?

আহত হিংস্র জন্তুর মত রুখে উঠল পঞ্চু, কেডা তোরে বলেছে আমি নীলের দিন রাত্তিরে সাবির বাড়ী গিইছি?

গিয়েলে কিনা বল না?

তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বউয়ের একখানা হাত সবলে চেপে ধরে বলল পঞ্চু, সে জমাখরচ পরে দোব। আগে বল্ কেডা তোরে এ কথা বলল? সে তোর কে? তোর কোন্ বাবা খুড়ো?

নিস্পিষ্ট অভিমান নিয়ে কাঠ হয়ে রইল পঞ্চুর বউ, কোন উত্তর দিল না। বছরের প্রথম দিনের কথা একেবারে ভুলে গেল পঞ্চু। বউকে নিরুত্তর দেখে প্রচণ্ড ঝটকায় তার একটা হাত ধরে টানতেই সে একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে দাওয়ার ওপর পড়ে গেল। বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বলল পঞ্চু, মনে ভাবিস, আমি কিছু বুঝি নে। হেলা তোরে এ কথা বলেছে। তার নামডা করতে তোর অত বাধছে কেন? তার সঙ্গে তোর অত পীরিত কিসের?

স্বামীর হাতে লাঞ্ছিতা হয়ে দুঃখে অভিমানে ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছিল পঞ্চুর বউ, কিন্তু নিজের চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিতে তার চোখমুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল।

মুখে পোকা পড়বে। মুখ খসে যাবে।

অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় উত্তর দিয়ে, লাথি মেরে খাবারসমেত থালাখানা উঠানে ফেলে দিয়ে বাড়ী থেকে চলে গেল পঞ্চু!

খরনিদাঘের মেঘনির্ম্মুক্ত খোলা আকাশের তলায় রোদঝলসান

পত্রপল্লবের নিভৃত অন্তরাল থেকে কোকিলের ডাক ভেসে আসতে লাগল, একটার পর একটা, পঞ্চুর বউয়ের ভেতরটা গলিত ধাতুর মত টগবগ করে ফুটেই চলল। রাস্তার কুকুর এসে ছড়ান রসগোল্লার সদ্গতি করে গেল। অতি লোভনীয় খাদ্যবস্তুর এই শোচনীয় অপমৃত্যু দেখে তার মনে কোন দাগই পড়ল না। খা, খা। আগুন নেগে যাক সব। পুড়ে খাক হয়ে যাক।

ক্ষোভে আক্রোশে ফুলতে লাগল পঞ্চুর বউ। মাথার চুলগুলো খোঁপা খুলে ছড়িয়ে পড়ল পিঠময়। বড় ঘরের দাওয়া থেকে নেমে এসে রান্নাঘরে গিয়ে জ্বলন্ত উনুনে এক ঘটি জল ঢেলে দিল।

তোর রান্নার নিকুচি করেছে। আসুক মুখপোড়া। আকার ছাই বেড়ে দেব আজ। খেয়ে খেয়ে তেলানি বেড়ে গিয়েছে।

আপন মনে অনেক শাপশাপান্ত করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল পঞ্চুর বউ। স্বামী বা শাশুড়ীর ওপর রাগ করে সারাটা দিন সে শুয়ে কাটিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু আজ পারল না। সমস্ত শরীরে যেন তার বিছা কামড়াতে লাগল। সারা ঘর ঘুরেঘুরে অর্থ-হীনভাবে এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। সব আজ তার শেষ হয়ে গেছে। ভালবাসার দেনাপাওনা মিটে গেছে একটু আগে। ডাকাতের সঙ্গে ঘর করতে গেলে এইরকমই হয়। হঠাৎ ডান হাতের মণিবন্ধটা বড্ড যেন জ্বালা করে উঠল। চেয়ে দেখল, তিন চার গাছা কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে গেছে। এক জায়গা দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে এসে জমে গেছে। চুড়িগুলো কিনে দিয়েছিল হেলার বউ। রং মিলিয়ে চুড়ি পছন্দ করেছিল অনেক দোকান ঘুরে। দু'চারবার হাতখানার দিকে চেয়ে দেখল পঞ্চুর বউ, তারপর

দেওয়ালের গায় টাঙ্গান কাঠের আরশির সামনে সরে গিয়ে দাঁড়াল। নাকের ওপর চোখের জলের সঙ্গে মিশে দাওয়ার মাটি তিলকের মত লেগে রয়েছে। কাপড়ের আঁচলে মুখখানা মুছে ফেলল ভাল করে। কিন্তু আরশিতে নিজের মুখশ্রী পরখ করতে গিয়ে আজ আর নিজেকেই নিজের পছন্দ হল না। কিছুক্ষণ পরে চৌকির তলায় অতি গোপন স্থান থেকে ছোট্ট একটা নেকড়ার পুঁটুলি বের করে আনল পঞ্চুর বউ। তারপর তার ভেতর থেকে লুকান কানবালা দুটো বের করে কানে পরে ফেলল। এইবার আরশিখানা খুলে এনে মুখখানা আবার ভাল করে দেখতে লাগল। সামান্য দুটুকরো সোনার গুণে মুখখানা তার একেবারে বদলে গেছে, এমন কি এ গাঁয়ের ভদ্রঘরের মেয়েরাও তার চেয়ে সুন্দর নয় কেউ। না, এ কানবালা সে আর খুলবে না। হেলার বউ যতই গোপন করুক না কেন, এ জিনিস যে তাকে কেন দিয়েছেন বাবু সে ভালরকমই জানে। কতদিন ভেবেছে হয় টাকা মিটিয়ে দেবে, নয়ত জিনিসটা সে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায় টাকা? আর ফিরিয়েই বা দেবে কেন? যে ভাবেই দিক, তাকে ভাল লেগেছে, তবে দিয়েছে। তার রূপ আছে, তাই দিয়েছে। তাকে ঘেন্না করলে কি দিত?

তবে যদি পঞ্চু দেখে, কি ভাববে? আর সেই বা কি জবাব দেবে? যা হক বলবে। বলবে, বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে, নয়ত দিদি দিয়ে গেছে। আর এত ভয়ই বা কিসের? পোষায় তাকে নিয়ে ঘর করবে, নয়ত তাড়িয়ে দেবে। তা দিক। এ রকম লাথিঝাঁটা খেয়ে স্বামীর ঘর করবার চেয়ে যেখানে হক চলে যাওয়াই ভাল। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে একফাঁকে কখন

ঘুমিয়ে পড়ল পঞ্চুর বউ। স্বপ্নে দেখল পঞ্চু তাকে কত আদর করে ডাকছে, এমন কি পায়ে ধরে সাধাসাধি করছে, আর কোনদিন তার গায়ে হাত দেবে না, কোনখানে যাবে না। হঠাৎ পায়ে হাত পড়তেই ধড়মড় করে সে উঠে বসল। ঘুম ভেঙ্গে দেখল, পঞ্চু তার পায়ে হাত দিয়ে ডাকছে। রাগ, দুঃখ ভুলে গিয়ে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

এই, এই। ওঠ্। বাবু এয়েছেন।

ঘরের একপাটি দোর খোলা। বেলা গড়িয়ে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। উন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার চোখে পড়ল পঞ্চুর বউয়ের ভূপতি মজুমদার উঠানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল পঞ্চুর বউ। ঘর থেকে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল পঞ্চু।

বসবেন বাবু? মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু।

না, বসব না। তুই জায়গাটা দেখিয়ে দে। কোথায় টিউবওয়েল বসলে তোদের সুবিধে হয়। অবিশ্যি তোর বউকে জিগ্যেস্ করে আমাকে বল!

আবার ঘরে গিয়ে বউকে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু এবং ঘটনাটা বর্ণনা করল সংক্ষেপে।

দুলেপাড়ায় একটা টিউকল বসাবেন বাবু। বাবুর ইচ্ছে এইখানটায় কোনখানে বসান, মানে এই আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি কোন জায়গায়। কমনেটা হলে তোর সুবিধে হয় বল্ দিনি?

এতবড় দুলেপাড়াটা থাকতে, দুলেদের মাতব্বর লোক থাকতে কল বসবে তাদের দোরগোড়ায়, এ যে কতবড় সৌভাগ্য, সারা

গাঁয়ের লোক তীর্থের কাকের মত ভিড় করে দাঁড়াবে তাদের ঘরের কাছে, পঞ্চুর বউ একেবারে বিভোর হয়ে উঠল।

আচ্ছা, আমাদের উঠনে ত অনেক জায়গা, এখেনে দিলে হয় না? ছেলেমানুষের মত ঘাড়টা দোলাতে গিয়ে কাণবালা জোড়া ঝকঝক করে উঠল।

আরে? এ মাক্‌ড়ি পেলি কমনে?

মুখখানা শুকিয়ে এলেও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল পঞ্চুর বউ, তোমারে দেখালে ত বেচে খাবা, তাই পরিনি। দিদির হাত দিয়ে বাবা পেটিয়ে দিয়েল।

না, না। বেচব না। তুই পর। খাসা মেনিয়েছে তোরে।

বাইরে এসে মজুমদারকে বলল পঞ্চু। চলুন। জায়গা দেখিয়ে দেই। কিন্তু এটা ত পাড়ার মওড়া, মধ্যিখানে হলেই ভাল হত না?

তোর বউ তাই বলল নাকি? কেন বাড়ীর কাছে হলে তোর সুবিধে হবে না? ঘরের ভেতর থেকে ধাক্কা পেয়ে দোরটা ছুবার শেকলসমেত ঝন ঝন করে নড়ে উঠল। পঞ্চু বলল, ও ত বলছে, বাড়ীর উঠোনেই করতে।

গুড্। তবে উঠোনে হলে বাড়ীর জমি চলে যাবে, আর বাড়ীর আব্রুও থাকবে না। ঐ বেলতলাটায় করব। তুই ভাবছিস কথা হবে। আমি বলছি হক্। লোকে বুঝুক কে আছে তোর পেছনে।

ছুজনেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে একবার পেছন ফিরে দেখল মজুমদার, দোরটা সামান্য ফাঁক করে তার দিকেই চেয়ে রয়েছে পঞ্চুর বউ।

ছেঁড়া জুতোয় তালি লাগানোর মত মনটাকে মেরামত করে নিল পঞ্চু। এককালের বাল্যবন্ধু মজুমদারের সঙ্গেও বটে, বউয়ের সঙ্গেও বটে। জেলা বোর্ডের টাকায় নলকূপ তৈরী হল পঞ্চুর বাড়ীর সামনে, নামটা অবশ্য বহাল হল ভূপতি মজুমদারের। অধিকন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট্ হিসাবে খরচপত্রটাও তার হাতে দিয়েই হল। পারিপার্শ্বিক গ্রামে জলকষ্ট থাকলেও নদীমাতৃক কৌতুকপুরের ভাগ্যে একাধিক নলকূপের ব্যবস্থা হল। তেলামাথায় তেল ঢালা হয়ত ঈশ্বরের বিধান, আন্দোলন একটা চুপিসারে উঠে আবার চুপিসারেই মিলিয়ে গেল।

কিন্তু খাস কৌতুকপুরের বিক্ষোভটা অত সহজে আত্মগোপন করল না। পঞ্চুর সৌভাগ্যকে কেন্দ্র করে সত্য মিথ্যা জড়িয়ে আর একটি গল্প আবার নতুন করে গজিয়ে উঠল।

রোজ সকালে সূর্য্য ওঠবার বহুপূর্ব্ব থেকেই ঘড়া, বালতি, মাটির কলসী, কেনেস্তারা টিন নিয়ে স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ের দল জটলা করে পঞ্চুর বাড়ীর সামনে। ঘরে শুয়ে শুয়ে তাদের কথা-বার্ত্তা শুনতে পায় পঞ্চু। মাঝে মাঝে কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে ভিড় সরিয়ে নিজের জলটা তুলে নেয় পঞ্চুর বউ।

একটু দাঁড়াও গো মালতীর মা। আকায় হাঁড়ি বসিয়ে এইছি, এক কলসী জল নেব।

পঞ্চুর নেহাৎ মন্দ লাগে না শুনতে। মনে মনে ভাবে অনেক-দিনের পুরান কথা। খেলায় হেরে গিয়ে কতদিন ছেলেরা দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ভূপতিকে। ওডা একটা গাবের ঢেঁকি, রাঙ্গামূলো। ওরে কেউ নোব না। দম রাখতে পারে না চু খেলতে এয়েছে।

কতদিন তার চোখে জল দেখে, জোর করে তাকে নিজের দলে নিয়েছে পঞ্চু। কেডা বলে ও খেলতে পারে না। ওরে নিয়েই আমি জিতব।

রূপকথার রাজ্যের সেই একচ্ছত্র নায়ককে এখনও একেবারে ভোলে নি ভূপতি মজুমদার। সেই কথাই ত স্পষ্ট বলে গেল সেদিন পঞ্চুর বউয়ের সামনে। তুলেপাড়া বলতে আমি তোদের বাড়ীই জানি পঞ্চা। তুলে বলতে আমি তোকেই চিনি। এ রাজ্যে হেলার কোন জায়গা নেই।

কিন্তু এ গর্ব্বটুকু বেশীদিন টিকল না পঞ্চুর। একদিন স্পষ্ট শুনল বাল্যবন্ধুপত্নীকে ঠিক মানতে চাইছে না জনমত।

না, না। আমরা সেই কোন্ সকালে এইছি। আমরা দেঁড়িয়ে থাকব আর উনি জল নিয়ে যাবেন!

আমি এই এক বালতি জল নোব, আর তোমরা রাজ্যি ভুজ্যি ভরাবে। তোমরা একটু দ্যাড়াও।

কেন গো? তোমার কল নাকি?

হাঁ। আমারি ত কল।

তা হবে বৈকি। তা না হলে কি আর এত জায়গা থাকতে তোর বাড়ীর তুয়োরে কল বসিয়েছে বাবু। জানি, জানি, সব জানি। চল্‌লো চল্। মোরা গঙ্গায় যাই। এ ঢলানীর কলে আর জল নিয়ে কাজ নেই।

তালি বসান মনটার কোন্ ফাঁকে একটু যেন চিড় খেয়ে গেল পঞ্চুর। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বলল, না, না। গঙ্গায় যাবা কেন? এইখানেই জল নাও তোমরা। কল ত সকলেরই।

প্রতিপক্ষ দুটি অল্পবয়সী বউ, তবুও তাদের ভেতর থেকে আড়-ঘোমটা টেনে একজন বলল, না, দরকার নেই। সরকারী টিপুকলে জল নিতে এসে কথা শোনবে কেডা ?

ততক্ষণ জলের বালতি ভরা হয়ে গেছে পঞ্চুর বউয়ের। স্বামীর মধ্যস্থতায় বাধা দিয়ে বলল, তুমি থাম ত। সরকারী কল না হিঁয়ে। দয়া করে বাবু দিয়েছেন, তার আবার এত কথা কিসের ? যার পোষাবে নেবে, নয়ত বাবুর বাগান দিয়ে চলে যাবে।

এইবার ঝগড়ার যে খোলাখুলি রূপটা বেরিয়ে পড়ল, তাতে পঞ্চুর পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না।

না। বাবু তোরে দিয়েছে। ওরে আমার বাবুসোহাগী রে! তা না হলে পেটে ভাত জোটে না ঝুমকো ঝুলিয়ে বেড়াস্। গলায় দড়ি।

বাড়ী ফিরে এসে গুম্ হয়ে বসে রইল পঞ্চু। তখনও নেপথ্যে ঝগড়ার জের টেনে চলেছে পঞ্চুর বউ।

তুই চুপ করবি কি না বল্ ত ?

কেন ? তোমার অত গায় নাগছে কেন ?

গায় নাগানাগি নয়। কাল থেকে কল নিয়ে কারুর সঙ্গে ঝগড়া করবি নে, বলে দিচ্ছি।

কেন করব না ? গাঁয়ের বেটাবিটীদের ভয়ে।

কল কি আমার বাবার ? এই নিয়ে কত কথা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছিস নে ?

হকৃগে কথা। বাবু কি বলেল মনে নেই ? আমাদের সুবিধের জন্যেই ত এখেনে কল বসিয়েছে।

এ সব কথা শুনতে তোর লজ্জা লাগে না ?

ও সব হিংসের কথা। বাবু আমাদের ভালবাসে আপদে বিপদে

দেখে, তাই লোক জ্বলে মরে। এটা তুমি বোঝ না কেন? দু দুটো ট্যাকা তোমাকে দিয়ে থুয়েছে, একটা কথা বলেছে কোনদিন? আজ যদি তাগাদা করে বসে, কি দিয়ে শোধবা বল ত? কি আছে তোমার?

কথাগুণোর মধ্যে অকাট্য যুক্তি থাকলেও, শাঁখের করাতের মত পঞ্চুর মনের দুটো দিকেই কেটে বসতে লাগল।

আগের দিন সন্ধ্যার সময় কালবোশেখী ঝড়ের সঙ্গে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভোরবেলা, ভাল করে অন্ধকার যায় নি তখনও, অভয়মোড়ল পঞ্চুকে জোর করে নিয়ে গেল। সবে জল হয়েছে, একদিন দেরী হলে জো চলে যাবে, মাটি টেনে যাবে। আউস ধান আর পাটের জন্য লাঙ্গল দেওয়া চলবে না।

বেলা দশটা নাগাদ জল খাবার ছুটি দিল অভয়মোড়ল। মালিকের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বাড়ীতে ভাত খেতে এল পঞ্চু। সকাল সকাল কাজে লাগায় ছুটিটা মিলেছিল একটু আগে। পূর্ব্বরাত্রের ঠণ্ডার জড়িমা কাটিয়ে গ্রীষ্মের প্রখরজ্বালা ছড়াতে আরম্ভ করেছে। গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ী এসে দেখল পঞ্চু, দু ঘরের দোরে তালা ঝুলছে। তামাক খেতে খেতেই বাড়ী এসেছিল পঞ্চু। সাজা তামাকের আয়ু শেষ হল, তখনও বউয়ের দেখা নেই। পঞ্চু বিরক্ত হল। বাইরে এসে দেখল কলের কাছে ভিড় করে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। ছোট একটি মেয়েকে দূর থেকে ডাকল পঞ্চু।

তুই কতক্ষণ এইছিস ভূতি?

অনেকক্ষণ ধর্ণা দিয়ে ভূতিও বিরক্ত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে নালিশ জানিয়ে বলল, দেখ না পঞ্চুদা। কোন্ সকালে এইছি, আমারে এরা জল নিতে দেচ্ছে না।

ভূতির আক্ষেপ শোনবার মত মনের অবস্থা ছিল না পঞ্চুর, তাই নিজের কথাটাই তাকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের এরা কমনে গেছে বলতে পারিস ?

হিঁ। কেন পারব না। তোমার বউ ত ? এই ত হেলাদার বোয়ের সঙ্গে কমনে গেল।

সকাল থেকে খাওয়া নেই, আধ ঘণ্টা মাত্র খাবার ছুটি, আর এই সময় সে গেল আড্ডা দিতে ? তাও এতক্ষণ হয়ে গেল, ফেরবার নামও নেই। দেরী হলে এখুনি ছুটে আসবে অভয় মোড়ল। পঞ্চুর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

বাঁশবন আর আমবাগানের সংযোগ রেখার মধ্য দিয়ে হেলার বাড়ী যাবার সরু রাস্তা। বনভূমির সীমান্তে হেলার বাড়ী, তারপর আরও খানিকটা বনজঙ্গল, তারপর আর খানকতক মাটির বাড়ী। সম্পূর্ণ প্রতিবেশীশূন্য অবস্থায় গ্রামের একটা নিভৃত কোণে বাস করে হেলা। আর একটু গেলেই হেলার বাড়ী। কোন দিকে না চেয়ে আপনমনে চলেছে পঞ্চু, বড় একটা আমগাছের আড়াল থেকে তাকে ডাকল হেলা। পঞ্চা, কম্‌নে চলিছিস্ র‍্যা ?

চেয়ে দেখল পঞ্চু দড়ি ধরে গরুকে ঘাস পাতা খাওয়াচ্ছে হেলা।

পঞ্চু জিজ্ঞাসা করল, আমার বৌ তোমাদের বাড়ী গিয়েছে ?

স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা বাদ দিয়ে বলল হেলা, কই, না ত।

তারপর গলার স্বর অনেকখানি বাড়িয়ে আবার বলল, কেন বল্ দিনি ?

গঙ্গার ঘাটে দেখিছিস ? সেই দিকটা এগুনে ছ্যাখ্। আর এখেনে থাকলে ত আছে, গঙ্গা থেকে না ফিরলেই চিত্তির।

কৌতুকপুরের গঙ্গায় কুমীরের ভয় ছিল। কিন্তু হেলার কথায় আজ কোন ভয় এল না পঞ্চুর মনে।

পঞ্চু বলল, না, গঙ্গায় যায় নি। মোহনের মেয়ে ভূতি বলল, তোমার বৌয়ের সঙ্গে তাকে এইদিকে আসতে দেখেছে।

কেডা? মোহনের মেয়ে? শোন কথা। আমার বউ কাল থেকে পেটের ব্যথায় আতারি-কাতারি করছে। একটুখানি ঘুমিয়েছে দেখে এইঠানটায় এসে একটু বসিছি।

যে-কোন কারণেই হক, আজ হেলার একটা কথাও বিশ্বাস হল না পঞ্চুর।

ওরে পঞ্চা, শোন্, শোন্।

এসে শোনব। অবশিষ্ট দূরত্বটা লম্বা লম্বা পা ফেলে সংক্ষিপ্ত করে ফেলল পঞ্চু।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে দুখানা শোবার ঘর হেলার। নতুন খড়ে ছাওয়া। বাড়ীর ভেতর অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, কিন্তু অমন অন্তঃপুরটা ঘন রাংচিতার বেড়ায় লোকচক্ষু থেকে আড়াল করা। কাটা টিনের আগড়ের সামনে দাঁড়াতেই বাড়ীর ভেতরটা চোখে পড়ল পঞ্চুর। কিন্তু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভেতর ভয় ও সন্দেহের সংমিশ্রণে যে কতখানি আঘাত লুকিয়ে থাকতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তার। বড় ঘরখানার দাওয়ায় বন্ধ দোরের ঠিক সামনে চকচক করছে সাদা মাখনের মত একজোড়া জুতো। চওড়া বুকটা দু হাতে চেপে ধরে মাটির ওপর বসে পড়ল পঞ্চু। দূর থেকে দেখেও জুতোজোড়াটা সে চিনতে পেরেছে। কিছুদিন হল মাঝে মাঝে স্ত্রীর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তার সন্দেহ এসেছে, কিন্তু ভূপতি মজুমদার যে কোনদিন তার ভাগ্যকে এরকম রাহুর মত

গ্রাস করে বসবে, এ কল্পনা সে করেনি। দাঁড়িয়ে উঠে এদিক ওদিক চেয়ে কি খুঁজতে লাগল পঞ্চু, তারপর বিশেষ কিছু না পেয়ে বেড়ার মাঝামাঝি জায়গা থেকে পাঁচ ছ হাত লম্বা একখানা খুঁটির বাঁশ টেনে উপড়ে ফেলল। ঠিক সেই সময় ঝনাৎ করে হেলার ঘরের দোর খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল ভূপতি মজুমদার এবং পঞ্চুর মারমূর্ত্তি দেখেও সহজভাবে বলল, তোর কাছেই যাচ্ছি পঞ্চা। তোর বউ এসে এতক্ষণ ধরে কেঁদে পড়েছিল আমার কাছে। তোর ভায়রাভাই যে জেলে যায়। একটু আগে নাকি খবর এসেছে। বলতে বলতেই চেয়ে দেখল মজুমদার, পাঁচ সাত হাত লম্বা বাঁশের অর্দ্ধাংশ সমস্ত শক্তি দিয়ে মাথার ওপর তুলে যমদূতের মত তার দিকে ছুটে আসছে পঞ্চু। দাওয়ার নীচে উঠানের ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে দুটো হাত আর দুটো পা ওপরে তুলে পরিত্রাহী চিৎকার করে উঠল মজুমদার। ওরে বাবারে! ওরে তোর দুটো পায় পড়ি রে। ওরে পঞ্চারে, ওরে মরে যাব, মরে যাব। ওরে বাবারে, বাবারে, বাবারে।

করুণ আর্ত্তনাদের গুণেই হয়ত সংহার ইচ্ছাটা একটু দমন করল পঞ্চু। বাঁশখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভূপতি মজুমদারের চুলির মুঠি চেপে ধরে তাকে সোজা করে দাঁড় করাল, তারপর লাথির পর লাথি মেরে প্রশস্ত উঠানটার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত গড়িয়ে গিয়ে বেড়াতে লাগল।

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে পঞ্চা। ভদ্দরলোক, ব্রাহ্মণ, মারা গেল যে। ওরে খুনের দায় পড়বি রে হতভাগা, ছাড়্, ছাড়্।

উদভ্রান্ত পঞ্চু চেয়ে দেখল মেয়ে পুরুষে ছোটখাট একটা দল এসে বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে আর অভয় মোড়ল এসে তাকে প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরেছে।

অভয় মোড়ল বলল, ছিঃ ছিঃ পঞ্চা। তোদেরও ছিঃ আর তোমাকেও ছিঃ ঠাকুর, কি আর বলব ?

অভয় মোড়লকে দেখে পঞ্চুর অন্তরাত্মা আর একরম বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। সেবার তুমি বলেছিলে না মোড়ল, তোমাদের ঝি বোয়ের ইজ্জৎ তোমরা রক্ষে করতে পার, আজ আম্‌মো দেখিয়ে দোব, ডুলের মেয়েদের নিয়ে মজা মারতে গেলে কাঁচা মাথাটা সেইখেনেই থুয়ে যেতে হয়, বলেই অভয় মোড়লকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে ভূপতি মজুমদারের দুখানা হাত চেপে ধরল।

ওরে গেছি রে ! ওরে বাবারে ! ওরে আমার কোন দোষ নেই রে। যত নষ্টের গোড়া ঐ শালা হেলা। ওরে হেলা, তুই কোথায় গেলি রে ! ওরে শালা, তুই আমাকে ডোবালি রে !

ভূপতি মজুমদারকে সজোরে গোটাকতক ঝাঁকানি দিয়ে বলল পঞ্চু, হেলা ছোটলোক। তার জন্মের ঠিক নেই। তুমি না ভদ্দরলোক ! তুমি না বামুন, তুমি না জমিদার ? কি অপরাধ তোমার কাছে করিছি বল ত, যে এই সর্ব্বনাশ তুমি করলে ! এই জন্যেই কি তোমার সঙ্গে ছেলেবেলায় মিশেছিলাম ? বলতে বলতে ভূপতির গালে ঠাস ঠাস করে গোটাকতক চড় কষিয়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল পঞ্চু।

অত্যন্ত কুৎসিত এই পরিস্থিতিটাকে সহজ করতে বেশ পাকা চাল চালল অভয় মোড়ল। বাড়ীর বাইরে উৎসুক দর্শকমণ্ডলীর দিকে চেয়ে জোর একটা ধমক দিয়ে বলল, কি করছ তোমরা এখানে ? মজা মারতে এয়েছ, না ? সকলকে পুলিশে সাক্ষী

দিতে নিয়ে যাব। ভাল চাও, এখুনি সরে পড়। পুলিশের নাম শুনে দেখতে দেখতে ভিড়টা পাৎলা হয়ে গেল।

লোক সরিয়ে দিয়ে পঞ্চুর হাত ধরে নিজের কাছে টেনে আনল অভয় মোড়ল, তারপর বলতে লাগল, ছুঁচোর গু আর পব্বত করিস্ নে পঞ্চা। এ তোর ঘরের কেলেঙ্কারী। চেপে যা। যেমন করে পারিস চেপে যা। তারপর ভূপতি মজুমদারকে বলল, আপনিও চেপে যান বাবু। মান বাঁচিয়ে চলতে চান, ত এখনও সাবধান হয়ে যান। গায়ের জোরে আর পয়সার জোরে সব কাজ চালিয়ে দেওয়া যায় না, ধর্ম্ম বলে একটা জিনিস আছে। নিজের গামছা দিয়ে ভূপতি মজুমদারের ধূলোমাখা জামা-কাপড় পরিষ্কার করতে লাগল অভয় মোড়ল।

ভূপতি মজুমদারকে রওনা করে দিয়ে এবং সস্ত্রীক পঞ্চুকে বাড়ী তুলে দিয়ে অভয় মোড়ল চলে গেল।

অভয় মোড়ল চলে যেতেই পঞ্চুর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বউয়ের ওপর। ঘরের মধ্যে কাপড়ের পুঁটুলীর মত জড়সড় হয়ে বসে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল পঞ্চুর বউ।

এই হারামজাদী। ঘরে ঢুকেছিস্ কার হুকুমে? বেরিয়ে আয় বলছি। আভি নেকাল। অসাড় হাত পা নিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠল পঞ্চুর বউ। কানে কথা যাচ্ছে না? শালী ছোটলোকের বাচ্ছা।

প্রচণ্ড একটা লাথি খেয়ে ঘর থেকে দাওয়ায় আছড়ে এসে পড়ল পঞ্চুর বউ। কিন্তু কথা বলা দূরের কথা, কান্নার একটু ক্ষীণ শব্দও বেরুল না তার গলা দিয়ে।

কদ্দিন ধরে এ কারবার চালাচ্ছিস, সত্যি করে বল্।

পঞ্চুর বউ কোন জবাব দিল না। হয়ত দিতে পারল না।

বল্ বলছি। নইলে গলা টিপে সাবাড় করে দোব।

তবুও মুখ তুলল না পঞ্চুর বউ, শুধু চোখদুটো দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে নামতে লাগল।

পেছন থেকে চুলের গোছাটা ধরে হেঁচকা একটা টান দিতেই গ্রীবাদেশটা বেঁকে মুখখানা ওপরের দিকে উঠে গেল পঞ্চুর বউয়ের। বলবি কিনা বল্।

কি বলব বল? এতক্ষণে কথা বলল পঞ্চুর বউ।

এর আগে আর কোনদিন গিছিস না আজ এই পেরথম্?

না, আর কোন দিন যাই নি। তুমি বিশ্বেস কর। আজও জানতাম না তাই গিয়েলাম।

ফের মিছে কথা! জানতিস নে! ন্যাকামো পেয়েছিস্?

চটাস করে একটা চড় মারতেই মুখখানা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে গেল।

বল্। এখনও বলছি, ভাল চাস্ ত ঠিক কথা বল্।

কি বলব বল।

এর আগেও নিশ্চয় গিছিস্। বল্, ঠিক কি না?

স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ নেই, বিশেষ করে খুন চেপে রয়েছে স্বামীর মাথায়, পঞ্চুর বউ চারদিকে অন্ধকার দেখল। ভয়ে ভয়ে চাইতে গিয়ে দেখল মারমুখো হয়ে বাঘের মত ফুলছে পঞ্চু।

এইবার সমস্ত বাক্‌শক্তি একত্র করে বলল পঞ্চুর বউ, ওগো আর মের না গো। কি বললে তোমার হবে, বল, বলছি।

অনেক দিন থেকে এ সব চলছে লুকিয়ে লুকিয়ে, কেমন নয় কি?

হাঁ, ঠিক বলেছ তুমি।

হাঁ, হাঁ। বলতে একটু নজ্জা নাগল না। অশ্রাব্য গাল দিল পঞ্চু, ও রাগে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে উঠান থেকে একগাছা শুকন কঞ্চি কুড়িয়ে এনে বউয়ের পিঠে, বুকে, হাতে, পায়ে, কোমরে যেখানে খুশি সপাসপ ঘা কতক বসিয়ে দিল।

হঠাৎ যেন মনে হল পঞ্চুর বউয়ের জীবনের মিয়াদ নিঃশেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। অগত্যা মরিয়া হয়েই বলে উঠল, মেরে ফ্যালাও, মেরে ফ্যালাও। শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর শেষ করে ত্যাও। আর আমি সহ্যি করতে পারছি নে, ওগো মা গো!

দাঁতে দাঁত চেপে বলল পঞ্চু, মা, মা। তোর মাও ঐ। নইলে এমন মেয়ে জরমায়। বলেই বউয়ের তুটো হাত বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরল পঞ্চু।

ওকি করছ পঞ্চুদা? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।

কোনরকমে পঞ্চুর কবল থেকে বউকে উদ্ধার করল সাবি। সাবিকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে পিছন দিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল পঞ্চুর বউ, ওগো ঠাকুরঝি গো! তুমি আমাকে বাঁচাও। মেরে ফেলল আমারে। আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে।

পঞ্চুর বউয়ের পিঠে, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে চমকে উঠল সাবি, অনেক জায়গায় ফেটে গিয়ে রক্ত ফুটে উঠেছে।

হাতের কঞ্চিটা ফেলে দিয়ে বসে পড়ল পঞ্চু।

সাবি বলল, ছিঃ, পঞ্চুদা। এমন করে মারে? দেখ ত কি হয়েছে।

ওরে খুন করে ফেলব সাবি। একেবারে নিকেশ করে দোব। তুই কি বলছিস?

তা করবা বৈ কি। ঐটেই ত পার তোমরা। এখন একটু সরে যাও দিকি ?

ওরে আমি এক কাপড়ে বিদেয় করে তবে সরব।

বেশ তাই কর। এখন একটু চুপ করবে কি ? তারপর পঞ্চুর বউকে বলল, তুমি এইখেনে ঠেস দিয়ে একটু বস ত বউদি। জল খাবা একটু ?

দেবে ভাই ? বড্ড তেষ্টা নেগেছে।

বড় একটা ঘটি করে জল গড়িয়ে আনল সাবি। তারপর অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে তার চোখ মুখগুনো ভাল করে ধুইয়ে দিয়ে অবশিষ্ট জলটা তাকে খেতে দিল। কতকটা সুস্থ ও তার চেয়ে বেশী আশ্বস্ত হয়ে তুঃখ ও ও অভিমানের স্বাভাবিক বোধটা দিয়ে পেল পঞ্চুর বউ। সাবির কোলে মাথা গুঁজে ছোট মেয়ের মত কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

পঞ্চুর দিকে চেয়ে বলল সাবি, যাও। বেলা হয়েছে। বাঁওড় থেকেই একটু ডুব দিয়ে এস। মাথাটা ঠাণ্ডা হক।

এতক্ষণে চোখমুখের ভাব একটু সহজ হয়ে পঞ্চুর চোখেও জল দেখা দিল।

ডুব দিয়ে আসতে বলছিস, বাইরে বেরুব কি করে বল্‌ত ? আমার মুখখানা যে পুড়িয়ে দিয়েছে ঐ ছোটনোকের বিটী।

একটু হেসে বলল সাবি, মুখ তোমার কেউ পোড়ায় নি পঞ্চুদা। নিজের মুখ তুমি নিজেই পোড়াচ্ছ।

তুই কিছু জানিস নে, তাই ঐ কথা বলছিস। জানলে আর বলতিস না।

আমি ত জানিই নে। তুমিই কি সব জানতে পেরেছ ?

পাড়ার লোকও যেমন তিলকে তাল করে নাচছে, তুমিও তাই করে ও বেচারীর গতর থেঁতো করছ।

পঞ্চু এইবার বিরক্ত হল। আমি জানি নে মানে? নিজের চোখে ত্মাখ্‌লাম……

বাধা দিয়ে বলল সাবি, থাক্। ও জানার কথা আমি বলছি নে।

তবে ওরেই জিগ্যেস্ কর।

তা ত করবই।

সাবিকে স্বপক্ষে পেয়ে বলতে লাগল পঞ্চুর বউ, দেখ ঠাকুরঝি, এই তোমার দিব্যি করে বলছি, মুই কিছু জানতাম না। হেলার বউ এসে বলল, ঝক্ করে চল্, তোর জামাইদাদা এয়েছে, আমাদের বাড়ী বসে আছে, তোরে ডাকছে চল্। গিয়ে দেখি, মিছে কথা… বলে লজ্জায় মুখ নীচু করে চুপ করে গেল পঞ্চুর বউ।

সাবি বাধা দিয়ে বলল, ও সব কথা পরে শুনব। তারপর পঞ্চুকে বলল, বাইরে যেতে না চাও, একটু বস। আমি জল এনে দিচ্ছি কল থেকে, চান কর। এস ত বৌদি, আমার সঙ্গে এস ত।

বলে একটা কলসী আর বালতি নিয়ে পঞ্চুর বউয়ের সঙ্গে বাইরে গেল সাবি

৬

সহর থেকে মাছ বেচে পড়ন্ত বেলায় বাড়ী এল সাবি। দাঁড়িপাল্লা সের বাটখারা সমেত মাছের ঝুড়ি ডালা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে দয়াকে ডেকে বলল, এইটে ধর ত দিদিমা, আমি আসছি এখ্‌খুনি। টাকা পয়সার থলিটা পেটকাপড়ের থেকে বের করে দয়ার হাতে তুলে দিল।

দয়া জিজ্ঞাসা করল, তেতেপুড়ে এসে না খেয়েদেয়ে কমনে আবার চললি সাবি ?

যা হক একটা জবাব দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল সাবি।

ভূপতি মজুমদার আর পঞ্চুর কথা নিয়ে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। এতবড় বিস্ময়কর আলোচনার সুযোগ গ্রামবাসীদের জীবনে কখনো আসে নি। হাটে বাজারে, বৈঠকে মজলিসে নিত্য নতুন খবর আসছে। পঞ্চুর নামে মামলা রুজু হয়ে গেছে,— চারপাঁচটা দণ্ডবিধির ধারা জড়িয়ে ফৌজদারী মামলা। পঞ্চুও নাকি জয়দ্রথবধের মত পণ করেছে, ভূপতি মজুমদার আর হেলার মাথাদুটো তাদের দেহের সঙ্গে আর একত্র রাখবে না। হেলা স্ত্রীপুত্র নিয়ে শ্বশুরবাড়ীর দেশে আশ্রয় নেবে সংকল্প করেছে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে কৌতুকপুরে অভয় মোড়লের কাছে গেল সাবি। প্রকাণ্ড বঁটি পেতে তখন বিচুলি কাটছিল অভয় মোড়ল। সাবি এসে সামনে দাঁড়াতেই অভয় মোড়ল বলল, কে গো! সাবি যে! অবেলায় কি মনে করে? ওরে দুলো, বেতের মোড়াটা দিয়ে যা ত চট্ করে।

না, না। আমি এইখানেই বসছি। আমাকে আর বসবার জায়গা দিতে হবে না মোড়লদা।

অভয় মোড়লের বার তের বছরের ছেলে দুলাল একটা বেতের মোড়া এনে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। বিচুলি কাটা বন্ধ রেখে সাবির কাছে সরে এল অভয় মোড়ল। তা হয় না সাবি, মানুষজন বাড়ী এলে খাতের করতে হয়। তা অডিনারি লোকই হক আর বড়লোকই হক। তুই বস ভাই। লজ্জা করিস নে। পরে দুলালের দিকে চেয়ে বলল, দুলু! এখানে দাঁড়িয়ে থেক না। উদিকে যাও।

দুলাল চলে গেলে অভয় মোড়ল বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ রে সাবি। পঞ্চা না কি তোরে নিকে করবে? কথাটা শুনলাম, তাই জিগ্যেস্ করছি।

ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসায়, সাবির কথাবার্ত্তায় আর কোন জড়তা ছিল না।

আমিও একটা কথা শুনলাম মোড়লদা। সেইটে জিগ্যেস্ করতেই কাছে এলাম।

বল্ কি শুনিছিস্। আমার কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। যা জানি, বলব।

তুমি নাকি মজুমদার মশাইয়ের হয়ে সাক্ষী দিচ্ছ। আমারও শোনা কথা, তুমি কিছু মনে কর না মোড়লদা।

ননসেন্। তবে কথাটা হয়েছিল। মজুমদারের লোক আমারে বলেওছিল। কিন্তু সাক্ষী দিতে হয়, যা দেখিছি, তাই বলব। ওসব মিথ্যে সাক্ষী-টাক্ষি মোড়লদের চোদ্দ পুরুষে কখন দেয় নি।

মিথ্যে সাক্ষীটে কি দিতে হবে?

সে ওনাদের মনগড়া। গরীব মারবার কল। হেলার বাড়ী চড়াও হয়ে নাকি হেলারে, হেলার বউরে মারপিট করেছে পঞ্চা। ঘরের জিনিসপত্তর তছরুপ করেছে, টাকা কেড়ে নিয়েছে।

চমকে উঠে বলল সাবি, এর সাক্ষী জুটবে?

জুটবে না? কলিকাল যে! শুনলাম রমাপতি বাবু পর্য্যন্ত নাকি সাক্ষী দেবেন!

খপ্ করে অভয় মোড়লের দুটো পা চেপে ধরে বলল সাবি, তা ছিক্। তুমি যখন না বলছ। ওতেই ও মামলা ফেঁসে যাবে। ডাক্তারবাবু মিথ্যে সাক্ষী দিলেও কিছু হবে না।

তোর হল কি সাবি ? এতে পায় ধরবার কি আছে ? আমার গলা কেটে ফেললেও সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলতে পারব না। তা সে মজুমদার ত থোড়া, স্বয়ং ভগবান বললেও নয়।

তোমার মতন লোকের পায়ের ধুলো নিলে পাপ কেটে যায় মোড়লদা।

অভয় মোড়লকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল সাবি। মোড়ল পাড়া থেকে বেরিয়ে কৌতুকপুরের বাজারের দিকে চলল। নিভৃত সরু পথ ;—দুপাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে উঁচু নীচু, সংকীর্ণ। দুদিক থেকে ঝুঁকেপড়া বাঁশবনের ঘনসন্নিবেশের ভেতর আকাশের চেহারা চোখেই পড়ে না। ইতিমধ্যে যে ঈশানকোনে কখন মেঘ জমে কালবোশেখীর সূচনা দেখা দিয়েছে, সে দিকে কোন খেয়ালই ছিল না তার। কৌতুকপুরের বাজারে আসতে না আসতেই চতুর্দ্দিক তোলপাড় করে ধুলোর সঙ্গে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করল।

বাজারের ভেতর দিয়ে চলাচলতির পথ এখন আর নিষিদ্ধ এলাকা নয় সাবির। তবুও সারি সারি দোকানের ভেতরে বাইরে বহুলোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে ঝড়ঝাপটায় বিস্রস্ত কেশবেশ নিয়ে রীতিমত বিব্রত হয়ে উঠল সাবি। রমাপতির ডাক্তারখানার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি তখন তার ধুলোবালিতে ঝাপসা হয়ে গেছে।

রমাপতির ডাক্তারখানা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে খবরের কাগজ পড়ছিল রমাপতি। প্রায় তিনমাস পরে সাবিকে সামনা-সামনি দেখে তার মুখখানায় বিস্ময় ও কৌতূহলের ছায়া পড়ল। তখনও দুহাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে সাবি।

কোনরকম সঙ্কোচ না করে সাবির সামনে গিয়ে তার দুখানা হাত ধরে বলল রমাপতি, উঁ হুঁ হুঁ, ও কি করছ? গঙ্গার বালি কাঁচের মত করকরে। ও রকম করে রগড়ালে চোখদুটো যাবে। এবং সাবির উত্তরের অপেক্ষা না করে পরিষ্কার জল দিয়ে তার চোখদুটো ধুইয়ে দিয়ে, তুলো পাকিয়ে তুলির মত করে দুটো চোখ যথাসম্ভব পরিষ্কার করে দিল। ধূসর দিনান্তের বিদায়ী আভায় রমাপতির চোখে পড়ল সাবির মুখখানায় রক্তিমাভা ফুটে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

রমাপতি বলল, তোমাকে আমি খুঁজছিলাম সাবিত্রী। এসেছ, ভালই হয়েছে।

আমাকে এখন অনেকেই খোঁজে ডাক্তারবাবু, ওটা কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু আমার আজ আপনাকে বড্ড দরকার, তাই সব কাজ ফেলে ছুটে এইছি।

চতুর রমাপতির বুঝতে বাকী থাকল না, তার কথা শুনতে আর বিশেষ কোন তাগিদ নেই সাবির।

বেশ। বল, তোমার কি দরকার?

দেখুন। এখন আমি ব্যাওসাদার লোক। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পেটের ধান্দায় ছুটোছুটি করি। পেট আমার একটাই আছে, কিন্তু পেটের খিদে অনেক বেড়ে গেছে।

হেসে উঠে বলল রমাপতি, ব্যবসাদার ঠিক কতখানি হয়েছ বলতে পারি নে, তবে কথা বেশ ঘুরিয়ে বলতে শিখেছ দেখতে পাচ্ছি। এখন আমি কি করতে পারি, তাই বল।

আসল কথাটা পাড়তে লজ্জা করছিল বলেই ভূমিকার ওপর জোর দিচ্ছিল সাবি। একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, আপনার কাছে আমি কোনদিন কিছু চাই নি ডাক্তারবাবু··· ।

সাবিকে শেষ করতে না দিয়েই বলল রমাপতি, কিন্তু আমার কথাটা যদি শুনতে চাইতে, তা হলে আমি আগেই বলতাম, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে আমার ভাল হয় নি, হয়ত আর ভাল হবেও না।

ব্যবসাদার সাবির মাথা থেকে লাভ লোকসানের ছকটা কোথায় মিলিয়ে গেল। পাংশুমুখে বলল, কেন? ও কথা কেন বলছেন? বিশু, মঞ্জু, খোকা ত ভালই আছে, আমি জানি।

সে খবরটা যে তুমি রাখ, তুমি না জানালেও আমি জানি। কিন্তু কথাটা ঠিক তা নয়। কেন জানি নে, সংসারটা আমার ভাল চলছে না। মনে হচ্ছে, একগাছের ছাল আর একগাছে ঠিক জোড়া লাগে না।

মোটে ঐ কদিন বিয়ে করেছেন, এর মধ্যে এ কথা বলা আপনার ভাল হচ্ছে না ডাক্তারবাবু। আপনি যদি তাঁকে বিশ্বাস করেন, দেখবেন সব ঠিক থাকবে। আর আপনি যদি ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁকে পর ভাবেন, তিনি কি করে পরের ছেলে মেয়েকে আপনার করে নেবেন বলুন ত?

রমাপতি অবাক হয়ে সাবির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তুমি ঠিক বলছ সাবিত্রী?

বিয়ে যখন করেছেন, এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই ডাক্তারবাবু।

মানলাম। কিন্তু তুমি যে যত্ন দেখিয়ে গেছ, তার সঙ্গে মেলাতে ত কিছুই খুঁজে পাই নে। কি করে বিশ্বাস আসবে বল?

রমাপতির উৎসুক দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে মাথাটা একটু হেঁট করল সাবি, তারপর বলল, সন্তান যে কি জিনিস আগে তাঁকে বুঝতে দিন, তারপর ও কথা বলবেন।

কি সর্ব্বনাশ! এমনিই রক্ষে নেই, এর ওপর নিজের সন্তান হলে পরের ছেলেমেয়েকে আর দেখবে মনে কর?

কি ভয়ানক লোক আপনি ডাক্তারবাবু! বিশুর মায়ের পেটে জন্মাবে না বলে, তারা কি আপনার সন্তান হবে না? মেয়েমানুষ না হলেও চলবে না, বিশ্বাস করতেও পারবেন না। আবার মেয়েমানুষকে কোনদিন ভালবাসতেও পারবেন না। এ রকম করলে আপনার সংসারে কি করে শান্তি হবে বলুন ত?

সাবির কথা বলার ভঙ্গীতে, তার চোখ মুখের চেহারা দেখে, এটুকু অন্ততঃ বুঝে নিল রমাপতি, মনের অকপট বিশ্বাসটাই মুখ দিয়ে প্রকাশ করছে সাবি।

রমাপতি বলল, তোমার কথা আমি ভেবে দেখব সাবিত্রী। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি সামান্য তুলের মেয়ে হয়ে অত তুমি শিখলে কোথায়?

কোথায় শিখলাম? অস্তগামী সূর্য্যের গেরুয়া আভার মত কি একটা রং দেখা দিল সাবির মুখে।

রমাপতির ডাক্তারখানার বাইরে বহিঃপ্রকৃতি তখন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেছে। ঝড়ের ঝাপটায় খড়ে ছাওয়া চালাখানা নড় নড় করে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সাবির ভবিষ্যৎবাণীটা রমাপতির একগুঁয়ে মনটাকে ঝড়ের মত গোটাকতক দোলা দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমাপতি সাবিকে জিজ্ঞাসা করল, কই? তোমার কথা ত কিছু বললে না সাবিত্রী?

হ্যাঁ। বলছি। কিন্তু আগে বলুন, আমার কথাটা রাখবেন?

যে কারণেই হক, রমাপতির বুদ্ধি আজ সরল বিশ্বাসের বাঁধা পথ

দিয়েই চলল। এককথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, নিশ্চয়ই রাখব। বল কি করতে হবে?

আপনি না কি পঞ্চুদার বিপক্ষে সাক্ষী দেবেন?

দোব কি না এখনও ঠিক করি নি, তবে দিতে হবে বলেই মনে হচ্ছে।

না, দেবেন না। মিছিমিছি কেন পরের অনিষ্ট করবেন?

বেশ। কথা দিলাম, দোব না। কিন্তু একটু আগে যে কথাগুলো শোনাচ্ছিলে, ভাল করে ভালবাসতে, বিশ্বাস করতে, এই সাক্ষী যদি না দিই, ঘরের লক্ষ্মী আমার চঞ্চলা হয়ে উঠবেন।

কেন?

কারণ তিনি ভূপতিবাবুর ভাগ্নী। কাজেই সুপারিশটা যে কোনদিক থেকে আসছে, বুঝতেই পারছ।

শুনে সাবির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল।

রমাপতি বলল, ভয় নেই। দুর্জ্জনের ছলের অভাব হবে না। ও আমি ঠিক সামলে নোব।

কি করে যে সামলে নেবে, সাহস করে আর জিজ্ঞাসা করতে পারল না সাবি।

রমাপতি বলতে লাগল, মামলা রুজু হয়ে গেছে। ধরলাম মিথ্যে মোকর্দ্দমা ফেঁসে গেল কিন্তু তাতেই কি রেহাই পাবে পঞ্চু? বড়লোকের সঙ্গে বাদ করে গরীব কি কোনদিন বেঁচেছে, যে পঞ্চু বাঁচবে?

বাদ ত পঞ্চুদা করতে যায় নি ডাক্তারবাবু। ওপর পড়া হয়ে কেউ যদি তার ওপর শত্রুতা করতে যায়, সে দোষ কি তার?

চুপ কর সাবিত্রী। ঝড় থেমেছে। এ গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক

এখন ভূপতিবাবুর চর। কেউ কোথায় শুনতে পাবে। তারপর গলা নামিয়ে আবার বলল, রমাপতি, তুমি এখন বাড়ী যাও। আমার কথা ঠিক থাকবে। তবে যদি পার, পঞ্চুকে কিছুদিন গা ঢাকা দিতে বল। নইলে তার বাঁচবার কোন উপায় নেই। তা ছাড়া সেও যে রকম খেপে আছে। কোনদিন একটা খুনখারাপি করে বসবে। শেষ কথাটায় মুখখানা ছাইয়ের মতন দেখাল সাবির।

রমাপতি ঘরের পেছনদিকের ছোট দোর খুলে বাইরে আসতে গিয়ে দেখল সাবি, অস্পষ্ট আলোয় দুজন লোক ছায়ার মত দোরের পাশ থেকে সরে দুধারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ভয় পেয়ে দোরটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে আসতেই রমাপতি তার দুটো হাত ধরে বলল, দেখলে? এই আমি বলছিলাম। আর দাঁড়িয়ো না, শিগ্‌গীর বেরিয়ে পড়। বলে নিজে দোর খুলে দিয়ে সাবির কানে কানে বলল রমাপতি, গোয়েন্দা পালিয়েছে। এখুনি খোদ কর্ত্তা আসবেন।

কিন্তু আপনার কোন বিপদ হবে না ত ডাক্তারবাবু?

তুমি যাও সাবিত্রী, আর একটুও দাঁড়িয়ো না।

সাবি চলে গেল।

৭

দিন দুই পরে। মাছ বেচে এসে খেতে বসেছে সাবি, দয়া এসে খবর দিল পঞ্চু বউকে তিন দিন খেতে দেয় নি, বাইরে বাইরে কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কোনরকমে বাপকে খবর দিয়ে ডেকে এনে তার সঙ্গে বাপের বাড়ী চলে গেছে পঞ্চুর বউ। দয়া বলতে লাগল, এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড কখন দেখি নি বাপু। রীতের দোষে

নষ্ট, কুচক্কুরে লোকের পাল্লায় পড়ে একটা মন্দ কাজ করে ফেলেছে, তার জন্যে অত ? ঢুলের ঘরে আজকাল সতীলক্ষ্মী কডা আছে শুনি ?

সাবি বলল, চলে গিয়েছে ? তুমি ঠিক জান দিদিমা ?

হ্যাদ্ ছ্যাখ। আমি কি মিছে কথা বলছি না কি ?

তুমি নিজের চোখে দেখেছ না শোনা কথা বলছ, ঠিক করে বল দিকি ?

চোখে ঠিক না দেখলেও, বিশ্বস্তসূত্রে খবরটা জেনেছিল দয়া। সাবির কথার ভাবে সে একেবারে জ্বলে উঠল।

কেন বল্ ত লা ? সে চলে গেলে কি তুই রাজরাণী হবি না কি ?

খাওয়া সেরে এঁটো বাসনগুলো নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলল সাবি, সে চলে না গেলে পঞ্চুদারে ত এখানে আনতে পারি নে, তাই বলছি।

কি বললি সাবি ? পঞ্চারে এখেনে আনবি ? কেন ? সে এসে বুঝি তোর ভাঙ্গা ঘর তুলে দেবে ?

না, তা নয়। তবে তুমি বড্ড বুড়ো হয়েছ, সব কাজ আর পেরে ওঠ না। আর আমারও ছাই সময় নেই, এখেনে দুটো খাবে দাবে কাজ কম্ম করবে, থাকবে।

ও সেই জন্যে তারে পুষবি ? সে কি তোর ভাত রেঁধে দেবে, না ঘর নিকুবে ?

কোনরকমে হাসি চেপে বলল সাবি, তা না করুক, রাত্তিরে তোমার পা হাতগুলো একটু টিপে দিতেও ত পারবে।

তোর এখন গিলেকুটে রস হল বুঝি ? আমার বলে হাত পা, মাজা কেম্‌ড়ে খসে পড়ছে।

সেই জন্যেই ত বলছি, এখন কেডা যদি একটু টিপে ছায়, ভাল হয় না ?

তুই থাম্ ছুঁড়ী। ফচ্‌কমো করবার আর লোক পেলি নে, না ?

সাবি আর দয়া পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। সেদিনকার দুর্বিপাকের পর থেকে সাবিকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে পঞ্চু। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকরকম করে এ তার কানে তুলেছে। বউকে ছেড়ে দিয়ে সে সাবিকে নিয়ে থাকবে, তাকে নিকে করে ঘরে তুলবে। নিতান্ত ঝোঁকের মাথায় প্রস্তাব, অত্যন্ত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সংকল্প, তবুও তার পুরোপুরি রূপটা ত সাবির মনের বিস্মৃত স্বপ্নের একটা দিক। পঞ্চুর বউয়ের দুঃখ দুর্গতির ক্ষোভটা যত বড়ই হক, সে ত তার সমগ্র মনের এলাকাভুক্ত ব্যাপার নয়। সেইজন্যই হয়ত ঠাট্টার ছলে দয়ার মনটাকে ছোঁবার চেষ্টা করছিল সাবি,—ভিখারীর মত হাত পাতছিল ভয়ে ভয়ে, যদি হাল্কা আলোচনার ভেতর দিয়েও সামাজিক সমর্থনের ছিটে-ফোঁটাও আদায় করতে পারে দয়ার কাছ থেকে। দয়ার নাক ডেকে উঠল, কিন্তু সাবির ঘুম হল না। একবার মনে হল বুড়ীকে ডেকে তোলে, পঞ্চুর কথাটা নিয়ে নতুন করে আরম্ভ করে। কিন্তু দয়ার মনটা যে রকম চাবি তালা আঁটা, সেখানে তার কোন কথাই পৌঁছুবে বলে মনে হয় না। বহুদূরে হুইসিল্ দিয়ে শেষ গাড়ীখানা ছাড়ল শুনতে পেল সাবি, টু ডাউন। রাত তা হলে বারটা বেজে গেছে। ঘড়ির ঘণ্টার সঙ্গে এখন তার খাওয়া, শোয়া, ওঠা বসার নিয়ম গাঁথা। ভোরে উঠে তৈরী হয়ে, মাছ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে আটটার মধ্যে। সাড়ে আটটার গাড়ী। মাছের ঘাট থেকে কুড়ি

মিনিটের রাস্তা ষ্টেশন। ষ্টেশনের বড় বাবু, মেজ বাবু, বুকিং বাবুর পাওনা মেটাতে পাঁচ মিনিট। সহর বাজারের বেচাকেনা, নটা থেকে দশটার মধ্যেই শেষ। সামান্য কদিনের মধ্যেই এই বাঁধাধরা জীবনের সঙ্গে বেশ মিশে গেছে সাবি। অল্পদামে মাছ সওদা করা আর চড়াদরে বিক্রী, এই দুটি মূলসূত্রের মধ্যেই তার নারীজীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্খা, সুখ দুঃখ নিঃশেষ, সীমাবদ্ধ। ওজনের মারপ্যাঁচ ঠিকমত রপ্ত না হলেও, বেশ দুপয়সা জমে গেছে হাতে, জামা কাপড় ইচ্ছামত কিনেছে। আধভরির আংটি গড়িয়েছে। দয়া দিদিমাকে ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা খাবার খাওয়াচ্ছে রোজ।

তবুও যখন টু ডাউনের শব্দ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল একটু একটু করে, অথচ দুটি চোখের পাতায় ঘুমের কোন ভারই নামল না, বিনা দ্বিধায় ঠিক করে ফেলল সাবি, কাল আর মাছ নিয়ে যাবে না, শুধু জেলেকে একটু জানিয়ে দিতে হবে, মাছটা যেন আর কাউকে দিয়ে দেয়।

কিন্তু ভোর হবার আগেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঠিক ঘুম ভাঙ্গল সাবির। নিয়মমত খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, পঞ্চু এসে সামনে দাঁড়াল এবং সাবির গতরাত্রের সংকল্পটা হুবহু বলে গেল: আজ আর মাছ নিয়ে যাস্ নে সাবি।

কেন বল ত?

শোনলাম, দারোগা পুলিশ আসছে। আজই না কি এন্‌কোয়ারী হবে।

মনে মনে একটু শক্ত হতে চেষ্টা করল সাবি; বলল, হবে, হবে। তার আমি কি করব?

না গেলে কি তোর বড্ড ক্ষেতি হবে সাবি?

না, ক্ষেতি তেমন হবে না। তবে জেলেকে একটু খবর দিতে হবে, যেন আমার জন্মে মাছ নিয়ে না বসে থাকে।

ও আমি এখ্‌খুনি বলে আসছি। বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল পঞ্চু।

বেলা দশটা বাজতে না বাজতেই হেলার বাড়ীতে লোকারণ্য হয়ে উঠল। প্রাঙ্গণে দু তিনটে পত্রবহুল চারাপেঁপেগাছের ছায়ায় অনেকগুলো চেয়ার পাতা। উচিতপুরের বড় দারোগা, পার্শ্ববর্ত্তী ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট্ সদরদ্দি মুন্সী। কৌতুকপুরের প্রেসিডেণ্ট্ নৃপতি মজুমদার, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ রামহরি সাধুখাঁ, আরও জনকতক বিশিষ্ট ব্যক্তি চেয়ারগুলো দখল করে বসেছেন। দারোগার পাশে থানার ডায়েরী হাতে দাঁড়িয়ে রাইটার বাবু। খাকী পোষাক-পরা লালপাগড়ী-ধারী বেঙ্গল পুলিশের তক্‌মাআঁটা জমাদার আর গ্রাম্য দফাদারের সঙ্গে পঞ্চু এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন পিছন ছেলেয় বুড়োয় লম্বা একটা দল ঘটনাস্থলে এসে গোল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

দারোগাবাবু প্রবীণ, মেদবহুল চেহারা; জমকাল গোঁফ আর প্রশস্ত টাকে বেশ জবরদস্ত্ কর্ম্মচারী বলেই মনে হয়।

পঞ্চুকে দেখেই দারোগার কানে কানে কি বলল মজুমদার। এক পলকে পঞ্চুকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে রাইটারের হাত থেকে ডায়েরীখানা টেনে তার পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন দারোগাবাবু।

এই বেটা। ইদিকে আয়। সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে হুকুম করলেন দারোগাবাবু। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দারোগাবাবুর কাছে দাঁড়ল পঞ্চু।

তোর নাম কি

শ্রীপঞ্চানন মাল্লিক।

মাল্লিকটা আবার কি রে হারামজাদা ?

ভূপতি মজুমদার একটু মুখ টিপে হাসল। সদরুদ্দি সাহেব বলল তুলে লিখে নিন হুজুর।

বাদী কোথায় ? দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

দফাদার হেঁকে ডাকল ঃ কম্‌নে রে হেলা, তোরা ইদিকে আয়।

বিস্মিত পঞ্চুর চোখের সামনে হাতে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে চুণহলুদ মাখা হেলা ও আপাদমস্তক চাদরজড়ান হেলার বউ কোনরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ভদ্রমণ্ডলীর সামনে বসে পড়ল।

ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট্‌ রামহরি সাধুখাঁ জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে তোদের খুলে বল হুজুরের কাছে।

শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেল পঞ্চু। পরিষ্কারভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে মাঝে মাঝে কান্নার অভিনয় করে বেমালুম একটি গল্প বলে গেল হেলা আর তার বউ। কি করে পঞ্চু তাদের বাড়ী চড়াও হয়ে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে তাদের দুজনকে বেপরোয়া মারপিঠ করেছে। হেলার বউকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ করেছে। শুধু তাই নয়, দরজার ভাঙ্গা খিল, ভাঙ্গা বাক্স পেঁটরা দেখিয়ে আরও প্রমাণ দিয়ে গেল, দামী জিনিসে টাকায় অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছে।

হঠাৎ জোর দিয়ে বলল পঞ্চু, মিথ্যে কথা হুজুর, সব সাজান ব্যাপার।

পঞ্চুর কথার ভঙ্গিতে সবাই একটু চমকে উঠল, কিন্তু দারোগাবাবু অত সহজ লোক নন। চোখমুখ লাল করে বললেন, চোপ। শালা

শূয়োর। তোকে কে কথা বলতে বলেছে, উল্লুকের বাচ্ছা। তারপর হেলাকে বললেন, সাক্ষী আছে তোর ?

এইবার জবাব দিল ভূপতি মজুমদার, নিশ্চয় আছে। বলেই সমবেত জনতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে দফাদারকে জিজ্ঞাসা করল, অভয় মোড়ল কই ?

দফাদার মুখখানা বিনয়ে কাচুমাচু করে বলল, আজ্ঞে ধম্মবতার ! তিনি ত এল না। অভয় মোড়লকে এতটা চিনত ভূপতি মজুমদার যে এলনা শুধু এইটুকু শুনেই আর দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলল না।

থাক্। ডাক্তার কই ?

আজ্ঞে, তিনি সেই ভোরে কমনে ডাকে বেরিয়েছে, এখনও আসে নি।

ভূপতি মজুমদারের মুখখানায় ছায়া পড়ল।

চাপাগলায় বললেন দারোগাবাবু, কি ? সব গরহাজির না কি ?

না, না। আরও অনেক আছে। বলতেই এক এক জন করে চার পাঁচ জন সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হল।

পঞ্চু দেখল অভিযোগগুলো মোটামুটি ভালই বর্ণনা করল সাক্ষীরা, অনেকেই পঞ্চুর বিশেষ জানাশোনা এবং বেশীর ভাগ তারই স্বজাতি।

বাদীপক্ষের জবানবন্দি শেষ করে পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করলেন দারোগাবাবু, এইবার তোর কি বলবার আছে বল্।

দাঁড়িয়ে উঠে বলল পঞ্চু, আমার কিচ্ছু বলবার নেই হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলমাল উঠল। তার মধ্যে ভিড় সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল সাবি এবং পঞ্চুকে বলল, কেন নিজের ঘাড়ে দোষ টেনে নিচ্ছ পঞ্চুদা। বল, ও সব মিছে কথা।

বোমা ফাটার মত চিৎকার করে বলল মজুমদার, ও সব চলবে না। সাজেশ্চান চলবে না। কে তোকে এখানে ডেকেছে?

কতকটা উত্তেজনায় ও কতকটা সঙ্কোচে সাবির গালদুটোয় যে অগ্নিবর্ণ ফুটে উঠল, সেই দিকে চেয়ে আত্মগত ভাবেই বললেন দারোগাবাবু, এ কে? এ যে দেখছি খাসা জিনিস। তারপর পঞ্চুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ তোর কে রে? কোত্থেকে জোটালি বল্ ত?

পঞ্চু বলল, ও এই গাঁয়েরই মেয়ে হুজুর।

ভূপতি মজুমদারের মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন দারোগা বাবু, তোর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি?

সাবি বলল, সেটা এই বাবুদেরই জিজ্ঞাসা করুন। তবে আমি যখন গাঁয়ের মেয়ে, আমিও কিছু জানি বলেই বলতে এইছি।

ও, তুমি সাক্ষী। বেশ, কি জান বল।

না, আমি সাক্ষী নই। তবে যদি সময় দেন, সত্যিকারের যারা সাক্ষী তাদের যোগাড় করে দিতে পারি।

যোগাড় করে রাখ নি কেন?

জানতে পারি নি, তাই রাখিনি।

কেন? প্রেসিডেন্ট বাবু তোমাদের খবর দেন নি?

এইবার একসঙ্গে দুই প্রেসিডেন্ট হৈ চৈ করে উঠল এবং কাগজপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করে দিল, যথাসময়ে খবর তারা ঠিকই পাঠিয়েছে।

বাড়ী চড়াও হয়ে মারপিট করা আর টাকা চুরির অভিযোগে পঞ্চুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন দারোগাবাবু।

দিন দুই পরে। মহাকুমা হাজত থেকে পঞ্চুকে জামিনে খালাস করে এনেছে সাবি।

রাত যে কত হয়েছিল ঠিক ছিল না। সাবির ঘরের দোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকল পঞ্চু। সাবি প্রায় জেগেই ছিল, এক ডাকে উঠে এসে দোর খুলে দিল।

দিদিমা কমনে? ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল পঞ্চু।

ঘুমুচ্ছে। কোথায় যাচ্ছ পঞ্চুদা?

একটু তফাতে চ। বুড়ী শুনতে পাবে। সাবির একখানা হাত ধরে বলল পঞ্চু।

দাওয়ার অন্ধকার থেকে ফাঁকে নামতেই পঞ্চুর আগাগোড়া চেহারাটা চোখে পড়ল সাবির। গায়ে কাল কোট, পরণে কাল কাপড়ের হাফপ্যাণ্ট, মাথামুখে কাপড় জড়ান, হাতে একখানা লম্বা খেজুরগাছ কাটা দা। আপাদমস্তক ভয়ে শিউরে উঠল সাবির।

কোথায় যাচ্ছ পঞ্চুদা? সাবির গলার স্বর কেঁপে উঠল।

তোর কাছেই এলাম। জানিনে আর তোর সঙ্গে দেখা হবে কি না।

কাঁদ কাঁদ হয়ে জিজ্ঞাসা করল সাবি, আমার মাথা খাও, সত্যি করে বল কোথায় যাচ্ছ?

দীর্ঘায়ত দেহটা দেখতে দেখতে আরও বড় হয়ে উঠল পঞ্চুর।

হেলাকে আজ শেষ করে দোব। তিনবার তার ঘরের মণ্ডা দিয়ে ঘুরে এইছি। ও লাঠি ফাটি নয়। শালার কইমাছের জান, বেঁচে ওঠবে। এই একটা কোপ। আর দেখতে হবে না। বলে সাবির হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে শূন্যে দাখানা দিয়ে আঘাত করার ভঙ্গি করল পঞ্চু।

পঞ্চুর ভয়ঙ্কর সংকল্পে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল সাবির। সেদিন রমাপতিবাবুও ঠিক এই কথা বলেছিলেন। তারপর তার পায়ের কাছে বসে পড়ে দুহাত দিয়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার পায়ে পড়ি পঞ্চুদা অমন কাজ কর না। এ করলে আর বাঁচবার কোন পথ থাকবে না।

বেঁচে আর কি সুখ আছে সাবি? গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠল পঞ্চুর। কি আছে আমার যার জন্যে এতবড় অত্যাচার সয়ে বেঁচে থাকব?

পা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সমস্ত অন্তরাবেগ দিয়ে পঞ্চুর দেহটা জড়িয়ে ধরল সাবি, আমি আছি পঞ্চুদা। চল, তোমাকে নিয়ে কোনখানে পালিয়ে যাই। জায়গা আমার ঠিক করাই আছে।

সুকুমার নারীদেহের নিষ্পেষণে দুর্দ্দান্ত হিংস্র ভাবটা একটু নরম হয়ে গেল পঞ্চুর। হাত থেকে ভীষণ মারণাস্ত্রটা মাটিতে ফেলে দিয়ে সেও অনুরূপ আবেগে সাবিকে জড়িয়ে ধরল। অন্তর বিনিময়ের এই পরম মুহূর্ত্তে ডান পা'টা দিয়ে গাছকাটা অস্ত্রখানা একটু একটু করে প্রাঙ্গণের আগাছার জঙ্গলের মধ্যে সরিয়ে দিল সাবি।

তাই চ সাবি, তাই চ। এখেনে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। কখন কি করে বসব ঠিক নেই। আমার শরীল পুড়ে যাচ্ছে সাবি, তুঁষের আগুনে জ্বলছে।

আমাকে পেলে তুমি সব ভুলতে পারবে ত পঞ্চুদা?

পারব সাবি, পারব। তোরে পেলেই আমার মনের দাগ মিলুতে পারে, আর কিছুতে নয়। সত্যি বলছিস্ ত সাবি, না চালাকী করে আমারে ভোলাচ্ছিস্?

সাবিকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল পঞ্চু, কথা কইছিস্ না যে? কি ভাবছিস্?

অন্ধকারে সাবির মুখটা না দেখতে পেয়ে নিঃসংশয় হতে পারল না পঞ্চু। তাই দুহাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরতে গিয়ে বুঝল দুচোখের জলে গালদুটো ভেসে যাচ্ছে সাবির।

তুই কাঁদছিস্ সাবি?

তাড়াতাড়ি মুখখানা আঁচলে মুছে ফেলে নিজেকে সামলে নিল সাবি, না ও কিছু নয়। তোমাকে কি মিছে কথা বলতে পারি পঞ্চুদা? ঠিক যাব।

কবে?

পরশু। তুমি ঘরে থেক। এই রকম রাত্তিরে তোমাকে ডেকে নোব।

কাল নয় কেন সাবি?

একটু গুছিয়ে নিতে হবে। দয়া দিদিমার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বেশ, তাই হবে। কমনে যাবি?

সে কথা এখন বলব না। দিনের দিন জানতে পারবে। তবে তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর, এর মধ্যে কিছু করবে না, মাথা ঠাণ্ডা করে থাকবে।

তা থাকব। তোর ভয় নেই। আমি তা হলে তৈরী হয়ে থাকব। ঠিক এই সময়। কেমন?

হাঁ।

পঞ্চু চলে যেতে নিঃশব্দে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল সাবি।

৮

এর পর যে দিনগুলো এল, পঞ্চুর বিগত জীবনের সঙ্গে তার আর কোন সামঞ্জস্য থাকল না। বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান হিসাবে ঘর সংসারের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ চিরকাল বজায় ছিল। বাপ মা মারা যাবার পর তার মনের বাঁধন কোথায় যে আলগা হয়েছে বহুতর ঝড় ঝাপটার মধ্যে স্ত্রীর ভাব ভালবাসাকে আশ্রয় করে সেটা সে ঠিক নির্ণয় করতে পারে নি। স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে সে প্রথম অনুভব করল বাঁচতে গেলে জীবনের যেটুকু অবলম্বন দরকার মনের সে নিরাপদ ভিত্তিভূমি কোথায় যেন কোন দুর্লঙ্ঘ্য অভিশাপে চিরদিনের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। দুলের ছেলে হয়ে ভদ্রসমাজের নীচের তলায় বাস করে সাধারণ ভদ্রতার, দয়া-ধর্ম্মের ন্যায়নিষ্ঠার যে খোলসখানা তার চরিত্রের ওপর আপনা হতেই জড়িয়ে ছিল চারদিক থেকে ক্রমাগত আঘাত পেতে পেতে সহিষ্ণুতার সে বহিরাবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার যে কতখানি গরমিল, সেটা সে ভালরকমই বুঝল যখন বিশ্বস্ততার নির্ভরতার পরিবর্ত্তে বঞ্চনা আর অত্যাচারের কদর্য্যরূপ তার আদর্শ উজ্জ্বল মনটাকে উপর্য্যুপরি আচ্ছন্ন করে ফেলল। গভীর রাতে, দুলের ছেলে শক্ত হাতে গাছকাটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিয়ে হেলাকে কাটতে বেরুল! কিন্তু তখনও যে তার মনের গভীরতম প্রদেশে মস্ত বড় একটা অবলম্বনের শেকড় নিভৃতে আত্মগোপন করে ছিল, সেটা ঠিক ধরতে না পারলেও, তার পা দুখানা কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় তাকে হেলার বাড়ী থেকে সোজাসুজি দুর্গাপুরে সাবির বাড়ীর সীমানায় নিয়ে গিয়ে তুলল। সেখানে তার পাওনাও মিলল। বুঝল তার ছিন্নভিন্ন জীবনসূত্রের যোজনা করবার

তাগিদ তার ততটা না থাকলেও আর একজনের ঠিকই আছে। তাই নির্দ্দিষ্ট সময়ে কথামত সাবি যখন এল না, পঞ্চু বিরক্ত হল। কিন্তু বিভ্রান্ত হল না। এমন কি ফেলে আসা অস্ত্রখানা খুঁজে আনবার কথা আর তার মনেও এল না।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত এসেই মনের গতিশীলতায় একেবারে ভাঁটা পড়ল পঞ্চুর। বুঝল তার আর কিছু করবার, এমন কি জোর করে কিছু আশ্রয় করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে গেছে। সাবিও তাকে মিছে কথায় ভুলিয়ে রাখতে চায়! শূন্য, শূন্য, সব শূন্য। আর বেশী ভাবে না পঞ্চু। সব শেষ হয়ে গেছে। তবুও গাজনতলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাত দুখানা নিঃশব্দে কপালে গিয়ে ঠেকে। জানে না, জানতে চায়ও না কিসের আশায়? কিই বা আছে তার, কিই বা গেছে হিসেব করতে পারে না। ঘরে শুয়ে শুয়ে রামায়ণের ছেঁড়া পাতাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। যেন পুরান জীবনের জঞ্জাল থেকে হারিয়ে যাওয়া রত্নকুচি খুঁজে বের করছে। কিন্তু কই? কিছুই ত হাতে আসে না।

প্রায় পুরো একটা সপ্তাহ গেল এইভাবে। অভয় মোড়লের কাছে পাওয়া বাকী মজুরীর টাকাও ফুরিয়েছে। অতএব এবার থেকে কাজে না বেরুলে পেট চলবে না। সন্ধ্যার দিকে মনটা উস্‌খুস্ করে উঠল পঞ্চুর এবং কাজের সন্ধানে বেরুবে বলে সোজা সাবির বাড়ী এসে হাজির হল। সাবি তখনও মাছ বেচে ফেরে নি। দাওয়ায় বসে ঝিমুচ্ছিল দয়া। পঞ্চুকে দেখে তাকে বসতে বলল।

সাবি কম্‌নে দিদিমা?

যম জানে। আজকাল রাত করে বাড়ী আসছে। জিগ্যেস্ করলে কিছু বলে না।

পঞ্চুর এ কদিনে অনুভূতিহারান মনটায় যেন আগুনের তাত লাগল।

রাত করে বাড়ী ফিরছে সাবি ? রাত কত হচ্ছে দিদিমা ?

তা দুপুর, শেয়াল ডেকে যায় এক একদিন।

বল কি ? জোরে একটা নিশ্বাস পড়ল পঞ্চুর।

তা হলে রাত করে আসতে আরম্ভ করল সাবি ? নিজেকেই জিজ্ঞাসাটা করল পঞ্চু। জানে রূপযৌবন নিয়ে সহর বাজারে মাছ বেচতে আরম্ভ করলে অনিবার্য্য এ পরিণতি। কোন কথা না বলে একলাফে দাওয়া থেকে নেমে এল পঞ্চু। ঠিক সেই সময় বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়াল সাবি এবং দয়াকে ডাকবার আগেই অন্ধকারের মধ্যেই পঞ্চুকে ঠিক চিনতে পারল। আবছা আবছা সাবিকেও দেখল পঞ্চু এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সাবির ঘরে যাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, এত রাত করে কেমনে থেকে এলি সাবি ?

নিঃশব্দে পঞ্চুর কাছে এগিয়ে এল সাবি এবং অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বরে সারাদিনের ক্লান্তির আমেজ মিশিয়ে বলল, তুমি কি মানুষ পঞ্চুদা ? সামনের বুধবারে তোমার মামলার দিন। আর তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ ?

মামলার দিন ? চমকে উঠল পঞ্চু। মামলার চিন্তাটা জোর করে মনের এককোণে সে সরিয়ে রেখেছিল। অভিযোগ যেখানে কল্পিত, অপরাধ বলতে সেখানে সত্যিই কিছু নেই। বলিষ্ঠ মনের ধর্ম্মে সে কেনই বা সে অপরাধ মানবে, কেনই বা বিচলিত হবে ? কিন্তু এই ভয়শূন্যতার সম্পূর্ণ অগোচরে যে নির্ভরতার ভাবটা কোন গভীর রহস্যভূমিতে আত্মগোপন করেছিল, তার সূত্রটা হঠাৎ কথার

ছলে টেনে বের করল সাবি। বুধবারে তার মামলার দিন, অথচ সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

ততক্ষণ কেরোসিনের আলো জ্বেলে ফেলেছে দয়া। সেই আলোয় সাবির সমস্ত মুখখানা দপ করে চোখে পড়ল পঞ্চুর। ক্লিষ্ট এ মুখচ্ছবির সঙ্গে তুলনা দেয় এমন কোন জিনিস তার মাথায় এল না।

তুমি বস পঞ্চুদা। আমি হাতপাটা ধুয়ে আসি।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে দাওয়ায় পঞ্চুর সামনে বসে বলল সাবি, সমস্ত ঠিক করে এলাম পঞ্চুদা। আজ ক'দিন থেকে এইজন্যে ঘুরছি। পলাশপুরে গেলাম দু'দিন।

পলাশপুরে গিছলি? পলাশপুর মহকুমা সহরের নাম।

যাই নি? তুমি ত কিছুই খোঁজ রাখ না। চুপ করে যদি সবাই বসে থাক, কি হবে বল ত?

রাত করে কেন ফেরে সাবি ভাল করে বুঝল পঞ্চু।

সাবি বলতে লাগল, ন'পাড়ার হরেন সাধুখাঁ লোক খুব ভাল। এখন তার কাছে থেকে আসছি। তদ্বির টদ্বির সব তিনি করছেন। উকিল ঠিক করে দিয়েছেন।

মামলার দালাল হিসাবে হরেন সাধুখাঁর নাম আছে দেশে। পঞ্চুও তাকে চেনে।

আরও অনেককে বলেছি। হাতে পায়ে ধরে জানিয়েছি, নির্দ্দোষী নোক, ভালমানুষ, আপনারা যদি না দেখেন, না হক্ লোকটা জেল খাটবে। সাক্ষী সাবুদ সব পাওয়া যাবে। দেখি এখন ভগবান কি করেন।

সব ত বুঝলাম সাবি। কিন্তু টাকা? অত খরচ যোগাবে কেডা? পঞ্চু বলল।

টাকা লাগবে বলে কোন চেষ্টা করবে না ? টাকা ত লাগবেই। তবে উকিল খুব ভাল লোক। দয়ার শরীল। অল্প খরচায় কাজ করবে বলেছে। মেঘনাল নিকিরির কাছে কিছু টাকা ধার করেছি। তুমিও কিছু যোগাড় কর। মোড়ল পাড়ায় কাল একবার যেয়ো, বুঝলে ?

যাব। অন্ধকারের অস্পষ্টতার দিকে চেয়ে বলল পঞ্চু।

এতটা সময় কোন কথা বলে নি দয়া। হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে বলল, সেদিন হারছড়াটা গইড়ে আনলি সাবি, সেটা ত আর দেখতে পাচ্ছি নে। কম্‌নে থুইছিস্ বল্ ত ?

আছে, আছে দিদিমা। তুমি এখন যাও পঞ্চুদা। রাত হয়েছে। কাল একবার অভয় মোড়লের কাছে যেয়ো।

সম্মতি জানিয়ে চলে গেল পঞ্চু।

উন্মুক্ত আকাশের তলায় এতদিন কাটিয়েছে পঞ্চু। নিশ্চিন্ত, নিরাপদ। সকাল থেকে সন্ধ্যার ধূসর ছায়ানামা, তারপর সেই গাঢ় তমিস্রা, নয়ত রূপোঝরা চাঁদের আলো। আলো আঁধারির এই নিঃশঙ্ক রাজ্যে এতদিন বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু যে জীবনে মুক্তির অবকাশ নেই, সেখানে এ খোলা আকাশ আর কতদিন থাকবে ?

পর পর তিন দিন ফৌজদারী আদালতের দোর পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে হল পঞ্চুকে। তিনবারই জামীনের খরচায়, উকিল, মুহুরীর পাওনায়, পেয়াদা পেস্কারের সেলামীতে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে গেল। তখনও মামলা বহুদূর। পুলিশ আজও চার্জশীট দাখিল করে নি।

টাকার জন্যে আপ্রাণ খাটে পঞ্চু। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা যেখানে যে কাজ পায় করে, তার ওপর সাবির যোগান ত আছেই, তবুও ফেরবার পথে আর একটুও উৎসাহ খুঁজে পেল না পঞ্চু। দশ দিন পরে আবার দিন। দশ দিন উপস্থিত কোন বিপদ নেই। তারপর উকিল বলেছে ও মামলা খারিজ হয়ে যাবে। অভয় মোড়লের পাঁচ বিঘে পাটের ভুঁই চষে খুঁড়ে তৈরী করছে পঞ্চু আগাম টাকা দিয়েছে মোড়ল। করকরে একমুটো টাকা। ভোর ছটা বাজতে না বাজতেই মাঠে নামে, জলখাবার খেতে সাধাসাধি করে মোড়ল। খিদে তেষ্টা ভুলে যাচ্ছে পঞ্চু। কি এক অদ্ভুত নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। যে মাটিকে কোনদিন ভালবাসেনি পঞ্চু সেই মাটির ভেতর কেমন একটা আত্মীয়তার আমেজ পায়। আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা কোন অজ্ঞাত মোহ আবেশে দেখতে দেখতে কোথায় বিলীন হয়ে যায় বলিষ্ঠ মাংসপেশী আর শক্ত মাটির সজ্ঘর্ষে। যেখানেই যাক এ মাটিকে সে তৈরী করে দিয়ে তবে যাবে। জীবনে এই যেন প্রথম একটা কাজ পেয়েছে পঞ্চু। এর আগে ত অনেক কাজ করেছে। কিন্তু সে সব কাজ আর এ কাজ? কাজ করতে করতে কত কি ভাবে। মনে পড়ে বাপের ঘরামীর কাজের নিষ্ঠার কথা। এতদিনে যেন বাপের সঙ্গে রক্তের সাক্ষাৎ যোগাযোগ খুঁজে পায় পঞ্চু।

ঠিক তাই। চারদিনের দিন তার পিঠ চাপড়ে বলল অভয় মোড়ল, সাবাস্ ভাই। তাই ত বলি। ওরে কথায় বলে বাপকো বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া। চারদিনে জমিকে যে ভাবে দোরস্ত করেছিস, সারা মাঠে এরকম চৌরস ভুঁই কেউ চোখে দেখেনি। পঞ্চুর মনটায় নতুন রকমের অনুভূতির ছোঁয়া লাগে। কৌতুকপুরে

মাঠ থেকে তামাম চরসরাটির প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত তার চোখে পড়ে। চষাখোঁড়া জমি আলের ব্যবধানে থাকের পর থাক সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে ধোয়াটে ছায়ানামা বহুদূরের দিগন্তরেখার সঙ্গে। এ সবই মানুষের রক্ত জলকরা মেহনতের ছবি।

দেখ পঞ্চু। তোর কব্জির কসরৎ আছে। মনে করছি চরের জমি থেকে বিঘে কতক জমি তোকে ভাগে দোব। লাঙ্গল গরু সব আমার। তুই শুধু খাটবি আর আধাআধি ভাগ তোর।

চরের জমি। ও ত সোণা। বছরে তিনটে ফসল উঠবে। ভুলের ছেলের বরাতে ভাগের জমি। সমস্ত শরীর জুড়ে নেশার মত একটা আমেজ দিনরাত ঘোরাফেরা করে। এর পেছনে আর একটা সম্পূর্ণ নতুন অপরিজ্ঞাত জগৎ যেন নতুন করে জন্ম নিচ্ছে।

পায়ের তলার মাটি তাকে নতুন কথা শোনায়, কিন্তু মাথার ওপরের আকাশ যেন দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। মুক্ত বিহঙ্গের অশরীরী আত্মাকে সূক্ষ্ম তন্তুতে অহরহ আকর্ষণ করে মহকুমা ফৌজদারী আদালতের কাঠের বেড়া আর দণ্ডবিধির ধারা উপধারা। ছেলেবেলায় শ্রীবৎস, নলের উপাখ্যান পড়েছিল পঞ্চু। এ যেন ঠিক তাই।

এর পরেও দুটো দিন ফিরে শেষ পর্য্যন্ত মামলা উঠল পঞ্চুর। বড় হাকিমের এজলাস থেকে সাবডেপুটির আদালতে শেষ পর্য্যন্ত নথিভুক্ত হয়েছে মামলা। বাদী পক্ষের বহু তদ্বিরে নাকি এটা সম্ভব হয়েছে। আসামীর কাঠগড়া। তার মত মানুষকে বন্দী করে রেখেছে এই কখানা কাঠের টুকরো তার হাতের দুটো ধাক্কায় কোথায় গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে এই বেষ্টনী। কিন্তু আইনের বেড়া। সে আড়গড়া ভাঙ্গবার শক্তি কোথায় পাবে তার মত গরীব

স্কুলের ছেলে ? হাকিম, পেস্কার, উকিল, মুহুরী যেন যাত্রার দলের সাজগোজ পরা রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদ।

পুলিশের পোষাকপরা কোর্টবাবু প্রথমে দায়ের করলেন অভিযোগ। পরিষ্কার ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে বর্ণনা করলেন একটা দুঃসাহসিক অত্যাচারের কাহিনী যার প্রধান নায়ক হচ্ছে পঞ্চু নিজে এবং যার ভাগ্য তার চুলের মুঠি ধরে এনে হাজির করেছে এই উপাখ্যানের আবৃত্তি শুনতে। জোর করে ঘরে ঢোকা, নিরীহ স্ত্রীপুরুষকে নির্ম্মমভাবে মারপিঠ করে ঘরের বাকস্ পেঁটরা ভেঙ্গে টাকা গহনা আত্মসাৎ; শুনতে শুনতে এক একবার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল পঞ্চুর। তবুও সমস্ত শুনল পঞ্চু। যথা সময়ে নিজেকে নির্দ্দোষী বলে সাফাইও দিল। কিন্তু বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দীর ভাষায় তার সাফাই কোথায় ভেসে গেল। পরিষ্কার ভাবে সামঞ্জস্য রেখে পর পর সাক্ষীরা কেমন পরিপাটিভাবে ঘটনাটা বর্ণনা করে গেল। এদের মধ্যে এশো আছে, নকুলে আছে এবং আরও অনেকে আছে যাদের সে পরমাত্মীয় বলেই এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে।

সেদিনও জামিনের প্রসাদে বাড়ী ফিরল পঞ্চু কিন্তু ফেররার পথে সাবির ডান হাতের আঙ্গুলে আংটিটা আর দেখতে পেল না। সাবিকে জিজ্ঞাসা করবে কি তার রাজা যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। এই আছে, এই নেই। হাড়েঃ ভেল্কীর মত তার জীবনেও ভোজ বাজীর ওলট-পালট সুরু হয়েছে। এর ভোগ যতদিন না শেষ হবে, কার সাধ্য তাকে বাঁচায় ?

যে অনিশ্চিত কল্পনা নিয়ে সেদিন বাড়ী ফিরেছিল পঞ্চু শেষদিন আদালত এলাকায় পা দিতেই তার বাস্তব রূপটা তার চোখে পড়ল।

তার উকিল আজ অনুপস্থিত। অনামা একজন মোক্তারকে ওকালতনামা দিয়ে জেলা আদালতে চলে গেছেন তিনি বিশেষ কোন জরুরী মামলায়। ভোজবাজীই বটে! বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আরও দেখল পঞ্চু মহকুমা আদালতের প্রায় বার আনা উকিল মোক্তার তার বিপক্ষে। সাফাই সাক্ষীদের জবানবন্দী জেরার মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সওয়াল জবাব সব মিটে গিয়ে সেইদিনই নিষ্পত্তি হল মামলার। রায় বেরুবে চারদিন পরে। ইচ্ছা করেই সেদিন আর জামিন চাইল না পঞ্চু। সাবির বহু মিনতি ঠেলে ফেলে দিয়ে জেল হাজতে চলে গেল।

দণ্ডবিধির তিনটে ধারা জুড়ে গেঁথে হিসেব নিকেশ করে রায় দিলেন সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। জেল এবং জরিমানা মিলিয়ে ন মাস সশ্রম কারাদণ্ড। শুনে প্রথমেই মাথাটা একটু ঘুরে উঠল পঞ্চুর। কিন্তু সামলে নিল। চেয়ে দেখল কৌতুকপুরের অনেক লোক এসে ভিড় করেছে। সকলকেই আজ অতি আপনার বলে মনে হল তার। জেল যে কি জিনিস, জেল হাজতেই তার নমুনা পেয়েছে। অপরিসর বদ্ধ ঘরের দুর্গন্ধে, আসামীদের নোংরা পরিধানে আর অমার্জিত দেহের ক্লেদে এই চারদিনেই তার মনের সহজাত স্বাস্থ্য অনেকখানি ভেঙ্গে পড়েছে। তাই এই লোক কটিকে দেখে তার মনে হল, তার মুক্ত বিচরণভূমি, আজন্ম জীবধাত্রী কৌতুকপুর তাকে শেষ দেখা দেখতে এ কটি প্রাণীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তা সে শত্রুই হক আর মিত্রই হক, এমনকি হেলা, হেলার বউও হক, তাতেও তার কিছু এসে যায় না।

জেল সে খাটবে। আপিল করবে না। শুধু একবার সাবিকে দেখবে। শেষ দুটো কথা বলে যাবে তাকে। সেই সঙ্গে শেষ দেখা।

মাথাটা ঝিম ঝিম করে পঞ্চুর। কিন্তু কোথায় সে সুযোগ? কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশের লোক তাকে বাইরে আনল। দুদিকে দুজন সিপাহী। আদালতের সামনে মস্ত বড় প্রাঙ্গণ, অনেকখানি গেলে বড় রাস্তা।

ওকে তোমরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ও কি চোর না, ডাকাত? ছেড়ে দাও। ও ঠিক তোমাদের সঙ্গে যাবে। কণ্ঠস্বরে দৃঢ় শাসনের দুর্লঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ। পঞ্চু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। সাবির এ রূপ ত কখন চোখে পড়েনি তার? এ যেন ভিন্ন জগতের প্রাণী,—কৌতুকপুর দুর্গাপুরেব সম্বন্ধ ছাড়াও এ আত্মীয়তা বহুযুগপ্রসারী।

মুগ্ধ পুলিশ প্রহরী দুটিরও হাতের দড়ি আলগা হয়ে এল।

আমরা ওকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি নে ত। এটুকু হল নিয়ম। আমরা ত আইনের চাকর। তোমার কিছু বলবার থাকে ওকে বলতে পার। চলতে চলতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল লোক দুটি।

তুই এইছিস সাবি। তোকেই আমি খুঁজছিলাম। খালাস পেলাম না বলে দুঃখু করিস নে। এ রকম হয় রে, এ রকম হয়। কোন রকমে চোখের জল চেপে পঞ্চুর মুখের দিকে চাইল সাবি। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। থমথমে ভাবটা কাটিয়ে বলল পঞ্চু, একটা কথা শোন সাবি। মোড়ল আমাকে ক' বিঘে চরের জমি দেবে বলেছে। যদি নিশানা দেখিয়ে দেয়, দেখে রাখিস।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল সাবি। আর ছ্যাখ্ এই কদিনে তার পাটের ভুঁইটে তোয়ের করে বীজ ছড়িয়ে এইছি। মোড়লকে বলিস যেন নিড়িয়ে ছ্যায়। ঘাসে যেন অত কষ্টের চারাগুলো নষ্ট না করে। মনের এই দুঃসহ অবস্থায় একটু না হেসে থাকতে পারল না সাবি।

বলল, তার ভুঁই সে ঠিক দেখবে। মনে করিয়ে দিতে হবে না। বদ্ধ অবস্থায় সাবির অত্যন্ত কাছে সরে এসে বলল পঙ্কু, না রে। সে কথা বলছি নে। হাভাতে তুলের ছেলে হলেও আমার মনে জমির নেশা ধরেছে। কি করে জানিস? ঐ জমি করতে করতে আমি অনেক কিছু ভাবতাম। বেশ বুঝতে পারতাম, পরের কাজ নিয়ে সামান্য মজুরীতে কি করে অত ভাবনা ভাবত বাবা। রাতে শুয়ে পড়েছে, বিষ্টি এয়েছে, জলে ভিজতে ভিজতে ছুটে গিয়ে কাঁচা দেয়ালে কলাপাতা চাপা দিয়ে এসেছে। তাই দু'চার দিন চেপে খাটতেই মাটি যখন আমার বশ হয়ে গেল, তখন কেমন মায়া হল মনের মধ্যে। মনে হল এত কষ্টের ফসল হয়ত আমি চোখেই দেখতে পাব না। তাই তোকে বলছি আমি না দেখি তুই ত দেখবি। তা হলেই আমার দেখা হবে। বলতে বলতে জোর করে হেসে উঠল পঙ্কু।

লোকটার মাথায় ছিট আছে। পুলিশের একজন বলতেই আর একজন হেসে তাকে সমর্থন করল।

যতক্ষণ দেখা যায়, কয়েদীদের কালো গাড়ীখানার দিকে চেয়ে রইল সাবি। চলমান গাড়ীটা দূর হতে দূরে, আরও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে মানুষকে তার চেনা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপরিজ্ঞাত পরিবেশে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তার দেহ, মন আত্মা সবটুকু কি হারিয়ে যাবে এই শাস্তি ব্যবস্থার চাপে? ভয় যে কোনদিন মানে নি, বাঁধন কি তার হাত পা বেঁধে পঙ্গু করে রাখতে পারবে? দেখতে দেখতে কালো গাড়ীখানা আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিন্তু এ অন্ধকার হয়ত নিত্যকার জিনিস নয়।

সহর বাজার থেকে মাছ বেচে ফেরবার পথে, সোজা রাস্তা ছেড়ে প্রায়ই মোড়লপাড়ার মাঠটা ঘুরে বাড়ী আসে সাবি। পড়ন্ত বেলার সোনালি রোদ। তার ওপর মাঠের ফসল যেন জীবন্ত স্বপ্ন। অভয় মোড়লের জমিতে পঞ্চুর হাতের তৈরী পাটের চারাগুলো মুক্ত বাতাসের দোলা পেয়ে সবুজ তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়েছে। কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে, যতক্ষণ দেখা যায়, প্রবাহের পর প্রবাহ এর যেন শেষ নেই, বাধা নেই, বিরাম নেই।